এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ ঃ সন্ধান ও বিচার

GIFT

382823

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
382823

মোহাম্মদ ইসা

সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ : সন্ধান ও বিচার' অভিসন্দর্ভটি সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ১৯৮২-৮৩ সালের ২য় পর্ব এম ফিল ডিগ্রীর জন্য পেশ করা হলো।

মোহাম্মদ ইসা 21.2.1994
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ

382823

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

২৬. ২. ১৯৯৪

তত্ত্বাবধায়ক :
প্রফেসর ড: আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী
চেয়ারম্যান, নৃবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ : সন্ধান ও বিচার বিষয়ে গবেষণা করার সিদ্ধান্ত আকস্মাৎ গৃহীত বিষয় নয়। বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের শ্রেণীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি অনুধাবনের জন্য শ্রেণীসমূহের বিকাশধারা ও উৎসসূত্র সম্পর্কে জানার আগ্রহ আমাকে বাংলাদেশের সামন্তবাদ এবং মার্কসীয় প্রত্যয় 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' সম্পর্কে পঠন পাঠনে নিয়োজিত রেখে। এই বিষয় নিয়ে আমি অনেক বিদগ্ধজনের সাথে আলাপ আলোচনা করেছি এবং তাদের পরামর্শমতে গ্রন্থ-প্রবন্ধাদি পাঠ করেছি। কিন্তু কখনই আমি পরিতৃপ্ত হইনি। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড: আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরী আমাকে এম ফিলের অভিসন্দর্ভ হিসেবে গবেষণা এবং একই সাথে বিশাল পরিসরে পঠন পাঠনের সুযোগ করে দিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে বক্ষমান অভিসন্দর্ভটি রচনা করা সম্ভব হল।

এই গবেষণা কাজে আমি যাদের কাছে ঋণী তাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আফসার উদ্দীন এবং শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সা'দ উদ্দীন এর নামে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর মো: আফসার উদ্দীন আমাকে নিত্য সাহচর্য ও উদ্দিপনা দিয়ে দীর্ঘদিন যাবত অভিসন্দর্ভ রচনার একাগ্রতা ও নিত্য অনুশীলনের মানসিকতাকে লালন প্রবণতার উপাদানসিক্ত করেছেন। বস্তুত তার পরামর্শ আমাকেঅভিসন্দর্ভ রচনার ভিন্নমাত্রা সন্ধান ও অনুশীলনের সুযোগ করে দিয়েছে।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সা'দ উদ্দীন আমাকে নিরন্তর উৎসাহ উদ্দিপনা দিয়ে রচনার উৎকৃষ্টমান রক্ষার বিষয়ে সতর্কতার সাবধানবাণী শুনিয়ে এবং এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত রচনাবলী গবেষণায় ব্যবহারে সতর্কতা এবং প্রামাণ্য রচনা নির্বাচনে দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সহমর্মী লালন আমাকে বহুমাত্রিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করেছে। শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সৈয়দ আহম্মদ খান, চেয়ারম্যান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ, আমাকে এম,ফিল ২য় পর্ব অতিক্রমের প্রশাসনিক এবং একাডেমিক পথ কুসুমাস্তীর্ণ করেছেন। বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর সৈয়দ আলী নকী, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর শ্রী রংগলাল সেন, শ্রদ্ধেয় প্রফেসর নজরুল ইসলাম এবং বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দও আমাকে বিভিন্ন সময়ে বিভন্নভাবে সাহায্য করেছেন।

382823

আমার তত্ত্বাবধায়ক শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড: আনোয়ার উল্লাহ্ চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবত অসীম ধৈর্য্য সহকারে লালন করে আমাকে বক্ষমান গবেষণাকর্ম সমাপ্ত করাতে এবং একাডেমিক বিশুদ্ধতা অর্জনের যোগ্য করে তুলেছেন। বলা যায় আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করিয়েছেন, গবেষণা শেষ করিয়েছেন। মার্কসীয় চিন্তার সাথে ভারতীয় মার্কসবাদীদের চিন্তার সংমিশ্রনজনিত দোষ-ত্রুটি থেকে সাবধান হওয়ার পরামর্শ ও নির্দেশিকা আমাকে বিশুদ্ধ গবেষণা কর্মে উত্তরণে মৌলিক ভূমিকা পালন করেছে। তাদের সকলের আন্তরিকতা ও সহযোগিতার ঋণ হাজার কৃতজ্ঞতা স্বীকারেও শুধবে না। আমি সকলের প্রতি আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

এই অভিসন্দর্ভ রচনায় আমাকে বস্তুগতভাবে এবং বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন বড় ভাই মো: আবু জাফর এবং অগ্রজ প্রতিম গজনফর কবীর। তাঁরা আমার ব্যক্তিগত সমস্যা উত্তরণে মৌলিকভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। তাঁদের সাথে আলোচনা করে আমার তথ্যসন্নিবেশন ও যুক্তিনির্মাণ বাঙময় হয়েছে। আমি তাঁদের প্রতি আমার অশেষ শ্রদ্ধা জানাচ্ছি ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমার আত্মীয়স্বজন, ভাই-বোন এবং একান্ত কাছের মানুষ (রাজনৈতিক ওঅরাজনৈতিক) বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে আমাকে তথ্য প্রমাণাদি সরবরাহ করেছেন এবং উৎসাহ প্রদান করেছেন, শ্রদ্ধেয় কমরেড আবদুল মতিন এবং অসংখ্য প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। তাঁদের সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। যত্নসহকারে টাইপ করার জন্য মো: সামছুল হক আমার কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছেন। যারা আমাকে বুদ্ধি পরামর্শ ও অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করে আমাকে উপকৃত করেছেন তাদের সকলকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোহাম্মদ ঈসা
সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

অধ্যায় :	পৃষ্ঠা
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	গ
প্রথম অধ্যায় :	
ভূমিকা - ক	১
ভূমিকা - খ	৩৩
দ্বিতীয় অধ্যায় :	
প্রথম পরিচ্ছেদ :	
ক. 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' সম্পর্কে মার্কসীয়তত্ত্ব	৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	
খ. এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য	৬৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ :	
গ. এশীয় সমাজে রাষ্ট্র ও গ্রাম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক	৭২
চতুর্থ পরিচ্ছেদ :	
এশীয় সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ	৮১
তৃতীয় অধ্যায় :	
প্রথম পরিচ্ছেদ :	
ক. এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধ্রুপদী লেখকদের ধারণা	৮৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	
ধ্রুপদী লেখকদের সমালোচনা এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের সাম্প্রতিক মতামত	৯৯
চতুর্থ অধ্যায় :	
প্রথম পরিচ্ছেদ :	
হিন্দু শাসন আমলে বাংলাদেশের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ	১০৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ :	
মুসলমান শাসন আমলে বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ	১২৪

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

ক. এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিস্বামিকানা ১৪৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

খ. গ্রাম গোষ্ঠীমালিকানা ও সামন্তীয় মালিকানা ।
এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার স্বৈরাচারী রূপ

প্রাচ্য স্বৈরাচার - ক ১৪৮

প্রাচ্য স্বৈরাচার - খ ১৫৬

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ

নতুন সামন্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ১৬৯

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ

উপসংহার ২০২

পরিশিষ্ট - ক ২১৮

গ্রন্থপঞ্জী ২৩১

অতিরিক্ত সংযোজন :

১. ঐতিহাসিক শ্রেণী বৈষম্য বিকাশের রেখাচিত্র ২৪২

২. প্রাচীন বাংলায় উৎপাদন বিকাশ (মানচিত্র) ২৪৩

৩. আধুনিক বাংলায় পুরাতন অংশ ,, ২৪৪

৪. খ্রিষ্টের সপ্ত-দশ শতকের বাংলাদেশ ,, ২৪৫

৫. প্রাচীন বরেন্দ্রভূমির রাজ্য ,, ২৪৬

৬. ১৭৭০ সালের মন্বন্তরের কবলে বাংলাদেশ ,, ২৪৭

Dhaka University Institutional Repository

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ : সন্ধান ও বিচার ।

ভূমিকা - ক

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো ও শ্রেণীসম্পর্কের রূপ আবিস্কার এবং এই সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশ ও বিকাশের ধারা প্রকৃত চরিত্রে অনুধাবন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । কেননা বহু বিপরীত সিদ্ধান্ত, মতাদর্শের লাগাতার বিতর্কের প্রাচুর্যের স্তূপ থেকে দৃশ্যমান হয়ে উঠে এসেছে সমাজ বিজ্ঞানীদের এক অপূর্ব বৈভবমন্ডিত এক বিশিষ্ট আবিস্কার ' বাংলাদেশের বর্তমান শ্রেণীসম্পর্ক একটি ধারাবাহিক ঐতিহাসিক বৈরীদ্বন্দ্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ও ফলশ্রুতি' । কিন্তু সেই ঐতিহাসিক বৈরীদ্বন্দ্বের বিকাশ ও তৎফলশ্রুতিতে যে বর্তমান শ্রেণী-সম্পর্ক দ্বন্দ্বমান তার রূপ ও গতিধারার রূপরেখা নির্ণয়ের জন্য কোন স্বাধীন ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ গবেষণা, তত্ত্বনির্মাণ সম্ভব হয় নি ।

সাধারণভাবে যে সামাজিক-ঐতিহাসিক-নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতি গবেষকগণ অনুসরণ করেছেন তাতে কোন না কোন পূর্ব নির্ধারিত মনিষীযুগচেতনা, রাজনৈতিক যুগচেতনা ইত্যাকার বিভিন্ন আর্থরাজনীতিক নৈতিকতার প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে । বস্তুত ইত্যাকার গ্রন্থাবলীর অধিকাংশই কেতাবী শুদ্ধতায় তুষ্ট ও একাদেমীয় সমৃদ্ধি । নিটোল আর্থসামাজিক গতিসূত্রকে প্রকৃত প্রস্তাবে বাস্তবিক আঙ্গিকে প্রতফিত না ভেবে প্রথাসিদ্ধ নিয়মতান্ত্রিক গবেষণা ও মূল্যায়ন হিসাবে ধরে নেয়া যেতে পারে । রাজনীতির বাইরে যে সব সমাজবিজ্ঞানীগণ আছেন তারা কোন না কোন স্কুলকে প্রতিনিধিত্ব করেছেন । নিরপেক্ষভাবে সমাজটি তার নিজস্ব গতিপ্রকৃতিতে একনজরে চোখে আসে না ।

ভারতীয় সমাজে প্রকৃত শ্রেণীদ্বন্দ্ব উপলব্ধির জন্য অনেকেই কার্লমার্কসের "এশীয় সমাজ" প্রত্যয়টিকে গুরুত্বদিয়ে এটিকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু কোন কোন মার্কসবাদী বিশেষজ্ঞগণ খুব সুক্ষ্মভাবে ভারতীয় সনাতনী মূল্যবোধকে মার্কসবাদের মধ্যে সংকেরায়িত করেছেন । এশিয়ার বাইরে বিশেষ করে মুক্ত বিশ্বে অমার্কসীয় সমাজবিজ্ঞানীদের

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণা করতে আগ্রহী হয়েছেন । কিন্তু অবস্থাদৃষ্টে দেখা যায় যে তারাও তাদের গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞানে পরিপূর্ণ প্রাপ্তির আত্মতুষ্টি খুঁজে পান নি যেন তাদের গবেষণা শেষ হয়েও শেষ হয় নি ।

আবার অনেকেই মার্কসীয় ঐতিহাসিক বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে এশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ভারতীয় সামন্তবাদ আবিস্কার করার চেষ্ট করেছেন । তারা দাবী করেছেন যে, তারা মার্কসীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন । এদের কেউ কেউ (পাভলভ, প্রভৃতি) এশীয় সমাজের ভূমিমালিকানাহীনতাকে অস্বীকার করে (তাত্ত্বিকভাবে উৎখাত করে) ভারতীয় সমাজে এক বিশেষ জাতীয় সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, সন্ধানলব্ধ সামন্ততন্ত্রকে ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি উপস্থাপনের চেষ্টা করেছেন । এই জাতীয় বিশেষ প্রকৃতির মার্কসবাদের প্রয়োগের ফলশ্রুতিতে বিশুদ্ধ মার্কসীয় ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একাডেমীয় যৌক্তিক শুদ্ধতা থাকতে পারে কিন্তু অবিচল মার্কসীয় স্কুলের আর্থরাজনীতিক মতাদর্শের বিচারে যৌক্তিকতাহীনতা দোষে দুষ্ট ।

ভারতীয় সমাজ গবেষকরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, ভারতীয় সমাজ (প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের মতই) কেন সামাজিক বিবর্তনের স্বাভাবিক গতিতে ধণতন্ত্রের জন্ম দেয় নি ? এই প্রশ্নের জবাবে অনেকে মার্কসের এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে কারণ হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন । কিন্তু এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা তত্ত্বের প্রবর্তক মার্কস নিজে মনে করতেন যে, ব্রিটিশ শোষণ এবং শাসন এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার স্থবির অবস্থা ধ্বংস করে একটি বিশেষ মাত্রার পরিবর্তন সূচনা করেছিল যা ভারতীয় সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে (এবং অনেকে মনে করেন পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণে) ভূমিকা পালন করেছিল ।

Dhaka University Institutional Repository

Melotti তার এতদসংক্রান্ত গবেষণা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, যে মার্কস ছোট বড় কিছু কিছু পরিবর্তনের কথা বিভিন্নভাবে বলে থাকলেও প্রকৃতার্থে যে মৌলিক পরিবর্তন হয়নি সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছিলেন। তিনি Marx and the Third world গ্রন্থে বলেছেন,

> "Actually Marx does not deny that Asiatic Society has known changes, even substantial changes; he only denies that those changes made any difference to its economic basis, that they ever, revolutionised its mode of production : The Oriental empires always show an unchanging social infrastructure, couppled with unceasing change in the persons and tribes who managed to ascribe to themselves the political superstructure." 1

কার্লমার্কসের এশীয় সমাজের জঈম অবস্থার ধারণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে যে প্রত্যয়টি নির্ধারনী ভূমিকা রেখেছিল সেটি হচ্ছে - ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতি। প্রাথমিকভাবে এই ধারণাটি তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হয় বার্নিয়ারের 'Travels in Mughal Empire - গ্রন্থ থেকে। তিনি এতই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে এই গ্রন্থটি পাঠের পর তার প্রিয় বন্ধু এঙ্গেলসকে লিখেছিলেন,

> "On the formation of Oriental cities one can read nothing more brilliant, vivid and striking than old Francois Bernier (nine years Physician to Aurung-Zete)" 2

বার্নিয়ার সম্পর্কে এঙ্গেলস্ - এর মতামতও মার্কসের মতই। মার্কস বার্নিয়েরকে যে মর্যাদা দিয়েছিলেন এঙ্গেলসও সেই মর্যাদাতেই এক অজানা সম্পদ আহরণকারীরূপে তাকে গ্রহণ করেছিলেন। এঙ্গেলস্ ফিরতি পত্রে লিখেছিলেন,

---

১। মার্কস এঙ্গেলস "নির্বাচিত রচনাবলী", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৭৯। পৃ- ১০৪

2. MARX ENGELS "Selected correspondence, Progress Puplishers, Moscow, 1975. P-75

Dhaka University Institutional Repository

"Old Bernier's materials is really very fine. It is a real delight once more to real something by a sober, a clearheaded old Frenchman, who always hits the nail on the head and does not seem to be aware of it ...." 1

বার্ণিয়ারের আলোচনা থেকে মার্কস ভূমিমালিকানাহীনতার প্রাচ্য বৈশিষ্ট্যে যে নির্ধারক উপাদানটি দিয়ে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার প্রত্যয় দাঁড় করিয়াছিলেন তা শেষ বয়স পর্যন্তও তিনি পরিবর্তন করেন নি । এতদসম্পর্কিত মতামতে তাঁর দৃঢ়তা এঙ্গেলসকে লিখিত একটি পত্রের সূত্রে পাওয়া যায় । উক্ত পত্রে তিনি বলেছিলেন যে, বার্ণিয়ারের বক্তব্য যথার্থ । বলা যায় প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যই ভূ-সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অভাব । তুরস্ক, পারস্য ও ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করে এই মালিকানার অভাব প্রসঙ্গে গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছেন উক্ত বৈশিষ্ট্যই হল" প্রাচ্যের অমরাবতীর সোপান স্বরূপ " । ২

"Bernier rightly sees all the manifestations of the East he metions Turkey, Persia and Hindustan-as having a common basis, nemely the absence of Private landed property. This is the real clef, even to the eastern heaven. " 3

---

1. MARX ENGELS "Selected correspondence", Progress Publishers, Moscow, 1975. P-77

২। ঘোষ, বিনয়, "বাদশাহী আমল" গ্রন্থনা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৯২ । পৃ-১

3. MARX KARL, ENGELS FREDERICK, "Collected works" Vol.-39, Progress Publishers, Moscow, 1983. PP. 339-334

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি মালিকানাহীনতার এই বৈশিষ্টই তাকে (মার্কস) এশিয়া সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেছিল। যা থেকে তিনি বিশেষতঃ এশিয়ায় এবং সাধারণভাবে অন্যান্য সমলক্ষণযুক্ত সমাজের জন্য এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রত্যয়কে সমাজ বিবর্তনের তাত্ত্বিক কাঠামোতে দাঁড় করিয়েছিলেন। মার্কস তার A contribution tomthe critique of Political Economy গ্রন্থে বলেছিলেন, সমাজ যে কয়টি মৌলিক স্তর অতিক্রম করে এসেছে সেগুলিকে ধারাবাহিকভাবে সাজালে তার প্রথমে এশীয় এবং শেষ পর্যায়ে বুর্জোয়া সমাজ থাকবে

> "On broad outline the Asiatic, Ancient, Feudal and modern bourgeois modes of production may be designated as a epochs marking progress in the economic development of Society." 1

তার এই স্তর বিভাজন (মার্কস এঙ্গেলস লিখিত) কমিউনিষ্ট পার্টির ইস্তেহারে (১৮৪৮ইং) নেই। স্পষ্টতই প্রমাণ হয় যে এটা মার্কসের বিকশিত চিন্তার ফসল। যদি ধরেই নেয়া যায় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ভারতে এবং বিশেষতঃ বাংলায় অন্ততঃ ব্রিটিশ শাসনের পূর্ব পর্যন্ত বহাল ছিলো তাহলেও মার্কসীয় মূল সমাজবিকাশের যে তত্ত্ব-দ্বন্দ্বমান সমাজে, অনুদ্বন্দ্বের কারণে সমাজটি বিকশিত হয়ে উন্নততর সমাজে উপনীত হয় + এই তত্ত্বের সরল প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। কেননা সাধারণভাবে মার্কসের এশীয় সমাজ প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজেরই একটি প্রাগ্রসর রূপ। কিন্তু অনেকেই এটা মানতে চান না। পাভলভ মনে করেন, এশীয় সমাজটা সেই অর্থে ছিল না বরঞ্চ, এক বিশেষ ধরণের সামন্ততন্ত্র এখানে বিকশিত হয়েছিল।

---

1. MARX, KARL, "A contribution to the Critique of Political Economy", Progress Publishers, Moscow, 1970. P-21

Dhaka University Institutional Repository

হরবংশ মুখিয়ার "ভারতের ইতিহাসে সামন্ততন্ত্র ছিল কিনা" শীর্ষক এক বড় রচনার সাথে একমত হয়ে এবং শর্মা, যাদব, নুরুলহাসানের মত বিশিষ্ট ভারতীয় ইতিহাসবেত্তাদের মতের কাছাকাছি দাড়িয়ে তিনি ইরফান হবিবের বিরোধিতা করেছিন সেইক্ষেত্রে, যেখানে তিনি (হবিব) এশীয় উৎপাদন প্রণালীর প্রবক্তা হিসেবে সাধারণভাবে নিজের মতাবস্হানকে স্হান দিতে চান। ১ এবং পাভলভ আরো দৃঢ় অবস্হান নিয়েছেন বিশেষতঃ যাদবের সাথে একমত হয়ে যেখানে তিনি (যাদব) ১২ শতকের ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে অভিন্ন উপাদান খুজে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে সনাক্ত করেছেন। ২ সামন্ততন্ত্রের বৈশিষ্ট ও উপাদান পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে Bottom-up এবং Top-down দুটো সূত্রই এবং ঘটনাচক্র একত্রে কাজ করে সামন্ততন্ত্রকে একটি এককরূপ প্রদান করে। তাছাড়া সামাজিক গাঠনিক বৈশিষ্ট ধরেও সামন্ততন্ত্রকে বিচার করা যায়। সেই সূত্র ধরে আমরা ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকেও দেখতে পারি।

পাভলভ বলেছেন, সামাজিক-গাঠনিক বৈশিষ্ট অনুসারে আঠার শতকের অটোম্যান, পারসিক, ভারতীয় আর চীন সমাজ সবে ঢুকেছিল বর্গগত-সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পর্বে। ৩ পাভলভের এই সামাজিক-গাঠনিক বৈশিষ্ট্য ধরে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে চিহ্নিত করার প্রয়াসে সামন্ততন্ত্রের শ্রেনী সম্পর্ক ছাড়াও উপাদানিক বৈশিষ্টভিত্তিক মাপকাঠি কাজ করেছে। তৈলনিক-ঐতিহাসিক পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তিনি যাদবের বারো শতকের ইউরোপীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে বিভিন্ন অভিন্ন উপাদান খুঁজে নিয়ে ভারতীয় সামন্ততন্ত্রকে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টাকে খুবই গুরুত্ব দিয়েছেন। ৪ ঐতিহাসিক কাল পর্যায়ের উপাদান বৈশিষ্ট খুঁজে ও তুলনা করে সামান্যীকরণ ও চিহ্নিত করণ পদ্ধতি মার্কসবাদ সম্মতও বটে।

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ-৩৫৭-৩৬১

২। প্রাগুক্ত। পৃ-৩৬২

৩। প্রাগুক্ত। পৃ-৩১৬

৪। প্রাগুক্ত। পৃ-৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

উপাদানগত বৈশিষ্ট আলোচনাকালে লেনিনের মন্তব্য স্মরণ করা যেতে পারে। লেনিন ভূমিদাস অর্থনীতি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, সামন্তসময়কার আর্থনীতিক ব্যবস্থার সারমর্মটা ছিল নিম্নরূপ :

কৃষি অর্থনীতির কোন একটা এককের অর্থাৎ কোন জমিদারির সমস্ত জমি মনিবের আর কৃষকদের জমিতে ভাগাভাগি হয়ে থাকত ; শেষোক্ত জমি কৃষকদের মধ্যে ছোট অংশে বন্টন করা হোত। তারা কৃষিকাজের বিভিন্নউপকরণ (গোবাদিপশু ইত্যাদিসহ) পেত এবং তাদের শ্রমশক্তি ও সরঞ্জাম দিয়ে সেই জমিতে চাষাবাদ করে তাদের নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। কৃষকদের শ্রমের উৎপাদ ছিল আবশ্যক , তাদের জীবনীয় বস্তু সংস্থানের জন্য আর ভূস্বামীর পক্ষে প্রয়োজ ছিল মজদুর যোগানোর জন্যে। পক্ষান্তরে, একই সরঞ্জাম দিয়ে কৃষকেরা ভূস্বামীর জমিতে যে চাষাবাদ করত তা ছিল তাদের উদ্‌ত্ত শ্রম। এই উদ্বৃত শ্রমের উৎপাদ পেত তাদের ভূস্বামী। এইভাবে বিভাজন করলে দেখা যায় উদ্‌ত্ত শ্রম ও আবশ্যক শ্রমের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ছিল। ভূস্বামীর জন্য তারা চাষাবাদ করত তার জমিতে, আর নিজেদের জন্যে চাষাবাদ করত তাদেরকে দেয়া জমি-বন্দে , তারা কাজ করত ভূস্বামীর জন্যে সপ্তাহের কয়েকদিন আর বাকি দিন নিজেদের জন্যে। এই অর্থনীতিতে কৃষকের আবন্টিত জমি-বন্দটা ছিল যেন বস্তু-মজুরী কিংবা ভূস্বামীর জন্যে মজদুর যোগানোর একটা উপায়। লেনিন তার নিজস্বভঙ্গিমায় নিম্নোক্তভাবে এই জটিল আর্থসামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন :

"The essence of the economic system of those days was that the entire land of a given unit of agrarian economy, i.e. of a given estate, was divided into the lord's and the peasants land ; the latter was distributed in allotments among the peasants, who (receiving other means of

Dhaka University Institutional Repository

production in addition, as for example, timber, sometimes cattle, etc.) cultivated it with their own labour and their own implements, and obtained their livelibood from it. The product of this peasants labour constituted the necessary product, ... necessary - for the peasants in providing them with means of subsistances, and for the landlord in providing him with hands; The peasant's surplus labour, on the other hand, consisted in their cultivation, with the same implements, of the land lord's land; the product of the labour went to the landlord. Hence, the surplus labour was separated then in space from the necessary labour; for the landlord they cultivated his land, for themselves their allotments ; for the landlord they worked some days of the week and for themselves others. The peasants allotment in this economy served as it were, as wages in kind (to express oneself in modern terms), or as a means of providing the landlord

Dhaka University Institutional Repository

with hands. The peasants "own" farming of their allotments was a condition of the landlord economy, and its purpose was to "provide" not the peasants with means of livelihood but the landlord with hands."1

লেনিনীয় সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার সংজ্ঞার্থে দেখা যায় ভূমি-মালিকানা, ভূমিস্বত্ব ইত্যাদি আইনগত দিক সম্বলিত ভূমিদাস অর্থনীতি সবাগ্রে একটি রাজনৈতিক আর্থনীতিক বর্গ। অধিকন্তু এই সংজ্ঞায় উপাদান বৈশিষ্টও আছে।

সামন্ততন্ত্রের সংজ্ঞা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনেকেই উপাদান বৈশিষ্টকে গুরুত্ব দিয়েছেন। সমাজবিদ্যা বিষয়ক শব্দকোষে এরূপ একটি সংজ্ঞা নিম্নরূপে বিবৃত হয়েছে ঃ

সামন্তবাদ হবে একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার "শ্রেনীগত বৈরী গঠনরূপ, ভূমির সামন্তবাদী মালিকানা ও সামন্তদের উপর ব্যক্তিগতভাবে নির্ভরশীল প্রত্যক্ষ উৎপাদকদের শোষণ এর ভিত্তি। দাসপ্রথাগত গঠনরূপের বদলে আর্বিভূত কোন কোন দেশে - আদিম গোষ্ঠীভিত্তিক গঠনরূপের বদলে)। প্রধান শ্রেনীসমূহ ঃ ভূমি-মালিক সামন্তরা এবং নির্ভরশীল কৃষকরা। সামন্তবাদী মালিকানার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমের হাতিয়ার ও ব্যক্তিগত খামারের দ্রব্যাদিতে কৃষকদের ও হস্তশিল্পীদের এক মালিকানা বজায় ছিল। এ মালিকানার ভিত্তি ছিল ব্যক্তিগত শ্রম। এর ফলে প্রত্যক্ষ উৎপাদক শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী থাকত, যা দাসপ্রথাভিত্তিক ব্যবস্থার তুলনায় সামন্তবাদের অধিকতর প্রগতিশীল চরিত্র নির্ধারণ করেছিল। উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের ফলে সামন্তবাদের গর্ভে পুঁজিবাদের উপাদান সমূহ গঠিত

---

1. LENIN, V.1 "Collected works", Vol-3, Progress Publishers Moscow, 1964. PP-191-192

Dhaka University Institutional Repository

হয়, পুঁজিবাদে উত্তরণের অবস্থা ত্বরান্বিত করে পুঁজির আদি সঞ্চয়নের প্রক্রিয়া।" ১

উপরোক্ত বর্ণনামূলক সংজ্ঞায় সামন্তবাদকে তার কাঠামো ও গতিশীলতায় প্রকৃতার্থে তুলে ধরা হয়েছে। সামন্তবাদের ভ্রূণাবস্থা থেকে বিকশিত ও পরিণতরূপে তার অনুবৈত্তবের চরিত্রকেও সঠিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যেমন শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং পুঁজির আদিসঞ্চয়নের প্রক্রিয়া ইত্যাদি।

১। খোলদ, স, "সমাজবিদ্যার সংক্ষিপ্ত শব্দকোষ", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৯০। পৃ-১৮৩-১৮৪

Dictionary of Philosophy গ্রন্থে বলা হয়েছে :

Fendalism, the Socio-economic formation that follows the slave-ouning system and precedes capitalism. The economic system of Feudalism ... has one typical feature : the principal means of production, the land is in monopoly ownership of the ruling class of fendal lords (which sometimes merges almost entirely with the state), while the economy is run by the small producers, the peasants, using their own impliments. The main economic relations of Feudalism is manifested in feudal rent, i.e. the surplus product that is collected by the feudal lords (or the state) from the producers in the form of labour, money or payment in kind.... The antagonism of feudal society, based on the exploitation of the peasants by the feudal lords gave rise to ravious forms of social conflict.

উপরোক্ত সংজ্ঞার্থে সামন্তদের একচ্ছত্র ভূমিমালিকানার উপর গুরুত্বদেয়া হয়েছে কিন্তু ভূমিদাস শব্দের পরিবর্তে কৃষক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

SAIFULIN, MURAD, DIXON, RICHARD, R.,"Dictionary of Philosophy", Progress Publishers, Moscow, 1984. P-143-144

Dhaka University Institutional Repository

পাভলভ এই সংজ্ঞার্থ হয়ত পুরোপুরি মানবেন না। কারণ হয়ত এই যে, তিনি মনে করেন সব সমাজেই সামন্ততন্ত্র একইরূপ পরিগ্রহ করেনা। কোন কোন সমাজ পরিণত সামন্ততন্ত্রে পৌঁছায় না বা পরিণত সামন্ততন্ত্রের উপাদান বৈশিষ্ট সকল সমাজে বিকশিত হয় না। যেমন, "এশিয়ার কৃষি প্রধান সমাজগুলির উন্নত সামন্ততন্ত্রের পর্বে যে-উত্তরণ লক্ষিত হয় তের শতকের গোড়ার দিকে সেটা প্রধান-প্রধান দিক থেকে ব্যাহত হয় মঙ্গোলীয় অভিযানের ফলে, তাতে উৎপাদন-শক্তি বিনষ্ট হয়েছিল। শুধু-তাই নয়, অধিকন্তু বিকৃত হয়েছিল উৎপাদনসম্পর্ক, শাসক মহলগুলির গঠন, প্রশাসনিক কর্মবন্টন, কর ব্যবস্থা, সামরিক সংগঠন। সামাজিক মানসতাও সম্ভবত বদলে দিয়েছিল (কেননা মঙ্গোলীয় জোয়ালে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল মানুষের অন্তরাত্মাই, আর শিল্পকলার বহু রূপান্তরসাধক কৃত্য নষ্ট হয়েছিল। চীনা, কোরীয়, মধ্য-এশীয় আর পারসিক সমাজই শুধু নয়, (কিছুটা কম পরিসরে) ভারতীয় সমাজকেও পিছনে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল বিকাশনের আগেকার পর্বে, তার মানে যে - সমাজ রক্ষা করেছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের সার্বভৌম উপাদানগুলিকে সেখানে পর্যন্ত ঘটেছিল আংশিক অধঃপতন। ১

পাভলভের ধারণা - এই অধঃপতিত সামন্ততন্ত্রের কারণে বুর্জোয়া বৃটেন সামন্ততান্ত্রিক ভারতকে অধীন করতে সক্ষম হয়েছিল এবং একটি বহুগাঠনিক উপনিবেশিক ধরণের সমাজ গঠিত হয়েছিল।

সামন্ততন্ত্রের শুরুতে দেখা যায় দাসপ্রথার বিলুপ্তি এবং ভূমিদাস প্রথার উদ্ভবের প্রক্রিয়ার সাথে দাস উৎপাদন ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ও ভূমিদাস উৎপাদন ব্যবস্থার তুলনা-মূলক গতিশীলতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। Melotti মার্কসবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ও দাস উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় উত্তরণে মার্কসীয় ব্যাখ্যায় একমত হয়ে বলেন,

---

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ-৩৫৪

Dhaka University Institutional Repository

"The rise of feudaliam was admittedly fecilitated by the inherent contradictions of the classical mode of production and in particular the economic limitations of slavery, which spurred the need for some more flexible mode of production. "1.

এই গতিশীলতার সাথে দাস ও ভূমিদাসের উৎপাদন ও পণ্য তৈরীর ক্ষমতার ও শ্রমশক্তির উৎপাদনমুখী কার্যকরীকরণের গুণগত পার্থক্য দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিল। দাস ও ভূমিদাস উৎপাদন ব্যবস্থার পার্থক্য উল্লেখ পূর্বক পুঁজি গ্রন্থে মার্কস বলেছেন, ভূমিদাসেরা ক্রীতদাস অপেক্ষা মুক্ত মজদুর (শ্রমশক্তিধারী) হিসেবে উৎপাদনে অংশগ্রহন করতে পারত। তারা নিজেদের জন্য উৎপাদনের সাথে সাথেই ভূস্বামীর জন্য উৎপাদন, করত এবং কিছুটা হলেও স্বাধীন মজদুর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। Melotti তার <u>Marx and the Third World</u> গ্রন্থে মার্কসের পুঁজিগ্রন্থের এতদসংক্রান্ত বক্তব্যকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যামূলক উদ্ধৃত করেছেন,

"However much the serf may be in his lord's power, he is nevertheless, unlike the slave, an independent producer in economic terms. That is different from slave or plantation economy, in that the slave works with conditions of labour belonging to another..... not .... as an independent producer. " 2

ভূমিদাস ও দাসদের মধ্যকার এই জাতীয় পার্থক্য এতদসংক্রান্ত তত্ত্বনির্মাণের ক্ষেত্রে অনেকে নির্বিবাদে মেনে নিতে পারেন না। সামন্ততন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভূমিদাসকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে তাদের বাধা আছে। তাদের বক্তব্যের সপক্ষে তারা ঐতিহাসিক -

1. MELOTTI, UMBERTO, "Marx and the Third World", The MacMillan Press Ltd., London, 1977. P-38

2. Ibid. P-36

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। যেমন রাশিয়ায় সামন্তুতান্ত্রিক সমাজ গড়ে ওঠে অষ্টম শতক থেকেই কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে ভূমিদাসপ্রথা গড়ে ওঠে ষষ্টদশ শতক থেকে। পশ্চিম ইউরোপে কৃষকদের ভূমিস্বত্ব সপ্তমশতক থেকে শুরু হয়ে একাদশ শতকে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পঞ্চদশ শতকে বিলীন হতে থাকে। কিন্তু এই ভূমিদাসপ্রথার দ্বিতীয় সংস্করণ শুরু হয় পূর্ব জার্মানী, চেকিয়া, হাঙ্গেরী ও পোলান্ডে ষষ্টদশ শতকে। অর্থাৎ সমগ্র ইউরোপ জুড়ে একই কালে একইরূপ ভূমিদাস প্রথা দেখা যায় না। কথাটা খুবই অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, রূশ সামন্তুতন্ত্র শতাব্দীর পর শতাব্দী চলেছিল ভূমিদাস ছাড়াই। পাভলভ সেই উদাহরণ ধরে বলতে চান প্রাচ্যে এবং ভারতেও সামন্তুতন্ত্র ভূমিদাস ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু তিনি ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতির বিষয়টি স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে উহ্য রাখতে চান। এই পার্থক্যটি সত্যিই এশীয় সমাজচরিত্র সন্ধানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এঙ্গেলস উক্ত পার্থক্যকে এশিয়ার রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্ক এবং রোম সম্রাজ্যীয় রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সম্পর্ককে তুলনামূলকভাবে বিবেচনায় রেখে নিম্নোক্ত ভাবে ব্যাখ্যামূলক বর্ণনা করেছেন :

> "However-as among the Aryan peoples of Asia and among the Russians - the state is born at a time when the commune still works the land collectively, or at most leases the land for a time to the various families, where as a result private property has not yet taken root - there, state power takes the form of despotism. In the Roman territories conquered by the Germans, on the other hand, one finds, as we have already seen, that the individual's share in the fields and pastures has already

Dhaka University Institutional Repository

been transformed into absolute property, freely at the disposal of its owners, and subject only to the common obligations of the mark." 1

ব্যক্তিমালিকানার বিশেষ শক্তির প্রক্রিয়া ছাড়াও দাস থেকে ভূমিদাসে উত্তরণে ইউরোপের এক অনন্য ঐতিহাসিক ঐতিহ্য আছে। যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়গুলি (যেমন, রোমীয় ও গ্রীসীয় সম্প্রদায়) তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বা রাজ্যবিস্তারের জন্য বা বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ ও গ্রাসাচ্ছাদনের দাবী মেটানোর জন্য বিভিন্ন স্বনির্ভর গ্রাম সম্প্রদায়ের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিত। দুর্বল কৃষিসম্প্রদায়গুলি আধিপত্য বিস্তারকারী যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের দাসত্ব ও ভূমিদাসত্ব মেনে নিতে বাধ্য হত। মার্কস নিজে যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের আগ্রাসনের সাথে দাস ও ভূমিদাসত্ব এবং তৎপরবর্তী আর্থসামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্পর্কে বলেছেন যে,

"Warefare is one of the earliest occupations of each of these naturally arisen communities, both for the defence of their property and for obtaining new property ..... If human beings themselves are conquered along with the land and soil as its organic accessories, then they are equally conquered as one of the conditions of production and in this way arises slavery and serfdom, which soon corrupts and modifies the original forms of all communities, and then itself becomes their basis. The simple construction is thereby negatively determined. "2

---

1. MELOTTI, UMBERTO, "Marx and the Third World", The MacMillan Press Ltd., London, 1977. P-43
2. Ibid. P-38

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সামন্ত সমাজে উত্তরণ শুধুমাত্র যুদ্ধের কারণে বা শুধুমাত্র দাসসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলশ্রুত এমন একটি অতিসরলীকৃত ধারণা পোষণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা ঐতিহাসিকভাবে ইউরোপে তেমন ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হয় নি। দাস সমাজব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা দাস সমাজকে বিভিন্ন দিক দিয়ে দুর্বল করে দিয়েছিল একথা ঠিকই। কিন্তু বর্বরদের আগ্রাসী হামলা এবং তাদের সাংস্কৃতিক আধিপত্য সামন্তসমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকাও পালন করেছিল। যে ঘটনা ভারতীয় বা বাংলাদেশের সমাজজীবনে ঘটেনি। Melotti বলেছেন,

> "Slavery was not 'superseded' from within, as a result of historical evolution or a social revolution. It collopsed, along with the Roman Empire, not as a result of its internal contradictions, although these had already undermined it, but under the blows of the so-called barbarian invaders, mostly of Germanic race and culture. " 1

---

1. MELOTTI, UMBERTO, "Marx and the Third World", The MacMillan Press Ltd., London, 1977. P-38

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপে যেভাবে দাসসমাজের বিলুপ্তি ও সামন্ত সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল ভারতে বিশেষত বাংলায় সেই একই ঐতিহাসিক কাল ও ঘটনা পরম্পরা সংঘটিত না হলেও একজাতীয় সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে অনেক এদেশীয় (ভারতীয়) সমাজ-ইতিহাসবিদ মনে করেন। যেমন দামোদর ধর্মানন্দ কোসাম্বী, রামশরণ শর্মা প্রভৃতির কথা বলা যায়। কোসাম্বী Feudalisn from below এবং Feudalisn from above - এই দুইজাতীয় সামন্ততন্ত্রের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। ১ তিনি কিন্তু নিজে কোন একটিতে স্থীর থাকেন নি। এমন কি পুরোপুরি কোনটারই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাও করতে পারেন নি। কোসাম্বী সামন্ততন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার যুক্তি নির্মাণে ব্যস্ত ছিলেন না। তিনি যে দুটি পদ্ধতিতে সামন্ততন্ত্র নির্মিত হতে পারত তার সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে সামন্ত ভূমিমালিকানার অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দেহ করেছেন। তিনি স্মৃতি শাস্ত্র ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের অনুসরণে প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিমালিকানার উপস্থিতির বিষয়ে একমত হয়েছেন। এই ব্যক্তিমালিকানা সামন্তমালিকানা বা রাজকীয় মালিকানা নয়। এটি কৃষকের ভূমিমালিকানা। সামন্ত জমিদার ছিল মূলতঃ কর সংগ্রাহক। স্বৈরতন্ত্রের আমলে তারা স্বাধীন ছিল না। তিনি উল্লেখ করেছেন,

> "The great courtier was sometimes a slave. Unless he was a feudal lord (permanently stationed at considerable distance from the centre for special administrative purposes, like the Nizam-ul-Mulk) or subordinate raja in his own right (in which case the succession was to some extent regular), the emperor was his heir, and often claimed the right. " 1.

---

1. KOSAMBI, D.D., "An Introduction to the study of Indian History", Popular Prakashan, Bombay, 1975. P-385

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সামন্তযুগের এই বিচিত্র মালিকানা ও স্বত্বভোগের নিদর্শন দেখে তিনি মনে করেছিলেন যে, মুসলিম সামন্তযুগের চেয়ে হিন্দু সামন্তযুগের সামন্ত স্বত্ব-উপস্বত্বভোগ অনেক বেশি নিয়মসিদ্ধ ছিল এবং বংশপরম্পরায় ভোগের সুযোগ ছিল । বৃটিশ আমলে সেই প্রাচীন ও মোগল (চাপিয়ে দেয়া) ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি ।

কোসাম্বী ভারতীয় ও ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের তুলনামূলক আলোচনা করে তিনটি বিশেষ পার্থক্য নির্দেশ করেছেন । (যার উপাদানগত বিশ্লেষণ অবশেষে সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্বের প্রতি সন্দেহ আনয়ন করতে পারে ।) তিনি বলেন,

"Three notable characteristics further distinguish Indian from European feudalisn : the increase of slavery, absence of guilds, and the lack of an organised charch." 1

তিনি পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন থেকে এবং সামন্তবাদের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ করেও তার গবেষণালব্ধ উপাদানের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, ঐতিহাসিকভাবে গ্রাম সম্প্রদায়ের সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে একজাতীয় সাম্রাজ্যীয় সামন্ততন্ত্রের বিকাশ হয়েছিল । এবং কৃষিজীবী গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্য গড়ে উঠেছিল । তার ভাষ্যে :

"Some feudal development were inevitable with the growth of small kingdoms over plough-using villages"2

কিন্তু এগুলি সম্রাটের একক কর্তৃত্বাধীনে ছিলই এমন কথা জোর দিয়ে তিনি বলতে চান নি বলে মনে হয় । কেননা তিনি রাজস্ব সংগ্রহ তার গুরুত্বপূর্ণ সন্ধানকৃত সিদ্ধান্তে বলেছেন,

---

1. KOSAMBI, D.D. "An Introduction to the study of Indian History", Popular Prakashan, Bombay, 1975. P-355
2. Ibid. P-296

Dhaka University Institutional Repository

"Taxes were collected by small intermediaries who passed on a fraction to the feudal hierarchy in contrast to direct collection by royal officials in feudalian from above." 1

এই মধ্যেসত্বভোগীদের অস্তিত্ব অনেকেই অনুভব করেছেন। ইরফান হবিব অনেক দেরীতে হলেও উপলব্ধি করেছেন, ভারতে, বিশেষত বাংলাদেশে ধনী কৃষকশ্রেণী ঐতিহাসিককাল থেকেই প্রভুত্ব করে এসেছে সব দিক দিয়েই। শোষণ করেছে। নিয়ন্ত্রণ করেছে। কিন্তু তিনি ছাড়া তার মত স্পষ্ট করে প্রাগুক্ত গবেষকগণ (এশীয় সমাজে সামন্তবাদের প্রবক্তারা) বলেন নি।

অথচ প্রাচ্য আদিম সাম্যবাদের পরেই শ্রেনীসমাজে এরাই-এই ধনীকৃষকেরাই ছিল মূল শোষক শ্রেনী। যারা কোনএকমেই তাদের ঐতিহাসিক শ্রেনী অবস্হান থেকে বিচ্যুত হতে চায় নি। উন্নয়নশীল পরিবর্তনের শর্তগুলির বিকাশ রুদ্ধ করেছে। এবং সমাজকে 'জঙ্গমশর্তমুক্ত' করার প্রয়াসের মূল্যেৎপাটন করেছে তাৎক্ষনিকভাবেই। প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্র তাই মাটিতে দাঁড়ায় নি। অধিকাঠামোতেই অবস্হান করে তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছিল। তর্থাৎ স্বৈরীরা নিজেরা যেমন মালিকানা পায় নি, তেমনি গ্রামসমাজে শ্রেনী সম্পর্কের কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে নি। সম্রাট আওরঙ্গজেব কেতাবীমতে তার সাম্রাজ্যের সকল সম্পত্তির মালিক হওয়া সত্বেও মসজিদ তৈরী করার জন্য জমি এন্যু করেছিলেন। যদি ধরেই নেয়া হয় যে, " ------ হিন্দুস্হানের সম্রাটই হলেন দেশের ভূসম্পত্তির প্রকৃত স্বত্বাধিকারী। ২ তাহলে সম্রাট কেন জমি কিনবেন ? শুধু কি ইসলামী শরিয়ত মানার জন্যই, না দেশাচার ও চলতি প্রথা ও মালিকানার পবিত্রতার প্রতি আইনগত স্বীকৃতি প্রদর্শনের জন্য ? হতে পারে তারা মালিকানা পান নি। বা জবরদস্তি মালিকানা গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত মনে করেন নি। মালিকানার স্হিতাবস্হায়

---

1. KOSAMBI, D.D. "An Introduction to the study of Indian History". Popular Prakashan, Bombay, 1975, P-295

২। ঘোষ বিনয়, "বাদশাহী আমল", সরস্বতী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২। পৃ-১২

Dhaka University Institutional Repository

কোন পরিবর্তন আনেন নি । পরিবর্তন হয়তবা তাদের কাঙ্খিত ছিল না - এই কারণে যে, যে কোন মৌলিক বৈপ্লবিক পরিবর্তন "গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনর্গঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেণীগুলির সকলের ধ্বংপ্রাপ্তি " ১ ঘটাতে পারে । যদি বৈপ্লবিক পরিবর্তন তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তবে, আর্থরাজনৈতিক কারণেই তাদের শ্রেণীস্বার্থে তাদের অস্তিত্বের প্রতি যে হুমকি - সেই পরিবর্তনকেই তারা ঠেকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে । এমনটি মনে করা খুবই যুক্তি সঙ্গত যে, প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের মূলভিত্তির মৌলিক শ্রেণী উপাদান ছিল এই ধনী কৃষক শ্রেণী বা পাতিসামন্তশ্রেণী । এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্র এবং প্রান্তিক পাতিসামন্তশ্রেণীর এই ঐক্য এশীয়সমাজে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে এক মহাঅচলায়তনে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে বেঁধে রেখেছিল ।

পরিবর্তনহীনতার জন্য আর একটি শর্ত কাজ করেছিল বলে কার্ল মার্কস মনে করতেন । তার এই ব্যাখ্যাকে প্রামার্কসবাদী ম্যাক্স ওয়েবার সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । মার্কস এশীয় সমাজে কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্রের মহাকৌশল জলসেচ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে বিশেষ বিশেষ রচনা দাঁড় করালেও এশীয় সমাজের স্থবিরতার কারণ হিসেবে কারিগরশ্রেণীর সাথে কৃষকশ্রেণীর পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন । অনুপম সেন বলেছেন, মার্কস পরবর্তী পর্যায়ে উপলব্ধি করেছিলেন যে, কারিগর শ্রেণী এবং কৃষকশ্রেণীর মধ্যকার সম্পর্কের কারণেই এশীয় সমাজ অধিককাল স্থায়ীত্ব পেয়েছে । তিনি বলেছেন,

> Marx later traced to the interdependence of agriculture and artisn industries rather than to irrigation the base of the Asiatic mode of production and its reason for greater stability than other precapitalist modes of production. 2

১। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার", নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-১, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯ । পৃ- ১৪৩

2. SEN, ANUPAM "The state industrialization and class formation in India", Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-227

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল মার্কসের যে বিশেষ বক্তব্য Max weberগ্রহণ করেছিলেন (কারিগর ও কৃষকশ্রেনীর পারস্পরিক সম্পর্কের বিষয়ে) সে সম্পর্কে মতামত দিতে গিয়ে অনুপম সেন উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। Max Weber তার Religion of India গ্রন্থে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সম্প্রদায়-এর আর্থসামাজিক সম্পর্কগুলি চিহ্নিত করতে গিয়ে মার্কসের এতদসম্পর্কিত ধারনাটি গ্রহণ করে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেছেন -

"Karl Marx has characterised thepeculiar position of the artisan in the Indian Village - his dependency upon fixed payment in kind instead of upon production for the market- as the reason forthe specific stability of the Asiatic peoples. In this Marx was correct. " 1

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় কারিগরশ্রেনীর বিশেষ ভূমিকা এবং কৃষকদের সাথে তাদের সম্পর্কের কারণে শহর, নগর গড়ে ওঠেনি বলে অনেকেই ধারণা করেন। কার্ল মার্কস খুব বেশী করে না বললেও গুরুত্বসহকারে বলেছিলেন যে, এশীয় সমাজ দীর্ঘস্থায়ীত্ব পেয়েছিল যে কয়েকটি কারণে তারমধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সম্পর্ক কার্যকারণ হিসেবে প্রধান ও নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে :

"The individual does not become independent of the community; that the circle of production is self-sustaining, unity of agriculture and craft manufacturer ...." 2

বলা যায় এই মৌলিক সম্পর্কগুলির এক্যবদ্ধতার কারণেই ও মিথস্ক্রিয়ায় এশীয় স্বৈরতন্ত্রের স্বাভাবিক পতন না হয়ে, সামন্তবাদের বিকাশ না হয়ে এশীয় সমাজ স্থায়ীত্ব পেয়েছে।

---

1. WEBER, MAX "The Religion of India", Fre Press, New York, 1967. P-III
2. SEN, ANUPAM, "The state Industrialization and class formation in India" Rontledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-31

- Dhaka University Institutional Repository

যেমনটি ১৮৫৩ সালে তদানিন্তন প্রেক্ষাপটে মার্কস বলেছিলেন তেমন করে হয়ত বলা যায়, আমরা জানি, গ্রামগোষ্ঠীগুলির নিজেদের পরিচালিত সংগঠন ও আর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙ্গে গেছে , কিন্তু এগুলির যা সবচেয়ে খারাপদিক সেই গতবাঁধা ও বিচ্ছিন্ন কণিকায় সমাজের বিচূর্ণীভবন, সেটার প্রাণশক্তি এখনও বজায় আছে । গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা থেকে যা সৃষ্টি, তারতে পথঘাটের অভাব এবং পথঘাটের অভাবের ফলে গ্রামগুলির বিচ্ছিন্নতা হয়েছে চিরস্থায়ী । ১ শহরের বিকাশ না হওয়ার কারণ হিসেবে Gadgil বলেছেন, গ্রাম্য কারিগরশ্রেনী জন্মগতভাবে সুনির্দিষ্ট একটি গ্রামের বাসিন্দা । তারা তাদের তৈরী পণ্য গ্রামের বাইরে বিক্রি করতে পারতো না । ফলে প্রতিযোগিতা, মুক্তবাজার অর্থনীতিক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি গড়ে ওঠেনি । শিল্পনগরী গড়ে ওঠার শর্ত তৈরী হয়নি । সামন্ত নগরী বিধ্বস্ত হয়ে শিল্প নগরী গড়ে ওঠার জন্য মৌলিক শর্ত এদেশে সৃষ্টি হয় নি । কোথাও কোথাও কারিগরশ্রেনীর দ্বারা বড় বড় কারখানা গড়ে উঠলেও সেগুলি কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে বিকশিত হয়নি । ঐতিহাসিক শর্তগুলির মধ্যে কারিগরশ্রেনীর কর্মবন্ধেজে আটকে পড়া একটি মৌলিক শর্ত হিসেবে কাজ করেছে । Gadgil বলেছেন, -----

"The office of the village artisan being hereditary, it stereotyped the whole life of the village." 2

গ্রামগুলির বিকাশ রুদ্ধ ছিল বলেই গ্রাম্য কারিগরশ্রেনীর বিকাশের ও আত্মসমৃদ্ধির নির্ধারক শিল্প নগরী বিকশিত হয়নি ।

এশীয় সমাজের নগরগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট আলোচনা করে Gadgil বলেছেন যে তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল নগরগুলির । ধর্মীয় বৈশিষ্ট, প্রশাসনিক বৈশিষ্ট এবং বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট । তার মধ্যে প্রথম দুটির প্রবণতা ও ঘটনাসংঘটন খুব বেশী । তার বর্ণনায় -

---

১। মার্কস, এঙ্গেলস, " নির্বাচিত রচনাবলী", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯ । পৃ-১৪৭

2. SEN, ANUPAM "The state industrialization and class formation in India,"Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-31

Dhaka University Institutional Repository

"Most of the towns in India owned their existence to one of the three following reasons. (i) they were places of pilgrimage or sacred places of some sort; (ii) they were the seat of a court or the capital of a province; or (iii) they were commercial depots, owing their importance to their peculiar position along trade routes, of these reasons, the first two were by far the most important."1

নগর সভ্যতার বিকাশ না ঘটে গ্রামসভ্যতা যত সুন্দর জীবনব্যবস্থাই দীর্ঘদিন ধরে চালু রাখুক না কেন, বিজ্ঞানের, বিশেষকরে যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতি হয় না। ফলে দেশ ও জাতিসত্ত্বা যন্ত্রকৌশলগত ইতর অবস্থায় নিপতিত হয় এবং পশ্চাদভাবাপন্ন দেশ ও জাতি কর্তৃক বিজিত হওয়ার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। মার্কস বলেছেন, 'এইসব শান্ত সরল গ্রামগুলি মানুষকে বানিয়েছেন নিয়মের এশীতদাস। বিদেশী আক্রমনকারীর অসহায় শিকার। জাতিভেদপ্রথা ও এশীতদাসত্ব দ্বারা কলুষিত করেছে মানুষকে উন্নত না করে, অবস্থার প্রভু না বানিয়ে বাহিরের অবস্থার পদানত করেছে। স্বয়ং বিকশিত একটি সমাজ ব্যবস্থাকে তারা পরিণত করেছে অপরিবর্তমান প্রাকৃতিক নিয়তিরূপে এবং এইভাবে আমদানী করেছে প্রকৃতির এমন পূজা যা পশু করে তোলে লোককে, প্রকৃতির প্রভু যে মানুষ তাকে হনুমানদেবরূপী বানর এবং শবলাদেবীরূপী গরুর অর্চনায় ভূলুণ্ঠিত করে অধঃপতনের প্রমাণ দিয়েছে। ২

এই অধঃপতিত সমাজটি (মূলতঃ কারিগরিকুশলতাহীনতার কারণে) বিজিত হওয়ার জন্য তৈরী ছিল। তাই ভারতে বৃটিশ শাসন সম্পর্কে কার্ল মার্কস বলেছেন যে, "ভারত বিজয়ের অধিকার ইংরেজের ছিল কিনা, এটা তাই প্রশ্ন নয়, প্রশ্ন এই তুর্কী পারসীক রুশদের দ্বারা ভারত বিজয় কি বৃটেনদের দ্বারা ভারত বিজয়ের চেয়ে শ্রেয় বলে ভাবন।" ৩

---

1. SEN, ANUPAM "The state industrialization and class in India", Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-33

২। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিক "নির্বাচিত রচনাবলী", ৩য় খন্ড, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯। পৃ-১৪৩

৩। প্রাগুক্ত। পৃ-১৪৫

Dhaka University Institutional Repository

এই গ্রামসম্প্রদায় তার সম্পর্কে ইরফান হবিব একটি বিশেষ কৌতূহল উদ্দীপক মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন -

"এখন আমার মনে হয়, গ্রাম-সমাজের চেহারাটা যতদূর ধরা যায় তাতে এটি ছিল গ্রামের 'বড়লোক'দের ছোট ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী মারফত গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিষ্ঠান"। ১

আশ্চর্য্য হলেও সত্যি যে এই বড়লোকরা গ্রামে এখনও আছে। ১৯৫১ সালে যশোহরের এক গ্রামের ভূমিমালিকানার শতকরা হিসেবে দেখা গেছে যে, ভূস্বামী/আধাভূস্বামীর অনুপাত হচ্ছে ৬·৫% শতাংশ। ১৮০৬ সালে উত্তর বাংলার প্রতি ১৬ জনের ১ জন ছিল জোতদার। এবং তারা ৩০ থেকে ১০০ একর জমির খাজনা পেত। এই জোতদারের অর্থনৈতিক চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তারা জমির একটি অংশ নিজেরা চাষ করত এবং অন্য অংশে যে চাষ করত সে শস্যের একভাগ পেত। এ সমস্ত চাষীদের বৃহৎ পুঁজি ছিল। ৩ কামাল সিদ্দিকী বলেছেন যে, ষাটের দশকের মতই সত্তরের দশকেও গ্রামের বিত্তশালীদের মধ্য থেকেই গ্রামীণ ক্ষমতার কাঠামো তৈরী হয় ও গ্রামে প্রভুত্ব করে। তিনি দেখিয়েছেন যে, তিনটি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থীর ৬৫% শতাংশ ৭ একরের উর্ধে আবাদী জমির মালিক। ৪ বিখ্যাত ঝগড়াপুর গ্রন্থে বলা হয়েছে গ্রামের শতকরা ০·৫% অংশ অধিবাসী ভূস্বামী এবং ২১% শতাংশ অংশ ধনীকৃষক।[৫] এই ধনী কৃষকেরা খুবই ক্ষমতাশালী। A Bangladesh Village গ্রন্থে চৌধুরী বলেছেন যে (কোন একটি গ্রামের) ৫% ও ০·৫%/যথাক্রমে ধনীকৃষ এবং ভূস্বামী। (তিনি ১০ একরের অধিক জমির মালিককে ধনী কৃষক এবং ৫০ বিঘার অধিক জমির মালিককে ভূস্বামী হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।) ৬

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে,পি বাগচী এন্ডকোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৫, পৃ-১০

২। সিদ্দিকী, কামাল, "বাংলাদেশে ভূমি-সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি", বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৮১। পৃ-১৮

৩। সেন, ডঃসুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা ১৯৮৫। পৃ- ৮

৪। সিদ্দিকী, কামাল, প্রাগুক্ত। পৃ-১৮

৫। আরেন্স, ইয়েনেকা, বুৎরদেব, ইওসকান, "ঝগড়াপুর", গণপ্রকাশনা, ১৩৯২। পৃ-১০৭-১১৫

6. CHOWDHURY, Anwarullah, "A Bangladesh Village", centre for

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন হতে পারে - কারা এই ধনী কৃষক ? সাধারণভাবে বলা হয়ে থাকে যে, কৃষি যাদের জীবন যাত্রার উপায় নয়, মুনাফার উৎস তারাই মূলতঃ ধনী কৃষক। জমিকে মুনাফার উৎস হিসেবে নেয়ার পরও দেখা যায় ধনী কৃষকেরা নিজেদের জন্য কৃষি উৎপাদনও করে থাকে। এই জটিল পরিস্থিতিতে একজন ধনীকৃষককে চিহ্নিত করা বেশ শক্ত। শতবর্ষ পূর্বে একজন প্রখ্যাত বিদেশী গবেষকের চোখে একজন ধনীকৃষক ছিল একজন চাষী যে আংশিকভাবে জমি ভাড়া দিত বা মজুর নিয়োগ করত এবং মুখ্যত বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি করতে আগ্রহী ছিল। সম্পদশালী ও উচ্চকাঙ্ক্ষী এই কৃষকেরা তাদের উৎপন্ন ফসলের বৃহত্তর অংশ বাজারে বিক্রি করা এবং চাষাবাদের উন্নতি করার মানসে সমস্ত জমি একত্র করতে আগ্রহী ছিল। তাদের কৃষি খামার বৃহৎ হওয়ার কারণে দিন মজুর নিয়োগ করতে হত। তার প্রতিবেশীরা গরীব ছিল এবং আরো গরীব হচ্ছিল বলে সামাজিক ক্ষেত্রে অগ্রগতির উপায় হিসেবে তাকে মহাজনীর উপর নির্ভর করতে হত। উৎপাদনের কারিগরী কৃৎকৌশলের উন্নতির জন্য মূলধন নিয়োগ করত না। ধনীকৃষকরা ছিল কৃষকদের সংখ্যালঘু অংশ। কিন্তু বাণিজ্য ও বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তারা গ্রামীণ অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।১

বুকানন হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন যে, দিনাজপুর জেলার কৃষক পরিবারগুলির বিভিন্ন পরিমাপের জমি ছিল। জমির পরিমাণের উপর ভিত্তি করে প্রধান কৃষক, 'বড় কৃষক', 'সম্পন্ন কৃষক', 'গরীব কৃষক' ইত্যাদি বর্গে কৃষকশ্রেণীকে ভাগ করা হয়েছিল। এই বড়ো চাষীরা গরীব চাষীদের ধান কর্জ দিত এবং চড়া হারে সুদ আদায় করত। ১৮৮০-তে বুকানন-হ্যামিলটন লক্ষ্য করেছিলেন যে, নদীয়াতে ২৫টি কৃষক পরিবারের মধ্যে একটি মাত্র পরিবারের ৫টি লাঙল ছিল। আর বাকী সকলেরই ছিল অপেক্ষাকৃত কম। ২ খুলনার একটি গ্রামে ৭০টি জোত ছিল ৪০ থেকে ৫০ বিঘা জমির। রাজশাহীর একটি গ্রামে কৃষক পরিবারের ৬ শতাংশ ২০ বিঘার বেশী জমির

১। সেন, ডঃসুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ-৪১

২। প্রাগুক্ত। পৃ-৪২

Dhaka University Institutional Repository

মালিক ছিল। উপরোক্ত আলোচিত ধনীকৃষকেরা জমি ভাড়া দিত এমন কি লাঙলও। এবং গ্রামে জোতদার হিসেবে তাদের পরিচিত ছিল। ১

সুনীল সেন বলেছেন, জমিদারী, মহালওয়ারী ও রায়তয়ারী - এই তিন রাজস্ব আদায়ের কৌশল হিসেবে নবতররূপে প্রোথিত ভূমিস্বত্বের বন্দোবস্তের দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োগ ও অনুশীলনের ফলে জোতদার শ্রেনী উনিশ শতকে জমিদার ও রায়তদের সাথে সাথে একটি সামাজিক শ্রেনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যদিও ১৮০৬ সালেও দিনাজপুর ও রংপুর জেলায় বুকানন-হ্যামিলটন জোতদারের সন্ধান পেয়েছিলেন। ২

ভারতে - বিশেষত বাংলাদেশে জমির অধস্তন ভোগদখলের নানা স্তর বিন্যাস ছিল, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই ছিল স্হায়ী, হস্তান্তরযোগ্য। উত্তরাধিকারের অধিকার। হস্তান্তরযোগ্য অধিকার প্রয়োগের ফলে অনেক 'নোতুন মানুষ' জমির মালিক হয়েছিল। "বৃটিশ ভারতে জমির মালিকানা অপ্রতিহতভাবে হাতবদল হচ্ছিল যার ফলে গ্রামের ভাবমূর্তি পাল্টে গেল।" ৩ শহরে ও গ্রামে বসবাসকারী মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির একটি বিরাট অংশ জমিতে অধিকার অর্জন করেছিল। এমন কি জমিদার ও কালেকটরেট দ্বারা নিযুক্ত আমলারাও ভূসম্পত্তি কিনতে ব্যর্থ হয়নি। ফলে এই সময় গ্রাম সমাজে একটি পরিবর্তন সুচিত হয় এবং একটি সামাজিক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যারা জমিতে পুঁজিলগ্নী করা লাভজনক মনে করেছিল তারা সুযোগমত জমি কিনতে থাকে। গ্রামীণ দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অকৃষকরা জমি কুক্ষিগত করতে থাকে গোটা উনিশ শতক জুড়ে যে হস্তান্তর প্রক্রিয়া চলেছিল তাতে ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও য়ুরোপীয় নীলচাষের মালিক এবং স্হানীয় মহাজনরা ছিল অধিকমাত্রায়। ৪ জমি হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অনেক পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষনীয় ছিল যে পুরানো গ্রাম সাম্যব্যবস্হার ধ্বংস। সুনীলসেন উল্লেখ করেছেন যে, উনিশ শতকের শেষ দিকে ছোট নাগপুরে পুরানো সাম্যব্যবস্হা ভেঙে পড়েছিল। ৫

১। সেন, ডঃ সুনীল "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ-৪২

২। প্রাগুক্ত। পৃ-৬-১০

৩। প্রাগুক্ত। পৃ-৬

৪। প্রাগুক্ত। পৃ-১৫

৫। প্রাগুক্ত।

– Dhaka University Institutional Repository

জমির ও জমিদারীর ক্রেতারা ব্যবসায়ী ও সুদখোর ছাড়াও আমলাদের মধ্য থেকেও এসেছিল । যেমন বাঙালী আমলারা উড়িষ্যার জমিদারী কিনেছিল । বালেশ্বরের সেটেলমেন্ট অফিসার লিখেছেন যে, এইসব নতুন ক্রেতাদের এক তৃতীয়াংশ ব্যক্তি জমির মালিক হওয়া সত্ত্বেও মহাজনী কারবার করত । বাকীরা ছিল বৃত্তিধারী মহাজন । বালেশ্বরের তিলি মহাজন ও তামিলী বর্ণিক শ্রেনী নতুন ক্রেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল । পুরোহিত শ্রেনীও জমির বড় বড় মালিক হয়েছিলেন । এ সময়ের একজন সেটেলমেন্ট অফিসার লক্ষ্য করেছিলেন যে, "জমিদারী স্বার্থের একঅর্ধাংশ ধর্মীয় ও মহাজন শ্রেনীর হাতে চলে গিয়েছিল । " ১

এইসব হস্তান্তর প্রক্রিয়ার ফলে যে পরিবর্তন হয়েছিল তাতে অনেকে মনে করেন, দীর্ঘকাল ধরে যে সামন্ত বা কুদে সামন্ত প্রথা গ্রামে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাঙ্গন ধরেছে । এবং গ্রামীণ সামাজিক কাঠামোতে বৈষম্য সূচিত হয়েছে – যা আগে ছিল না । কিন্তু অধ্যাপক ষ্টোকস্ উত্তর প্রদেশের কৃষিজ সম্পর্কের বিষয়ে তার সাম্প্রতিক মতামতে ভিন্নমাত্রিক কথা বলেছেন । তিনি এক আগ্রহউদ্দীপক মন্তব্যে বলেছেন, "মূল অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্যটি অনুপস্থিত খাজনাভোগী এবং চাষবাসকারী জমির মালিকদের মধ্যে, যাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল স্বত্ববান প্রজা থেকে শুরু করে স্বত্বহীন প্রজা পর্যন্ত । যা মনে করা হয়, জমিদার ও প্রজাদের মধ্যে পার্থক্য – তা নয় । ২

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার এবং কাজেকাজেই সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়েছে বলে যারা মনে করেন তারা হয়ত স্বীকার করবেন যে, সূর্যাস্ত আইনে এবং এই জাতীয় অন্যান্য বহু রাজস্ব আদায় আইনের (বৃটিশসরকার কর্তৃক) প্রয়োগের ফলে রাজস্ব বকেয়া পাওনার জন্য বহু জমিদারী বিক্রি হয়ে গিয়েছিল এবং সে সব নতুন ক্রেতারা কিনে নিয়েছিল । জমিদারী ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায় ভাল না হওয়ার কারণে বৃটিশ সরকার পূর্বোক্ত তিনটি পদ্ধতির প্রয়োগ ও অনুশীলন করেছিলেন ।

১। সেন, ডঃ সুনীল "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-১৪

২। প্রাগুক্ত । পৃ- ৬

Dhaka University Institutional Repository

যদিও এগুলি ভারতীয় সমাজে বহু পূর্ব থেকেই কোন না কোনভাবে পরিচিত ছিল । জমিদার, মহালওয়ারী, ও রায়তওয়ারী এই তিন রাজস্ব আদায় ব্যবস্থার ফলশ্রুতিতে যে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেনী গড়ে উঠেছিল এবং কৃষিজ উৎপাদনের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল তারা গ্রামবাংলায় অপরিচিত কেউ নয় । প্রাকবৃটিশ আমলেও তাদের অধিষ্ঠান ছিল । এমনকি প্রাকমুসলিম আমলেও তাদের সপ্রতিভ অস্তিত্ব ছিল । বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নামে এদের পরিচয় । এরা গ্রামের মোড়লশ্রেনী, এরাই পঞ্চায়েত - সামাজিক রীতিনীতি নির্ধারক, আবার এরাই সরকারের তরফে রাজস্ব উসুলকারী করইজারাদার ইত্যাদি । এবং সবকালেই এরা গ্রামের ক্ষমতাসীন শ্রেনী । অত্যন্ত আশ্চর্য্য হলেও সত্য যে, প্রাচীন কাল থেকেই অদ্যাবধি ধনী কৃষকশ্রেনী গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের শ্রেনী স্বার্থের কারণেই । অনেক পরিবর্তনই হয়েছে । কিন্তু এই অনুপাতের পরিবর্তন হয় নি । (মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনীকৃষকের জোটের শোষণ-শাসনের আনুপাতিক হার ।) অবশ্যাদৃষ্টান্তে এমনটি মনে করা খুবই সঙ্গত যে, বর্তমান কালের গ্রাম্য সমাজকাঠামোর মূল রহস্য সেই প্রাচীনকালের এশীয় সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ।

এই ধনীকৃষকশ্রেনী ও কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্র পারস্পরিক স্বার্থেই একে অপরকে মদদ জুগিয়ে চিরস্থায়ী করার এবং একই সাথে নিজেরা চিরস্থায়ী হওয়ার চেষ্ট করেছে । দ্বন্দ্ব এদের ভেতরেও ছিল । কিন্তু সে দ্বন্দ্ব ছিল - স্বশ্রেনীর অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের মতই । অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে এই ধনীকৃষকরা, এই পাতিসামন্তরাই বিজয়ী হয়েছে, কাজেই স্থায়ী হয়েছে । কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্রের অনেক ধরণের এবং হামেশাই পরিবর্তন হয়েছে । কেন্দ্রে শোসক শ্রেনী নিজেদের পায়ের নীচে মাটি দখলে রাখতে গিয়ে এতই ব্যতিব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়েছে যে, সমাজে মৌলিক কাঠামোর মধ্যেই যে উদ্বৃত্ত শ্রমের বিচ্ছিন্নতার প্রথাসিদ্ধ পরিমাণ তা থেকেই যতটুকু সম্ভব তারা শোষণ করতে পেরেছে ততটুকুতেই তারা সন্তুষ্ট থাকতে বাধ্য হয়েছে । সমাজের মৌলিক কাঠামো চরিত্রের

Dhaka University Institutional Repository

কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারেনি । তবুও নিঃসন্দেহে বলা যায় সেই হাজার বছর আগেকার সমাজটি আর নেই ।

ভারতীয় সমাজের বিকাশের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাংলাদেশের গ্রাম্য-সাম্প্রদায়িক সমাজের বিকাশ বা সামন্তবাদের বিকাশ কোন পর্যায়ে পৌঁছে ছিল তা বিষদভাবে জানার আগ্রহ যতই প্রবল হোক, যতই প্রয়োজনীয় হোক সন্দেহমুক্ত মনে গ্রহণ করা যায়, নির্বিচারে গ্রহণ করা যায় এমন একক বক্তব্য পাওয়া যায় না । পন্ডিতগণ যেমন একজাতীয় অবিকশিত সামন্ততন্ত্র দেখেছিলেন তেমনি মার্কসবাদীরা অনেকেই কোনজাতীয় সামন্ততন্ত্রের বিকাশই দেখেননি । সাম্প্রতিককালের গবেষকরা, সমাজবিজ্ঞানীরাও এই বিতর্কে বহুধাবিভক্ত ।

এই বিচিত্র অভিজ্ঞান ও অভিমতের প্রেক্ষাপটে "এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ : সন্ধান ও বিচার" গবেষণা কর্মের পরিকল্পনা গ্রহন করা হয়েছে ।

পদ্ধতি : আলোচ্য গবেষণায় প্রধানতঃ ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে । বিভিন্ন ঐতিহাসিক, সামাজিক রাজনৈতিক-অর্থনীতি, সামাজিক নৃবিজ্ঞান ইত্যাদি আকর ও গবেষণা গ্রন্থের তথ্য ও তত্ত্বাবলী উৎসরিত উপাদান সমাজবিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তার আলোকে ব্যবহৃত হয়েছে ।

ইতিহাস ও সমাজ ইতিহাসবিদদের সমাজবিজ্ঞান ও নৃবিজ্ঞানমূলক বক্তব্য ও মতামতকে গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সমাজবিজ্ঞানের প্রচলিত পদ্ধতির কাঠামোতে ব্যবহার করা হয়েছে । যদিও রাজনৈতিক অর্থনীতির বা অর্থশাস্ত্রীয় (Political Economy) মূল সুরকে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে সর্বত্র এবং তার

Dhaka University Institutional Repository

দৃষ্টিভঙ্গির ও বিচার বৈশিষ্টকে প্রাধান্য দিয়ে অন্যান্য মতামতকে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোন মৌলিক তথ্য ও তত্ত্বকে স্বাতন্ত্র্য থেকে বিচ্যুত করা হয়নি। বলা যায় পদ্ধতিকৌশলগত কারণে এই গবেষণাটি রাজনৈতিক অর্থনীতির লাইনে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি অনুসৃত। সন্দর্ভটি এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিতর্কের সরলীকৃত আলোচনা থেকে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারায় মূল সামন্তসম্পর্কের প্রকৃতরূপ এবং তার আর্থরাজনীতিক চরিত্র সনাক্তকরণ প্রচেষ্ট, কাজে কাজেই, প্রধান দ্বন্দ্ব সনাক্ত-করণ পর্যন্ত বিস্তৃত। কেতাবী ও মৌলিক গবেষক, লেখকদের সব পক্ষকেই সাধ্যমত সমান গুরুত্ব দিয়ে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষ থাকার চেষ্ট করে তাদের উপলব্ধি, সন্ধান ও মূল্যায়নকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে এবং সত্য সন্ধানে পূর্বধারণা প্রসূত ও পক্ষপাতমূলক দুর্বলতা ও মোহ পরিহার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা হয়েছে।

'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' তত্ত্বকে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো গবেষণায় যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতার দিকটির বিষয়ে সচেতন থেকে উক্ত প্রত্যয়টিকে তার সকল সম্ভাবনার আঙ্গিকে ব্যবহার করা যায় সে বিষয়ে একটি সচেতন প্রয়াসকে কার্যকর রেখে গবেষণা চালনা করা হয়েছে। এমনকি ভিন্নমতাবলম্বীদের আবিস্কার ও উপলব্ধির তুলনামূলক পর্যালোচনা করে যুক্তিযুক্তভাবে প্রাগ্রসর মতামতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কিন্তু কোন পক্ষকেই খাটো করা হয় নি।

'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের সামন্তবাদ ঃ সন্ধান ও বিচার' মোট দুটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ের 'ভূমিকা' নাম। এর দুটি অংশ। দ্বিতীয় অধ্যায় 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব' বিষয়ক বিষদ আলোচনা। এই আলোচনায় কার্লমার্কসের 'এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা' সম্পর্কিত মতামত ও গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞানের রূপকাঠামো

Dhaka University Institutional Repository

তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । মোট চারটি পরিচ্ছেদে এই অধ্যায়টি বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে কার্লমার্কসের ব্যাখ্যা, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট, তৃতীয় পরিচ্ছেদে এশীয় সমাজে রাষ্ট্র ও গ্রাম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক, এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে শ্রেনীদ্বন্দ্বের রূপ বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে ।

তৃতীয় অধ্যায়টি মুলতঃ 'প্রাকবৃটিশ সার্বভৌম ভারতীয় গ্রামসম্প্রদায়' সম্পর্কে আলোচনা । দুটি পরিচ্ছেদে । প্রথম পরিচ্ছেদে হেনরী মেইন, ম্যাটকাফ এবং কার্লমার্কসের ধারণা এবং মুল উৎসের সাথে তাদের সম্পর্ক সুত্র আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ধ্রুপদী লেখকদের আলোচনা এবং এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাম্প্রতিক মতামত তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে । শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার্থে এর দুটি পরিচ্ছেদ ।

চতুর্থ অধ্যায়ে বাংলাদেশের সামন্তবাদের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করা হয়েছে । দুটি পরিচ্ছেদে এই আলোচনা সীমাবদ্ধ । প্রথম পরিচ্ছেদে হিন্দু শাসন আমলে বাংলাদেশের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ এবং দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মুসলমান শাসন আমলে বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ-সুত্র সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে । এই দুটি পরিচ্ছেদে সামন্ত উৎপাদন সম্পর্কের সামাজিক উপাদান সমুহ খুঁজে বের করা এবং তাদের মিথস্ক্রিয়ার ফলশ্রুতি সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে । (কোন দুটি বহুল বিতর্কিত এবং ভুমিকায় প্রসঙ্গসুত্র আছে।) পঞ্চম অধ্যায়ে বাংলাদেশের সামন্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হয়েছে । দুটি পরিচ্ছেদে অধ্যায়টি বিন্যস্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিমালিকানার পরস্পর বিরোধীরূপ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে । মুলতঃ বিতর্কের উৎস এটাই ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গ্রামগোষ্ঠীমালিকানা ও সামন্তমালিকানা, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সন্ধান করার চেষ্টা করা হয়েছে । প্রাসঙ্গিকভাবে এই পরিচ্ছেদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার স্বৈরাচারী রূপ নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে । এশীয় স্বৈরাচারের দুই ভিন্ন প্রকৃতির রূপকে দৃশ্যমান করার চেষ্টা করে এই পরিচ্ছেদকে দুটি ভাগে ভেঙে দুটি ভিন্নধর্মী আঙ্গিক ও আভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্বের রূপে একই সমাজকে অনুধাবন করার চেষ্টা করা হয়েছে । ষষ্ট অধ্যায়ে দুটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে পাতি সামন্তশ্রেনীর উদ্ভব ও বিকাশ (সেই প্রাচীন কাল থেকে সাম্প্রতিক/আধুনিককালের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষতঃ প্রাকবৃটিশযুগের আদলে ও কালের বৈশিষ্ট্যে) আলোচনা করা হয়েছে । দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ আলোচ্য সন্দর্ভটির উপসংহার । সমগ্র অধ্যায় সিদ্ধান্ত উপসংহার হলেও শুধুমাত্র আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত । প্রথম পরিচ্ছেদে পাতিসামন্তশ্রেনীর উৎপত্তি ও বিকাশ এবং প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক এবং গ্রামসম্প্রদায়ের শ্রেনী কাঠামোতে তার অবস্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে । এখানে বিশেষভাবে পাতিসামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় ক্ষুদে সামন্ত মহাজন এবং ধনীকৃষকশ্রেনীর শ্রেনী বন্ধন এবং পারস্পরিক স্বার্থসমঝোতার মাধ্যমে পুরো গ্রামসম্প্রদায়কে দখল করা এবং উদ্বৃত্তমূল্য আত্মসাৎ করার কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । উপসংহারে সেই পাতিসামন্তশ্রেণীর শ্রেণীগত অবস্থান এবং সমাজকাঠামোতে তাকে সনাক্ত করণের চেষ্টা এবং একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে । আমরা ভূমিকার দ্বিতীয় অংশ বাংলার ঐতিহাসিক সামাজিক প্রেক্ষাপটের বহুধা বিস্তৃর্ণ বৈচিত্রময় ঘটনাসংকুল দৃশ্যপট হাতে নিয়ে মূল গবেষণায় প্রবিষ্ট হয়েছি পরবর্তী অংশ ভূমিকা - খ পরিচ্ছেদ থেকেই ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা - ১

বাংলা নামে দেশ । গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদী অববাহিকায় প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি নানারূপ রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পরিবর্তনের পরও ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীরা মোটামুটি একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশের উত্তর সীমায় সিকিম এবং হিমালয়ের কাঞ্চনজঙ্ঘা । তার নিম্ন উপত্যকায় দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলা । তাদের পশ্চিমে নেপাল ও ভুটানের রাজ্যসীমা । উত্তরপূর্বদিকে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত । এই নদ প্রাচীনকালে পুন্ড্রবর্ধন ও কামরূপ রাজ্যের সীমা । এই ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত প্রাচীন বাংলার রাজ্যসীমা ও বর্তমানের সাংস্কৃতিক রাজ্যসীমা ।

বাংলার পূর্বসীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্রনদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা । ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম শৈলশ্রেনী যে বাংলাদেশকে ব্রহ্মদেশ থেকে পৃথক করেছে । তাই উল্লেখিত দুই শৈলশ্রেনী বাংলার পূর্ব-দক্ষিনসীমা নির্দেশ করে ।

বাংলার পশ্চিম সীমা উত্তরপ্রান্তে মালদহ ও দিনাজপুর । কিন্তু প্রাচীনকালে গঙ্গার তট ধরে দারভাঙ্গা জেলার পশ্চিম সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । পূর্ণিয়া মোঘল আমলে সুবা বাংলার অন্তর্গত ছিল । ভূ-প্রকৃতিকে ও ভাষার মিলে উত্তর-বিহার ও মিথিলা বঙ্গদেশের সঙ্গে একীভূত ছিল । প্রাকৃতিক ভূমি নকশা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজমহল থেকে অনুচ্চ শৈল শ্রেণী, শৈরিক পার্বত্যভূমি দক্ষিণে প্রসারিত হয়ে মৌরভ বালেশ্বর স্পর্শ করে সমুদ্র পর্যন্ত গিয়েছে । বাংলার দক্ষিণ সীমায় বঙ্গোপসাগর । এর তট ঘিরে মেদেনীপুর, চব্বিশ পরগনা, খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর ত্রিপুরা ও নেয়াখালী, চট্টগ্রামের সমতট ভূমির শস্যশ্যামল আস্তরণ । ১

'Every day life in the Pala Empire' গ্রন্থে বলা হয়েছে, হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বাংলার ভৌগলিক সীমা বিস্তৃত । তিনি বিশাল বাংলার ঐতিহাসিক অস্তিত্বের উল্লেখ প্রসঙ্গেই এই সীমার উল্লেখ করেছেন ।

১। রায়, নীহার রঞ্জন, "বাঙালীর ইতিহাস" দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ পৃ- ৬৭-৭১

2. On the north it is hemmed in by the mountain wall of the Himalayas, South wards lies the Bay of Bengal. ,,,,,,It lies roughly between 27.9'and 20.50'north latitude.
HUSSAIN, S., "Everyday life in the Pala Empire",Asiatic Society of Pakistan, Dacca, 1968. P-1.

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার এই সীমা এখন আর নেই । এখন বাংলা বলতে বাংলাদেশ এবং একটি বিচ্ছিন্ন অঞ্চল পশ্চিম বঙ্গ ভারতের অংশীভূত । আমাদের আলোচ্য বাংলাদেশ । এর সীমার মধ্যে কোন না কোন ভাবে বর্তমান বঙ্গদেশের (বাংলাদেশ + পশ্চিম বঙ্গ) সীমা ছাড়িয়েও উল্লেখিত এলাকা আসবে । কেননা এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা, মধ্যযুগীয় সামন্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি আলোচনাকালে কখনই আদি বঙ্গভূমির সীমাকে অস্বীকার করা যায় না । কোন না কোন ভাবে এই সমস্ত জনপদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বঙ্গদেশের অন্যান্য জনপদকে বিপুলভাবে প্রকাশিত করেছে । যেমন নবাব সিরাজুদ্দৌলার আমলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব ব্যবস্থা একই ছিল । সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ নেপালকে ঢাকার অনুর্গত করেছিলেন এবং সুদীর্ঘকাল একই রাজস্ব ব্যবস্থার অধীন ছিল এবং অনুর্বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের কারণে একীভূত হয়েছিল ।

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই স্বাধীন দেশ হিসেবে একই জাতিগোষ্ঠীর কয়েকটি বিশেষ কৌমের নামে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট নিয়ে বিকশিত হয়েছিল । প্রাচীন বাংলার জনপদের ও সভ্যতার অতিপ্রাচীন অস্তিত্ব সামপ্রতিক খননের ফলে প্রকাশিত হয়েছে । 'পান্ডুরাজার ঢিবি তে তাম্র-প্রস্তর যুগের সাংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া গেছে । এই সভ্যতা সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব ২০০০ বছরের প্রাচীন । ১ ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, গাঙ্গেয় সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার মতই প্রাচীন ও ঐতিহ্যমন্ডিত । এই গঙ্গা নদীর অববাহিকায়, গ্রীসীয় ইতিহাসবিদ ভায়োডোরাস লিখেছেন, গঙ্গারিডি নামে এক শক্তিশালী জাতি বাস করত । তারা সামরিক শক্তিতে (প্রচুর হাতির কারণে) অপরাজেয় । তিনি আরো বলেছেন, এখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং মানুষের মর্যাদা সমুন্নত ছিল । কেহই ক্রীতদাস বলে পরিগণিত হত না । ২

১। সরকার, ডঃ দীনেশচন্দ্র, "সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ", সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯ । পৃ- ১৯৩-১৯৪

২। গুহ, রজনীকান্ত, "মেগাস্থেনীসের ভারত-বিবরণ", বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৫ । পৃ-৫-১০,২১

Dhaka University Institutional Repository

এই সুসভ্য সমৃদ্ধ শক্তিশালী জাতি বঙ্গাঃ, রাঢ়াঃ, পুন্ড্রাঃ গৌড়াঃ, ইত্যাদি কৌমে বিভক্ত ছিল । ১ প্রতিটি কৌমের সার্বভৌম ভৌগলিক এলাকা ছিল । পরবর্তী পর্যায়ে কৌম ভেঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে একটি বৃহৎ জাতিসত্ত্বা - বাঙালী জাতিতে পরিণত হয় । বাংলাদেশ বিভিন্ন সময়ে কলেবর বৃদ্ধিও করেছিল । যেমন অনেকে বঙ্গের সাথে অঙ্গ ও কলিঙ্গের যোগসুত্র নির্ধারণ করে একই দেশের তিনটি বিভিন্ন এলাকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন । বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজুদ্দৌলা বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব ছিলেন । এইজাতীয় বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ও সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে দেখা যায় যে, হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিভিন্ন জনপদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল । তবে বঙ্গ, হরিকেল, সমতট, পুন্ড্র, পুন্ড্রবর্ধন, বরেন্দ্র, রাঢ়া, সুহ্মভূমি, গৌড় প্রভৃতি প্রায় বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত জনপদগুলি গুপ্তযোগের আগেই বাঙালী জাতির একক আবাসভূমি হিসেবে একিভূত হয়েছিল । রাজা শশাঙ্কের আমলে পুন্ড্রবর্ধন, সমতট, তাম্রলিপ্তি ও কর্ণসুবর্ণ একিভূত হয়ে এক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল । বাঙলাদেশের অন্তর্বাণিজ্যের ও বহির্বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির প্রয়োজনে বিচ্ছিন্ন সামন্তরাজ্যগুলি একক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার আর্থসামাজিক দাবী ও চাহিদা পুরণের জন্য এবং বহিঃশত্রুর আক্রমন থেকে আত্মরক্ষা এবং নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের নিরসনকল্পে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গোপালদেবকে (৭৫০-৭০ খৃঃ) সার্বভৌম রাজা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে । বলা যায় অখন্ড বাংলাদেশের সার্বভৌম অস্তিত্ব তখন থেকেই আত্মপ্রকাশ করে । ২

শুরু থেকেই ভৌগলিকভাবে ক্ষুদ্র বাংলাদেশ বিপুলায়তন জনসংখ্যা ধারণ করেছে । ঢাকা একদা পৃথিবীর অন্যতম সর্ববৃহৎ নগরী হিসেবে গড়ে উঠেছিল । দুর্ভিক্ষ, মহামারীতে মাঝে মাঝে লোকসংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও অনুকূল জলবায়ু ও ভূমির উৎপাদিকা শক্তির

১। রায়, নীহাররঞ্জন, " বাঙলার ইতিহাস",দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা,১৪০০। পৃ- ১০৮

২। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন, " বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা" , সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ- ১৮

Dhaka University Institutional Repository

কারণে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কোন সময়েই খুব একটা কমে নি । বরঞ্চ ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বৃদ্ধির হার বেশিই ছিল ।

১৮৭২ সালে যুক্ত বাংলার লোকসংখ্যা ছিল ৩·৪৬ কোটি । ১৯০১ সালে বৃদ্ধিপেয়ে ৪·২৮ কোটি হয়েছিল । ১৯৩১ সালে ৫·১০ কোটিতে পরিণত হয়েছিল ।১

১৭০০ সালে পূর্ববাংলার (বর্তমান বাংলাদেশের) লোক সংখ্যা ছিল ১·৭ কোটি ১৮০০ সালে ২·০ কোটি । ১৯৪১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩·৮৮ কোটিতে পরিণত হয়েছিল। বর্তমানে (১৯৯০ সালে) ১১·৫ কোটিতে পৌছেছে । ২

এই বিশাল জনসংখ্যার সুলপায়তনের (১৪৮৩৯৩ বর্গকিলোমিটার) বাংলাদেশ । এর সামাজিক-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কগুলি নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিক চাহিদার কাছাকাছি গবেষণা ও মৌলিক রচনার পরিমাণ কাঙ্খিত পর্যায়ে দাঁড়ায়নি । প্রায় ক্ষেত্রেই ভারতবর্ষের রাজনৈতিক-অর্থনীতির বিষয়ে লেখালিখির ভিতরে বাংলার কথা যতটা এসেছে তাই নিয়েই বোধহয় বুদ্ধিজীবীসমাজ সন্তুষ্ট থেকেছে ।

এই অন্ধকারের মধ্যেও দুই এক জন অত্যন্ত সাহসী সমাজ গবেষক বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, ভূমি-ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক অর্থনীতির ওপর কিছু কিছু মৌলিক কাজ করেছেন । দলিলপত্রের দুস্প্রাপ্যতার ভিতরেও তারা যেভাবে তাদের তত্ত্ব ও চিন্তাকে দাঁড় করিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসার দাবী রাখে । যেমন আজিজুল হক, তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Man Behind the Plough' কেউ কেউ রাজনৈতিক কারণে বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতিকে সনাক্ত করার চেষ্টা করেছেন এবং তাদের দৃষ্টিতে তারা সঠিকভাবেই সনাক্ত করছেন, যেন আব্দুল হক, আধা-উপনিবেশিক - আধা-সামন্ততান্ত্রিক কাসেদ আলী, বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক, আখলাকুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষি প্রধান কিন্তু ধনতান্ত্রিক এবং বদরউদ্দীন, উমর অবিকশিত

১। হক, এম,আজিজুল "বাংলার কৃষক", বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২ । পৃ- ১৮২

২। আকবর, মুহম্মদ আলী, "বাংলাদেশের জনসংখ্যা সমস্যা ও পরিবার পরিকল্পনা : সমাজ উন্নয়ন ও সমাজকর্মের পরিপ্রেক্ষিত", ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৯৮৯। পৃ-৫

Dhaka University Institutional Repository

ধনতন্ত্রের তত্ত্ব নির্মাণ করার চেষ্টা করেছেন । ১

বৃহৎ গবেষণা হিসেবে আজিজুল হক ছাড়া আর কারো গ্রন্থ গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও এদের সবাকার তত্ত্ব একীভূত করলে একটি বৃহৎ গবেষণা গ্রন্থ হবে এবং সেখান থেকে বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনীতির পরিচিত রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে । কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কেউ-ই বিতর্কের উর্ধে দাঁড়াতে পারে না এবং প্রায় ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণতার কারণে বিশ্বস্ততা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হয় ।

বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনাকালে দেখা যায় জনপদগুলি সম্মিলিতভাবে একটি রাজ্যাধীনে আসার আগে ও পরে বহুবার রাজনৈতিক ভূগোলের মানচিত্রে পরিবর্তন হয়েছে এবং কোন একক রাজবংশ দীর্ঘ-দিন রাজত্ব করতে পারিনি । একই সাথে কোন একটি নিয়ম দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কিম্বা চিরকালের জন্য সামাজিকভাবে গৃহীত হয়নি । খৃষ্টপূর্ব থেকে অষ্টদশ শতক পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ বিভিন্ন রাজবংশ কিংবা বাংলার বাহিরের সম্রাটেরা বাংলার বিভিন্ন অংশ শাসন করেছে । ফলে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ ইত্যাদি শাসনামলে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে একীভূত হয়ে একে অপরকে প্রভাবিত করেছে । ২

প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের লেখক নীহাররঞ্জন রায় তার 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ভূমিদান ও ক্রয়-বিক্রয় রীতি আলোচনা কালে বলেছেন, পঞ্চম শতক থেকে অষ্টম শতক পর্যন্ত ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ে সামাজিক নিয়মের নির্দেশন পাওয়া যায় । যেমন বৈগ্রাম তাম্রপট্টোলীতে দেখাযায় একসাথে দু'ভাই ভোয়িল ও ভাস্কর, একত্রে রাজ্যসরকারের কাছে ভূমি-ক্রয়ের আবেদন জানাচ্ছেন । পাহাড়পুর পট্টোলীতে দেখা যায় ব্রাহ্মণ নাথশর্মা ও তাহার স্ত্রী রামী একই সঙ্গে আবেদন উপস্থিত করছেন । ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সাধারণ গৃহস্থও হতে পারে, অথবা রাজসরকারের কর্মচারী বা তৎসম্পর্কীত ব্যক্তি বা অধিকরণের সভ্যও হতে পারে ।

১। উমর বদরুদ্দীন "বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি", বাংলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা । ১৯৮৫
- খালী, কাসেদ, "জনগনতান্ত্রিক বিপ্লব", চলন্তিকা বইঘর, ঢাকা ১৯৮০
- রহমান, আখলাকুর, "বাংলাদেশের কৃষিতে ধনতন্ত্রের বিকাশ", সমীক্ষণ পুস্তিকা, ঢাকা । ১৯৭৪ ।

২। বাংলার বিভিন্ন রাজবংশের কালানুক্রমিক তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে বর্ণিত হয়েছে ।

Dhaka University Institutional Repository

ধনাইদহ তাম্রপট্টোলীতে দেখা যায় ভূমি ক্রেতা হচ্ছেন একজন আয়ুওক্ক বা রাজকর্মচারী । ১ এই সময়ে ভূমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যও সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মীয়কাজে ভূমি ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টি আছে এবং দেখা যায় রাজসরকার জমি বিক্রয় করছেন । ভূমির মালিক যে রাজা ছিলেন এ সময়ের দলিল - দস্তাবেজে তা প্রমাণিত হয়েছে । ক্রয় যতগুলি দান সম্পন্ন হয়েছে সবগুলিই রাজা কর্তৃক দত্ত । কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বাস্তু ও বাস্তু বিক্রয় অধ্যায়ে সর্ব প্রকার ভূমি, ঘরবাড়ি, উদ্যান, পুস্করিণী, হ্রদ, ক্ষেত্র ইত্যাদি বিক্রয়ের ক্রয় ও রীতির উল্লেখ আছে । এই অধ্যায় হইতে আমরা জানতে পারি, এই ধরণের ক্রয়-বিক্রয় কুটম্ব, প্রতিবাসী এবং সম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্মুখে হওয়া উচিত ,এবং যিনি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়ে ভূমি মুক্তকরে (নিলাম ডেকে) ক্রয় করতে রাজী হবে তার কাছেই প্রস্তাবিত ভূমি বিক্রয় করতে হবে । ২ অনেক সমাজ-ইতিহাসবিদ মনে করেন ভূমিদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা চালু হয়েছিল । এই ভূমিদান ব্যবস্থায় দেখা যায় যে ব্রাহ্মণে বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ভূমির মালিকানা ভোগ করবেন তিনি সকল প্রকার কর হতে মুক্ত হবেন । যেমন প্রাচীন লিপিতে দেখা যায়, সর্বপ্রকার পীড়া ও অত্যাচার হইতে রাজা দত্তক ভূমির অধিবাসীকে মুক্তি দিতে চান । সর্ব প্রকার পীড়া সম্পর্কে কামরূপের দু'একটি তাম্রলিপিতে উল্লেখ আছে । রাজ্ঞী হইতে আরম্ভ করিয়া রাজপরিবারের লোকেরা ও রাজ পুরুষেরা যখন সফরে বাহির হইতেন, তখন সংঘের নৌকা, হাতি, ঘোড়া, উট, গরু মহিসের রক্ষক যাহারা, গ্রামবাসীদের ক্ষেত, ঘর, বাড়ী, মাঠ, পথ ঘাটের উপর নৌকা এবং পশু ইত্যাদি বাধিয়া ও চরাইয়া উৎপাত অত্যাচার ইত্যাদি করিত । অপহৃত দ্রব্যের উদ্ধারকারী যাহারা, তাহারা দান্ডিক ও দান্ডপাশিক অর্থাৎ তাহারা চোর ও অন্যান্য অপরাধীদের ধরিয়া বাঁধিয়া আনিত, যাহারা দন্ড দিত, তাহারাও সময়ে অসময়ে

১। রায়, নীহাররঞ্জন, "বাঙালীর ইতিহাস", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ । পৃ- ১৭৫

২। প্রাগুক্ত । পৃ-১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম বাসীদের উপর অত্যাচার করিত । যাহারা প্রজাদের নিকট হইতে কর এবং অন্যান্য নানা ছোট-খাটো শুল্ক আদায় করিত, তাহারাও প্রজাদের উৎপীড়ন করিতে এুটি করিত না । ইহারা পার্যৌপালনে গ্রামে অস্হায়ী ছাত্রাবাস (Camp) স্হাপন করিয়া বাস করিত এবং শুধু গ্রামবাসীরাই নয়, রাজা নিজেও বোধ হয়, ইহাদের উপদ্রপকারী বলিয়াই মনে করিতেন । বস্তুত রাজকীয় লিপিতেই ইহাদের উপদ্রপকারী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । রাজা কর রহিতকরণ ও উল্লেখিত সর্বপ্রকার পীড়া থেকে ভূমিদাম গ্রহণকারীকে মুক্তি দিতেন । কিন্তু ধর্মোদ্দেশ্য ছাড়া অন্য সকল এস্যু বিএস্য়ে কর দিতে হত । ১

হিন্দু এবং বৌদ্ধ আমলে বাংলার রাজস্ব ব্যবস্হায় দেখা যায় রাজা প্রজা বা মহলওয়ারী খাজনা আদায়ের ব্যবস্হা চালু করা হয়েছিল । ভূমিদানের ফলে যারা ভূমির মালিক হয়েছিলেন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর দিমে । চিরস্হায়ী বন্দোবস্ত এদেশে চালু হবার আগে বাংলাদেশে বহু মধ্যস্বত্ত্বভোগী খাজনা আদায়কারীর জন্ম হয়েছিল যারা অপরের শ্রমের ওপর জীবননির্বাহকারীরূপে খাজনাভোগী হয়ে দাঁড়িয়েছিল । কিন্তু হিন্দু আমলে যে বন্দোবস্ত দেওয়া হত তাতে প্রজা উচ্ছেদের ব্যবস্হা ছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না । কিন্তু ব্রিটিশ আমলে চিরস্হায়ী বন্দোবস্তে জমিদার প্রজা উচ্ছেদের ক্ষমতা পেয়েছিল । '<u>ভারতে কৃষি সম্পর্ক</u>' গ্রন্থে সুনীল সেন চিরস্হায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কালে বলেছেন জমিদারী ব্যবস্হায় ব্রিটিশ সরকার আশা প্র করেছিল কৃষির উন্নতিসাধন হবে এবং রাজস্ব নিয়মিত আদায় হবে । কিন্তু তাদের আশা মিথ্যা প্রমাণিত হয় । ১৭৯০ সালে রায়াতওয়ারী প্রথা চালু ছিল । আলেকজান্ডার রীড বশত্যাপ্রাপ্ত জেলাগুলিতে রায়তওয়ারী প্রথা চালু করেন এবং পরবর্তীপর্যায়ে ১৮০৮ সালে ব্রিটিশ সরকার গ্রামওয়ারী বা গ্রাম্যব্যবস্হার সপক্ষে ঐ প্রথা বাতিল করেন । রায়তওয়ারী ব্যবস্হা সরকার ও কৃষকের

১। রায়, নীহাররঞ্জন, "<u>বাঙালীর ইতিহাস</u>", দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ । পৃ- ১৭৫-১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তৈরী করার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে প্রচেষ্টা সার্থক হয়নি। কেননা, রায়তরা উচ্চবর্ণের অভিজাত রায়ান্ সম্প্রদায় অথবা গ্রামের মোড়লদের প্রতিনিধিত্ব করেন সাধারণ কৃষকদের প্রতিনিধিত্ব করেনা। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে জমিদারী বন্দোবস্তের মত রায়তওয়ারী বন্দোবস্তও সরকার এবং রায়তদের মধ্যে বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্বাধিকারীর উদ্ভব হয়েছিল। এই মধ্যস্বত্ব-ভোগীরা গ্রামের নেতাদের প্রতিনিধিত্ব করতো - নিচুতলার শ্রমজীবী চাষীদের প্রতিনিধিত্ব করতো না। অনেকক্ষেত্রে এরা তাদের জমি প্রজার কাছে বন্দোবস্তে দিত। এবং সুবিধামত খাজনা আদায় করত। ১

বাংলায় মোঘল আমলে যে রাজস্ব ব্যবস্থা ছিল, ব্রিটিশ আমলে তার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। সুনীল সেন উল্লেখ করেছেন যে, দু' হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে লক্ষ লক্ষ লোক যে অধিকারগুলি ভোগ করছিলো এইসমস্ত বন্দোবস্তের ফলে সেই অধিকারগুলি থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছিল। ২ অর্থাৎ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রজার অধিকারহরণ ছাড়া কৃষির কোন মৌলিক উন্নতি হয়নি। উপরন্তু সনাতন জমিদারদের হাত থেকে জমি ও গ্রামসমূহ জমির দালাল, আই ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী ও পুঁজিপতিদের দখলে চলে যেতে থাকে। ৩ যেমন রাণীভবানীর মৃত্যুর পর নাটরের রাজার জমিদারী বহুসংখ্যক ছোট ছোট জমিদারের হাতে চলে যায় এবং এদের অনেকেই ব্যবসায়ী ছিলেন। মহাজনী ব্যবসা ও শস্যের মজুতদারী কারবার যারা করতেন তারা অনেকেই ছোট বড় জমিদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তবে ছোট জমিদার ও ক্ষুদে তালুকের সংখ্যাই বেশী ছিল। ১৮৮২ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় বাংলা ও বিহারের ১১০, ৪৫৬ টি তালুকের মধ্যে ২০,০০০ হাজার একরের বেশী জমির তালুক ছিল ৪০% শতাংশ। অর্থাৎ বড় জমিদার বা সামন্ত (?) খুবই কম ছিল। ৪

১। সেন, সুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ- ২-৫

২। প্রাগুক্ত। পৃ- ৬

৩। প্রাগুক্ত।

৪। প্রাগুক্ত। পৃ- ৭

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার - কৃষক সম্পর্কটি কখনই ভূমিদাস সামন্তপ্রভু সম্পর্কে পরিণত হয় নি । যেমন প্রাচীনকালে তেমনি মোঘল আমলে কিংবা ~~কি~~ বৃটিশ আমলে জমিদার কখনই সামন্ত প্রভু হয় নি । ষোড়শ শতকের শেষভাগে টোডরমল বাঙলায় আসল জমা তুমার নামে ভূমিকর নির্দিষ্ট করেন । তার আগে বাংলার কর ছিল 'গৃহমাগত' শস্যের ভাগ বিশেষ, অথবা রোপিত শস্যের কিছু অংশ । এই দুই ধরনের খাজনার পরিমাণই অনির্দিষ্ট ছিল । এবং পুরোপুরি জমিদারের মর্জির উপর সেই পরিমাণ নির্ধারিত হত । ১

চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন, "জমিদারেরা ত ঠিকাদার মাত্র, জমির মালিক ছিল দেশের রাজা । আকবরী ব্যবস্থায় ও জমিদারেরা ঠিকাদারই রইল বটে, তবে এখন রায়তেরা ঠিকমত খাজনা দিলে, তাদের আর জমি থেকে উৎখাত করা সম্ভবপর হত না । তাদের মর্জির আওতায় বাইরে এসে চাষীরা অনেকটা স্বাধীন ও সুস্থ হল বটে, কিন্তু উদ্ধৃত হল । জমিদার ও রায়তের মধ্যে যে স্বাভাবিক সৌহার্দ্য বর্তমান ছিল তার ও কোনো তারতম্য ঘটল না । মোটের ওপর টোডরমলের এই তুমার জমা' বাংলার চাষীর পক্ষে একটি আশীর্বাদরূপেই গণ্য হল । 'তুমার জমা'র প্রথা অব্যাহত রইল প্রায় একশ পয়ত্রিশ বছর অর্থাৎ মুর্শিদকুলী খাঁর আমল শুরু হওয়া পর্যন্ত ।" ২ দেখা যাচ্ছে প্রজার মালিকানা কোন না কোন ভাবে সবসময়েই ছিল । 'তুমার জমা' য় দৃঢ় হয়েছিল । কিন্তু বৃটিশ রাজত্বে "১৮৬৬ সালের আইনে প্রজাদের অধিকারকে জলাঞ্জলী দেওয়া হল ।" ৩ এর ফল হয়েছিল খারাপ । ১৮৮০ সালের দুর্ভিক্ষ কমিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, স্বত্বহীন প্রজাদের কৃষির উন্নতি সাধন করার ক্ষেত্রে কোন অধিকার নেই এবং কোন উৎসাহ নেই " ৪

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন, "বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ- ২০৭

২। প্রাগুক্ত । পৃ- ২০৮

৩। সেন সুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-৫

৪। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে পুরানো জমিদার-ইজারাদারদের উচ্ছেদ করে নতুন ইজারা দিয়েছিলেন । তার আগে একবার মুর্শীদ কুলী খাঁ জমিদারী বদলে ছিলেন । তিনি মুসলমান জমিদারদের চেয়ে হিন্দু জমিদার শ্রেনী পছন্দ করতেন । তার দৃষ্টিতে মুসলমান ইজারাদারেরা হিন্দু ইজারাদারদের চেয়েও বেশী অকর্মন্য ছিলেন। তাই তিনি মুসলমান ইজারাদার হটিয়ে হিন্দু ইজারাদারদের মধ্যে ভূমি বিলিবন্টন করলেন নতুনভাবে । [1] এই সব অদলবদলের ফলে হিন্দু ইজারাদারদের সংখ্যা বহুলাংশে বেড়ে যায় বাংলাদেশে । তাছাড়া মুর্শিদূকুলী খান আকবর নির্ধারিত খাজনার উপর অতিরিক্ত কর আবওয়াব চাপিয়ে দেন । আবওয়াব বাড়তেই থাকে । আলীবর্দ্দীর আমলে তা বেড়ে প্রায় দশগুণ হয় । এই আবওয়াব থেকেই চৌথ আদায়ও হোত । [2]

এই সব অতিরিক্ত করভারে জর্জরিত চাষী-শ্রেণী ক্রমাগত নিস্পেষিত হচ্ছিল । কর ইজাদার, জমিদারও আর্থিকভাবে দুর্বল হতে থাকল । এর সাথে যুক্ত ছিল দেশীয় সম্পদের পাচার ।

বাংলাদেশের সম্পদ পাচারের শুরু হয় অনেক আগে থেকেই । বর্হিবাণিজ্যের কারণে যা পাচার হত তা অনেকটা পুষিয়ে যেত অত্যাবশ্যকীয় জীবনীয় সামগ্রীর বাণিজ্যিক প্রতিস্থাপনে । কিন্তু স্বর্ণসম্পদ পাচারের কোন প্রতিস্থাপন হয়নি । ফসলের পরিবর্তে 'নগদে' খাজনা আদায়ের নিয়ম চালু হওয়ার পর থেকে কৃষককুল ঋণ করতে বাধ্য হতে থাকে । এই ঋণ আদান প্রদান কাজে স্বর্ণকার মহাজনরা সমাজে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনীতিক আসন গেড়ে বসে । মহাজনী অত্যাচার থেকে বাচানোর জন্য বাংলার রাজা বল্লাল সেন দেশীয় স্বর্ণকার তাড়িয়ে বিদেশী স্বর্ণকারদের ব্যবসা করার সুযোগ সৃষ্টি করেছিলেন । ফল হয়েছিল খুবই খারাপ । ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সতীন্দ্রমোহন, "বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ- ২৪০

২। প্রাগুক্ত । পৃ- ২৩২

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম এডোয়ার্ড ১২৯০ সালে দেশ থেকে ইহুদী বিতাড়ন করলেন এই কারণে যে, ইহুদীরা দেশীয় স্বর্ণকার ঋণদাতাদের প্রতিদ্বন্দ্বি ছিল । কিন্তু ফলে ইংল্যান্ড পুঁজি পাচার থেকে বেঁচে গিয়েছিল । বাংলায় তার উল্টোটি ঘটেছিল । এখানে গুজরাট ও রাজস্থানী কুসীদজীবীরা রাষ্ট্রীয় সহায়তায় আসন গেড়ে বসে এবং স্বর্ণ সম্পদ পাচার হতে থাকে । "ফলে বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা হল ঘায়েল, এবং পরবর্তী কালে রাজস্থানী 'জগৎশেঠ' এসে বাংলার অর্থনীতি তো বটেই রাজনীতি তরণীর হাল ধরে বসতে পারলেন । বাঙালী সমাজ এতে এন্মশঃ দুর্বল হতে লাগলো । ১

সম্পদ পাচার কোন সময়েই বন্ধ হয়নি তবে পরে ভিন্নমাত্রায় সংঘটিত হয়েছিল । "সপ্তদশ শতকের মধ্য থেকে অষ্টাদশের প্রথম পাদ পর্যন্ত বাঙলার শাসকেরা করতেন বিদেশীদের সহায়তায় শোপন ব্যবসা । ফলে দেশের চাষী ও ব্যবসায়ী-এ দলই এন্মশঃ দরিদ্র হতে লাগল । সমাজের রক্তক্ষয় শুরু হল ।" ২ এই সপ্তদশ ও অষ্টদশ শতকেই রাজস্বের চাপ বৃদ্ধির কারণে চাষীসম্প্রদায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় খুবই বেশী এবং বিদেশী কুসীদজীবীরা এসে এন্মশঃ বাঙালী সমাজের তথা জাতির রক্ত শোষনে যোগ দেয় । ৩

পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজরা সম্পদ পাচার শুরু করে উলঙ্গভাবে । এত বিপুল ও নিষ্ঠুরভাবে সম্পদ আহরণ ও পাচার ইতোপূর্বে আর কখনও সংঘটিত হয়নি । ১৭৫৭ সালের আগে ভারতে বৃটিশ সরকারকে প্রভুত পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা আমদানী করতে হোত । কিন্তু পলাশী ভাগ্য বিপর্যয়ের পর অবস্থা সম্পূর্ণ পাল্টে যায় । এবং লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা আমদানীর পরিবর্তে "British trade with India was financed from the wealth collected in India itself".4 ভারতে বৃটিশ বাণিজ্য এবং পরবর্তী পর্যায়ে সমগ্র ভারত শাসনের এবং

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সতীন্দ্রমোহন, "বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা", সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ-২২৪
২। প্রাগুক্ত । পৃ-২২৬
৩। প্রাগুক্ত ।
4. SEN, ANUPAM, "The state industrialization and class formation in India", Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-50

Dhaka University Institutional Repository

বিশাল সামরিক বাহিনীর সমস্ত ব্যয়ভার/বহণ ভারতীয় সম্পদের স্থানান্তরণের কারণেই সম্ভব হয়েছিল । দেশীয় সম্পদের ব্যবহার এবং পাচারকৃত সম্পদের পুর্ণব্যবহারের এই সুযোগ স্পষ্ট হয়েছিল পলাশীর যুদ্ধের পর এবং লর্ড ক্লাইভের মোগল রাজদরবারে খাজনা আদায়ের ক্ষমতা প্রাপ্তির পর থেকেই । ক্লাইভ কাউন্সীলের জনৈক সদস্য L. Scrafton ঘোষনা করেছিলেন যে, বাংলাদেশ থেকে যে লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ইংল্যান্ডে পাচার করা হয়েছে তা দিয়ে এবং তাদের হাতে কলকাতায় যা রয়েছে তা মুক্ত করে কয়েক বছর ধরে বাণিজ্য করা সম্ভব হবে । আর সেই বাণিজ্যে তাদের এক পয়সাও (ব্রিটিশ সম্পদ) ব্যয় হবে না ।

"These glorious successes have brought nearly three millions of money of the nation (Britain); for properly speaking, almost the whole of the immence sums received from the Soubah (Bengal) finally centres in England. So great a proportion of it fell into the company's hands, either from their own share, or by sums paid into the treasury at calcutta for bills and receipts, that they have been enabled to carry on the whole trade of India for three years together, without sending out one ounce of bullion."1

---

1. SEN ANUPAM, "The state, industrialization and class formation in India", Routledge & Kegan Paul, London, Boston & Henley, 1982. P-51
ফ্রাঙ্ক বলেছেন যে, ইউরোপের প্রাথমিক পুঁজিসঞ্চয়ন, যার ফলে শিল্প বিপ্লব হয়েছিল, তার সবচেয়ে বড় আধার ছিল বাংলাদেশ । "The Plunder of Bengal was a major source of 8the primitine capital accumulation8 for the Industrial revolution in Europe" Ibid. P-49

Dhaka University Institutional Repository

বাংলার এই সম্পদ কালে কালে পাচার হওয়ার ফলে এবং প্রাকৃতিক নিয়মে বাংলার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে কৃষকশ্রেণী প্রতি নিয়ত দরিদ্র হতে থাকে । গ্রাম সম্পদ শূণ্য হতে থাকে । বৃটিশ সরকারের অতিরিক্ত শোষণ ও লুটতরাজের ফলে বাংলায় এবং সারা ভারতবর্ষে বহুবার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল । ভারতে হয়েছিল বড় ধরণের দুর্ভিক্ষ বাইশটি এবং বাংলায় সাতটি । (ছোট ছোট আকাল এই হিসেবে ধরা হয়নি । বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১টি বড়ধরণের দুর্ভিক্ষ সংঘটিত হয়েছে ।)

বাংলাদেশের প্রায় সবকটি অঞ্চলই ইংরেজদের দখলে এসেছিল ১৭৬৫ সালের মধ্যেই । পলাশী যুদ্ধের ১৩ বছর পরই বিখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর সংঘটিত হয় । ১৭৬৯-৭০ এর শীতকাল বাংলা সনে ১১৭৬ সাল । হান্টার তার Annals of Rural Bengal গ্রন্থে বলেছেন, ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শীতকালে বাঙলায় যে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তার স্মৃতি দু' পুরুষের মধ্যেও পূরণ হয়নি । এই দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে অনেকেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে দায়ী করেন । " বেভারেজ লিখেছেন যে, দুর্ভিক্ষের প্রকোপ তীব্রতম হবার পূর্বে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরেরা দেশের সব অঞ্চল থেকে সমস্ত ধান, এমনকি বীজধানও সংগ্রহ করল জোর করে । " ১৭৭০ সালের পর আরও ছয়বার ১৭০৩,১৮৮৬,১৮৭৩-৭৪,১৮৯২,১৮৯৭ ও ১৯৪৩ সালে বাংলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল । তার প্রত্যেকটির প্রত্যক্ষ কারণ ছিল ইংরেজ শোষণ ও লুটতরাজের নীতি । ১ তাছাড়া প্রতিটি দুর্ভিক্ষের সাথে ভূমিরাজস্বের সম্পর্ক ছিল । সেন উল্লেখ করেছেন যে, " প্রকৃতপক্ষে ভূমিরাজস্বের বন্দোবস্ত দুর্ভিক্ষের মূলের সঙ্গে খুবই যুক্ত । যে ধরণের ভূমি বন্দোবস্তের আওতায় লোকে বাস করে ও জীবিকা নির্বাহ করে, তার ভাল মন্দের সঙ্গে দুর্ভিক্ষের বিপর্যয়কর ফলাফল প্রতিরোধ করতে জনসাধারণের যে ক্ষমতা তার প্রত্যক্ষ আনুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে । ২ যেমন চট্টোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন " ওয়ারেণ হেষ্টিংস ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সহসা কেন যে পুরনো ৪ জমিদার

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতীন্দ্রমোহন, " বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা', সাহিত্য সংসদ " কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ-২৪৫-২৪৭

২। সেন, সুনীল, " ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা ১৯৮৫

Dhaka University Institutional Repository

ইজারাদারদের বরখাস্ত করে জমির নূতন ইজারা দিলেন তা বোঝা দুস্কর । কেউ বলেন, এটা রাজস্ব বাড়াবার জন্য একটা ফন্দি মাত্র । এর ফলে বাংলার অভ্যন্তরে অশান্তি আরো বেড়ে গেল । পুরনো জমিদারদের অনেকেই মাসহারা পেয়ে বিদায় নিলেন, নূতন নূতন ইজারাদার বেশি টাকা কবুল করে (আর কেউ কেউ বলেন, হেস্টিংসের পকেট ভারী করে) দেখা দিলেন, তাঁরা নিজেদের এলাকায় শান্তিরক্ষার দায়িত্ব থেকেও মুক্ত হলেন । এই অদল-বদলের ফলে রায়তদের কাছ থেকে আগের পাট্টা, অর্থাৎ জমি ভোগ করার অধিকারপত্রও কেড়ে নেওয়া হল । আর চাইকি ? জমি নিয়ে ছিনিমিনি খেলা শুরু হল, চাষীর ওপর অত্যাচারের ও সীমা রইল না" ১

যতবারই ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হয়েছে ততবারই কৃষককুল ও গ্রামসম্প্রদায় কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । কৃষিসংস্কারের ফলে প্রকৃত পক্ষে অগ্রসর কোন উৎপাদন ব্যবস্থা বা জীবনধারা বাংলায় আসেনি । ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন ছাড়া প্রকৃতঅর্থে কোন মৌলিক পরিবর্তন আসে না । বাংলায় বৃটিশ সরকার বুর্জোয়া সমাজ তৈরী হতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল বলে সাধারণভাবে সে সব সমাজবিজ্ঞানীর বক্তব্য আমরা গ্রহণ করে থাকি সেগুলিও আজ প্রশ্নের সম্মুখিন । কেননা বর্তমান কালে অনেক গবেষকই বলেছেন যে, বাংলাদেশে আধা সামন্তবাদ উৎপাদন ব্যবস্থাই বহাল আছে । যেমন রতন খাসনবিশ বা আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী প্রমুখ । আবার অনেকে কৃষিভিত্তিক ধনতন্ত্র বা অবিকশিত ধনতন্ত্রও বলেন । আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী বলেছেন যে, যেহেতু বাংলাদেশে সামন্তবাদ অনুপস্থিত এবং গ্রাম্য ধনীকৃষক, জোতদার, মহাজনরাই ভাগচাষী, ঋণগ্রহীতা ও নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর উপর বিভিন্ন কায়দায় ও চিরাগত উপায়ে শোষণ করছে এবং যেহেতু বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতির সাথে আন্তর্জাতিক

১। চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসতেন্দ্রমোহন, "বাঙলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা", সাহিত্য সংসদ , কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ- ২৫০

Dhaka University Institutional Repository

সাম্রাজ্যবাদের শোষণযোগসূত্র আছে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের মাধ্যমে, তাই এই দেশের উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধাউপনিবেশিক আধা সামন্তবাদী বলা যায় । তিনি আরো বলেছেন যে, মহিউদ্দীন খান আলমগীর একই মত পোষণ করেন । ১

মহিউদ্দিন খান আলমগীর, কামালসিদ্দিকী প্রমুখ গবেষকগণ বাংলার দারিদ্রের রাজনৈতিক অর্থনীতি ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসংগে বলেছেন যে, গ্রামের ধনী কৃষকশ্রেনী প্রতিনিয়ত অধিকতর সম্পদশালী হচ্ছে । মহিউদ্দীন খান আলমগীর তার "Bangladesh : A case of below poverty level equilibrium trap" 2 গ্রন্থে একটি রেখা চিত্র অংকন করে দেখিয়েছেন যে, বাংলার সমাজজীবনে ধণবৈষম্যের ধারা - সমতা থেকে শ্রেনীবিভেদের মাত্রাগতধারা - প্রবাহিত হচ্ছে বাংলাদেশের বুকে প্রাচীনকাল থেকেই । এবং বর্তমানে সাধারণ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে থেকে গেছে এবং উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় প্রকৃতঅর্থেই উচ্চবিত্ত/সম্পদশালী হয়েছে । এবং একটি মেরুকরণ সংঘটিত হয়েছে ।

বাংলাদেশের কৃষি সংকটের সাথে সম্পর্কিত কৃষক যা মুলতঃ ধর্মবৈষম্যের কারণে শ্রেনীঘৃণা এবং তদফলশ্রুতিতে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় দ্রোহ, বিদ্রোহ ইত্যাদি সংঘঠিত হয়েছিল । বর্ণাশ্রম ধর্ম-ব্যবসায়ীদের শোষণের বিরুদ্ধে চাপা আক্রোশ, মুসলিম সমাজের আশরাফ-আতরাফের বৈষম্যজনিত বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে কৃষি বিদ্রোহে রূপ পরিগ্রহ করেছিল । অধিকাংশ ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান কৃষকশ্রেনী মিলিতভাবে বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল । ভারতের বড় বড় বিদ্রোহের মধ্যে দেখা যায় কোন না কোন ভাবে বাংলাদেশের ভূমিকা আছে । কিছু কিছু কৃষক বিদ্রোহ বাংলাদেশ থেকে শুরু হয়ে ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল । তার মধ্যে কয়েকটি যেমন ১৯৩০ সালে ময়মনসিংহের মহাজনবিরোধী কৃষক অভ্যুত্থান, ১৯৪৫ এর হাজং বিদ্রোহ, দেশব্যাপী নীল বিদ্রোহ, মালদহ-দিনাজপুরের সাওতাল বিদ্রোহ, ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহ কাকদ্বীপ বিদ্রোহ, নানকার বিদ্রোহ এবং বিপুলভাবে সামাজিক প্রভাব

1. CHOWDHURY, ANWARULLAH, "Agrarian Social Relations and Development in Bangladesh", Oxford & IBH Publishing co. New Delhic 1982. PP=22-25

2. ALAMGIR, MOHIUDDIN, "Bangladesh: A case of Below Poverty level equilibrium Trap", The Bangladesh Institute of Development studies, Dhaka, 1978. P-88

Dhaka University Institutional Repository

বিস্তারকারী তেভাগার সংগ্রাম পুরোপুরি বাংলার আদিম সংগ্রামী চরিত্রের নিদর্শণ ও গুণাগুণ সম্বলিত । বলা যায় বিদ্রোহের অন্যতম শ্রেষ্টরূপ ভারতের তেলাঙ্গানা বিদ্রোহ ছাড়া অন্যকোন কৃষক বিদ্রোহ বাংলার মত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে মর্যাদাপ্রাপ্ত ও আলোচিত হয়নি । প্রতিটি বিদ্রোহই কোন একটি এলাকায় স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠে সাথে সাথে নিভে যায়নি, কোন না কোন ভাবে এই বিদ্রোহগুলি সমস্ত বাংলায় এমনকি ভারতবর্ষেও ছড়িয়ে পড়েছিল এবং সুদুর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল । ১

বাংলাদেশের কৃষক বিদ্রোহের দীর্ঘ ইতিহাস আছে । বাদশাহী আমলে মুলতঃ কৃষক নিপীড়ণ থেকে কৃষি সংকট ও কৃষক বিদ্রোহের জন্ম । সে আমলে রাজস্ব ও রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি অনেক ক্ষেত্রেই অত্যাচারে পর্যবেশিত হয়েছিল এবং কৃষকরা সর্বস্বান্তও হয়ে যেত ।

হবিব উল্লেখ করেছেন "তাৎক্ষণিক লাভের জন্য যে কোন অত্যাচার করাই ছিল তার (জমিদারের) স্বার্থ । তাতে যদি চাষীরা সর্বস্বান্ত হয়ে যায় তার ফলে সে এলাকায় রাজস্ব দেওয়ার ক্ষমতা লোপ পায় - তাতেও কিছু এসে যেত না ।" ২ 'মোঘল আমলে স্বৈরাচারী অত্যাচার সম্পর্কে ভীমসেন - এর মন্তব্য খুবই চিত্তাকর্ষক । তিনি শুধু রাজস্ব বৃদ্ধি ও আদায়কেই (বদাউনী মনুচি প্রভৃতি উল্লেখ করেছেন - রাজস্ব দাবী মোটানোর জন্য চাষীরা তাদের বৌ-বাচ্চা ও গবাদিপশু বিক্রি করতে বাধ্য হতো) স্বৈরাচারী অত্যাচারের একমাত্র কারণ ও নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেননি । আদায়ের ব্যবস্হাপনাকেও দায়ী করেছেন । তিনি বলেছেন, "সর্বদাই হঠাৎ করে জাগীরের হাতবদল হতো বলে জাগীরের গোমস্তরা চাষীদের সাহায্য করা বা স্হায়ী কোন ব্যবস্হা করা ছেড়ে দিয়েছে ।" ৩ এছাড়াও জাগীরদারদের আমিলরা নিজেদের চাকরীর মেয়াদ সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না । তারাও তাই "স্বৈরাচারের মত" নিষ্ঠুরভাবে রাজস্ব আদায় করত ।" ৪ ব্যবস্হাপনার এই অস্হায়ী অনিশ্চয়তা ও কৃষকস্বার্থ বিরোধী অবস্হার উৎস সম্পর্কে বার্ণিয়ে মন্তব্য করেছেন যে, ইজারাদারের বা জাগীরদারের লোপুপতা ও দৃষ্টিভঙ্গি এর জন্য একটি শর্ত

১। রায় সুপ্রকাশ, "বিদ্রোহী ভারত", বুক ওয়ার্লড, কলিকাতা ১৯৮৩ । পৃ-৩৬-২৮২

২। হবিব ইরফান, "মোঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্হা," কে,পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-৩৪৩

৩। প্রাগুক্ত । পৃ-৩৪৪

৪। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

হিসেবে কাজ করেছে । তিনি বলেছেন, "প্রদেশকর্তা এবং ইজারাদারের চিন্তাধারা ছিল এইরকম ঃ জমির এই অবহেলিত অবস্থার জন্য আমাদের আশ্বস্তি কিসের ? এখানে ভালো ফসলের জন্য কেনই বা আমরা সময় ও অর্থ ব্যয় করব ? মুহূর্তের মধ্যে অধিকার থেকে আমরা বঞ্চিত হতে পারি, আমাদের উদ্যোগের ফলে নিজেদের বা আমাদের ছেলে-মেয়েদের কোন লাভ হবে না । চাষীদের হয়ত অনাহারে থাকতে হবে বা তারা ফেরারী হতে পারে । জমির থেকে যতটা পারি টাকা উসুল করে দেওয়া যাক । ছেড়ে যাওয়ার আদেশ যখন আসবে তখন শুকনো মরুভূমি রেখে চলে যাব । " ১ জাগীরদারদের বা ইজারাদারদের এই মনোভাব সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্য জুড়েই ছিল । বৃটিশরাও একই রকম ইজারাদারী কায়দায় শোষণ করত । ফলে তখনও কৃষকদের উপর অত্যাচার একই রকম বা ক্ষেত্র বিশেষে বেশী হয়েছিল ।

১৭৯৩ সালের অনেক আগে থেকেই ইংরেজরা বাংলাদেশে ইজারাদারী ব্যবস্থা শুরু করে । চিরস্থায়ী ব্যবস্থা চালু হওয়ার আগে থেকেই তারা কলকাতা গোবিন্দপুর, সুতানুটির মাঠ-ঘাট খাল-বিল (যেখানেই ইজারা থেকে আয়ের সুযোগ ছিল) সবই বিভিন্ন মেয়াদী ইজারা দিতে থাকে । চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে বলা যায় তাদের বিভিন্ন মেয়াদী পরীক্ষা নিরীক্ষার ও মুঘল ইজারার অভিজ্ঞতার প্রয়োগ । এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলাফল (কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের প্রেক্ষিতে) একইরকম হয়েছিল । ইজারাদারদের অত্যাচার সম্পর্কে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বর্ণিত হয়েছে যে, " তাহার (অর্থাৎ ইজারাদারের) অতি প্রভূত লোভরূপ" হতাশন শিখা ভূস্বামীর অপেক্ষায় দীর্ঘ হওয়াই সম্ভাবিত । তিনি সেই লোভাগ্নির উপভোগ আহরণার্থে ভূস্বামী সংস্থাপিত নানা প্রকার নিষ্পীড়ণ প্রণালীর কোনভাগই পরিত্যাগ করেণ না বরঞ্চ সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার বৃদ্ধিরই চেষ্টা পায়েন । ——- ইজারার নিরূপিত সময় অতীত হইলেই ইজারাদারের স্বত্ব লোপ হয় । (সেই কারণে) নিঃশেষে ধন শোষণ করিতে পারিলেই তাহার মঙ্গল । ------- তিনি স্বীয় লাভ প্রত্যাশায় উপায়ান্তর চেষ্টা

Dhaka University Institutional Repository

করেন, বিবিধপ্রকার কুটিল কৌশল কল্পনা করতে থাকেন । প্রজার সর্ব্বনাশই সেই সকল বিষম যন্ত্রনার একমাত্র তাৎপর্য । ------ যাহাদিগকে উপর্যুপরি জমিদার, পাওনীদার, ইজারাদার, ও দরইজারাদার এই চারিপ্রভুর লোভানলে আহুতি দান করতে হয় । তাহারা যে কি প্রকারে প্রাণ ধারণ করে, তাহা ভাবিয়া স্হির করা যায় না । তাহাদের দারুণ দুর্দ্দশা বাক্য-পথের অতীত ।" ১

তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় ফৌজদারী ও রাজকর্মচারীদের অত্যাচারের বর্ণনাও উল্লেখিত হয়েছে । অবস্হাদৃষ্টায়ে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বৃটিশ আমলে মোঘল আমলের চেয়ে অত্যাচার বেশী হয়েছিল । আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, কৃষক অসন্তোষ ও কৃষকবিদ্রোহের সাথে রাজস্ব আদায় কৌশল ও ব্যবস্হাপনা দায়ী ছিল । এবং বাংলাদেশে ঐতিহাসিক কাল থেকেই প্রতিবাদ - প্রতিরোধের একটি ধারা (দ্রোহ-বিদ্রোহের ও আন্দোলনের) চালু ছিল । অনেক রাজনৈতিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেও কৃষকদের সংগঠিত করা হতো । অনেকক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহ থেকেই আন্দোলনের ও সংস্কারের সুত্রপাত ও দাবী উঠত । সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, "বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষের কৃষক বিদ্রোহগুলি প্রথমে ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে আরম্ভ হইলেও তাহা ক্রমশঃ সংগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধরূপ গ্রহণ করিয়া বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, কোন কোনটি এমনকি বিস্তারলাভ করিয়াছিল ।" ২ বাস্তব ঘটনা হল বৃটিশ রাজত্বের একেবারে শেষ পর্যন্ত কৃষক বিক্ষোভ তীব্র ছিল এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ জ্বলে উঠেছিল । সাম্প্রতিককালের সাক্ষ্য প্রমাণে দেখা যায় যে সমস্তবর্ণের কৃষকরাই কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল , মুলতঃ আন্দোলন চুড়ান্ত বিচারে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল । পরিচালিত হয়েছিল বলা হল এই কারণে যে, অনেকক্ষেত্রে ধনীকৃষক বা জমিদাররা এই জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল বা পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল । নীলবিদ্রোহ সম্পর্কে সেন, উল্লেখ করেছেন, যদি বিদ্রোহের পক্ষে উল্লেখযোগ্য

১। উমর, বদরুদ্দীন, "চিরস্হায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক", মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৩৭৯ । পৃ-১৭-১৮

Dhaka University Institutional Repository

জনসমর্থন ছিল, তথাপি জমিদার তালুকদার, মহাজন, ধনীকৃষক এবং নীলচাষের কর্মচারীদের মধ্যথেকেই নেতা ও সংগঠকের আর্বিভাব ঘটত । সববিদ্রোহেই উচ্চ কোটির মানুষ নেতৃত্ব দেয়নি । দেখা যায় যে, ১৮৫৯-এর প্রজা সত্বের আইনের ফলে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল ছোট ছোট ভূ-স্বামীর বিরুদ্ধে । বাস্তবিকপক্ষে জোতদাররা ছোট ছোট জমিদারের নির্মম একটা গোষ্ঠিরূপে বিকাশ লাভ করেছিল এবং এরা অরক্ষিত প্রজাদের (মূলত বর্গাচাষী) খুশীমত উচ্ছেদ করতে পারত । ১ শুধু প্রজাসত্ব আইনই নয় - বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রণীত সকল আইন ও সংস্কারনীতি প্রাকধণতান্ত্রিক উৎপাদনের পদ্ধতিকে ক্ষুন্ন না করে মুখ্যত গ্রামের নতুন উচ্চ বর্গের স্বার্থরক্ষা করার লক্ষ্য নিয়ে প্রণীত হয়েছিল । ২ তাই আমরা দেখতে পাই যে, ''প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ বড়ো কৃষক সংগ্রম সামন্ততান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রজাদের অসন্তোষকে প্রতিফলিত করেছিল । ৩

কৃষি সংকট ও কৃষিবিদ্রোহের মূল আর্থরাজনীতিক উপাদান হিসেবে বাংলার কৃষির বন্ধ্যাবস্থা, অকৃষিজীবি, মহাজন ও শহুরে মধ্যবিত্তশ্রেণীর হাতে জমি হস্তান্তরিত হওয়া, কৃষিতে নিয়োজিত শ্রমের নীচু উৎপাদনশীলতা এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্যায়ে সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থরক্ষার ঝোঁক, মহাজনী ঋণের দুর্লংঘবন্ধন ইত্যাদি বিষয়গুলিকে চিহ্নিত করা চলে । এই শর্তগুলিই আবর্তিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন সময়ে এবং সকল বিদ্রোহই মৌলিক কোন স্বার্থসিদ্ধি ছাড়াই সমাপ্ত হয়েছে । এইসব কৃষক বিদ্রোহ বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে দেখা যায় এগুলি জমির উদ্বৃত্তমূল্য শোষণের জন্য উৎপাদ (পণ্য ও জীবনীয়) আত্মসাৎ ও পাতিসামন্তশ্রেণীর ভাগচাষী, মহাজন ও ইজারাদারী ও অন্যান্য গ্রাম্য কায়দায় শোষণ নির্যাতনের বিরুদ্ধে সংঘঠিত হয়েছিল । এবং এইগুলিকে সামন্তউৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে কৃষকযুদ্ধ বা কৃষক অভ্যুত্থান হিসেবে গ্রহণ করা যায় । সাধারণতঃ সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থায় এগুলি ঘটে থাকে । যেমন Dictionary of Philosophy গ্রন্থে বলা হয়েছে,

---

১। সেন, ডঃ সুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ - ১৮৩

২। প্রাগুক্ত । পৃ-১৯৪

৩। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৯৯

Dhaka University Institutional Repository

"The antagonism of feudal society, based on the exploitation of the peasants by the feudal lord (an exploitation not confined to economic coercion alone) gave rise to various forms of social conflict. The most acute forms were popular uprisings and peasant wars. " 1

বাংলাদেশের এই সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার ভাঙনে উপনিবেশিক শাসন যে ভূমিকা পালন করেছিল, কার্লমার্কস যাকে গঠনমূলক হিসেবে উল্লেখ করেছেন তার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দিক (রেল ব্যবস্থা ছাড়া) ইউরোপীয় শিক্ষা ও বাংলার রেনেসাঁ হিসেবে অনেকে উল্লেখ করেছেন। রেনেসাঁ নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে। অনেকে একে কলকাতা কেন্দ্রিক বাবুকালচার বলে উপহাসচ্ছলে উল্লেখ করেছেন। অনেকে খুবই গুরুত্বসহকারে আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণীর পথিকৃৎ বলে গ্রহণ করেছেন। ইংরেজী শিক্ষা ও রেনেসাঁ নিয়ে ভালমন্দ যাই বলা হোক না কেন ইউরোপীয় রেনেসাঁর গুণাগুণ এতে ছিল না এ বিষয়ে সাম্প্রতিক গবেষণাগুলিতে জোরের সাথে বলা হয়েছে।

আমরা সাধারণতঃ বাঙলার 'রেনেসাঁস বা বাঙলার নবজাগরণ বলে বর্ণনা করে থাকি তা শুরু হয় অষ্টাদ্দের শেষধাপে এবং প্রথম পর্ব শেষ হয় উনবিংশ শতকের প্রথম পাদে। প্রথম পর্বের নায়ক ছিলেন তিন জন ঃ স্যার উইলিয়াম জোন্স, রাজা রামমোহন রায় ও পাদরি উইলিয়াম কেরী। এরা তিনজনই ভারতীয় চিন্তাধারা ও ঐতিহ্যের কাঠামোর মধ্যেই এই নব-অভ্যুদয়ের সৃষ্টি ও পুষ্টি করতে চেয়েছিলেন। রেনেসাঁর সাথে যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর মূল সম্পর্ক ছিল তারা সমাজ প্রগতিতে মৌলিক কোন ভূমিকা রাখেনি। জীবন ধারণের জন্য তারা ইংরেজদের অপ্রত্যক্ষ দাসে পরিণত হয়েছিল। তারা এদেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের সাথে একাত্ম হয় নি এবং কোন বিদ্রোহ অংশ গ্রহন করেনি।

---

1. SAIFULIN, MURAD, DIXON, RICHARD, R., Dictionary of Philosoply", Progress Publishers, Moscow, 1984. P-143-144

Dhaka University Institutional Repository

এই বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় ১৮১৩ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে যে সব দ্রোহ-বিদ্রোহ হয়েছিল তাতে সমর্থন করেননি । এমনকি ১৮৫৭ সালের বিরাট জাতীয় অভ্যুত্থানের সময়েও নিরপেক্ষতা (সুবিধাবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা) অবলম্বন করেছিল । ১ এর কারণ হিসেবে নরহরি কবিরাজ বলেন "-----১৮১৩ - ১৮৫৭ এই ঐতিহাসিক পর্বটিতে কোম্পানীর শাসনের সঙ্গে এই সম্প্রদায়ের লোকদের রুজিরোজগার ছিল বাঁধা । এই সম্প্রদায়টি তখন সমগ্র সমাজের একটি সংহত শক্তিতে পরিণত হয়নি । জনসাধারণ থেকে তারা ছিল বিচ্ছিন্ন" । ২

অনেকগুলি কারণেই এই বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়েছিল । তারমধ্যে ইংরেজদের উপনিবেশিক শোষণ কৌশল ছাড়াও এদেশের প্রতিক্রিয়াশীলরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । রামমোহন - বিদ্যাসাগরের, দুজনেরই লক্ষ্য ছিল সামাজিক পুর্ণর্মূল্যায়ন । চরম অধঃপতিত অবস্থা থেকে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করা ও হিন্দু জাতিকে সামাজিক ও অর্থনিতিকভাবে সুস্থ সবল করা এবং পরিনামে স্বাধীন হওয়া এই ছিল তাদের লক্ষ্য । স্বাধীনতার লক্ষ্যের চেয়েও পুরাতন সমাজকে রক্ষা করাই মুখ্য দায়িত্বে পর্যবেশিত হয়েছিল । ফলে গ্রামজনতা থেকে বিচ্ছিন্নতা এসেছিল ।

নতুন মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বাংলার বিদ্যুত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইংরেজী শিক্ষার-মধ্যেই । প্রথমে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় । খ্রীষ্টান মিশনারীরা ও ধর্ম-প্রচারের জন্য নিজেরা বাংলা শেখেন এবং ইংরেজী শেখানোর চেষ্টা করেণ । ১৭৭৪ সালে কলকাতায় সুপ্রীমকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ইংরেজী শিক্ষার অর্থকরী শক্তি বেড়ে যায় । ইংরেজরা ইংরেজী শিক্ষার সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছিল । কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য মহৎ ছিল না । ইউরোপীয় প্রগতিশীল ভাবধারা বিজ্ঞান মনস্কতা প্রচারের জন্য তারা শিক্ষাকে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র অর্ধশিক্ষিত একদল কেরানী তৈরী করার চেষ্টা করেছিল । অনেক বড়লোক ইংরেজদের ভাষা, রুচি, আদব-কায়দা অনুকরণ করলে চাকুরী মিলবে এই সংকীর্ণ মনোবৃত্তির কারণে তাদের সাহায্য করেছিল । ৩

১। কবিরাজ ,নরহরি "স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা", বাণী প্রকাশ , ঢাকা, ১৯৮২ । পৃ-১০১
২। প্রাগুক্ত । পৃ-১০৬
৩। সেনগুপ্ত, সুখময় "বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা" পশ্চিমবঙ্গরাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-১-১৫

- Dhaka University Institutional Repository

হয়ত সবার জন্য ঢালাওভাবে উক্ত মন্তব্য করা যায় না । যেমন অনেকে মনে করেন " রামমোহন এদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন শুধুমাত্র চাকরী সংস্থানের জন্য নয় । এদেশে পূর্ণজাগরণের মাধ্যম হিসেবে তিনি দেখেছিলেন ইংরেজী শিক্ষাকে । তার চোখে ইংরেজী শিক্ষা ছিল - যুগোপযোগী প্রগতিবাদী ভাবধারার বাহন ।" ১

রামমোহনের পরে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বাহক হিসেবে যাঁরা প্রখ্যাত অর্জন করেন তাঁদের সাধারণত ইয়ংবেঙ্গল নামে অভিহিত করা হয় । 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের শিক্ষা শুরু করেছিলেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিত । তারা সমাজে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এবং ইংরেজী শিক্ষার বেশ প্রসার লাভ ঘটেছিল । কিন্তু সে সবই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল উচ্চকোটি সমাজে এবং যে নবচেতনাটুকু উদ্বুদ্ধ হল তা শুধু শহরভিত্তিক । নিম্নকোটি সমাজ এ চিন্তাধারার এতটুকু স্পর্শও পেলনা ।" ২

প্রধানতঃ দুই কারণে উপরোক্ত বক্তব্য ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছিল । (১) মেকলে যে শিক্ষা ব্যবস্থার নীতি প্রবর্তন করেছিলেন সেটি ছিল ডাউন-ওয়ার্ড ফিলট্রেশন বা নিম্ন পরিস্রবন । তিনি বলেছিলেন, ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্য শিক্ষার ব্যবস্থা করলে ভারতবর্ষে একটা শ্রেণীর উদ্ভব হবে যারা, 'Indian in blood and cplour but English in taste,in openions,and in morals and intellect."
এবং (২) কলকাতার সমকালীন প্রধানরা নিজ নিজ সন্তানের উচ্চ শিক্ষার জন্য ১৯১৭তে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন-শিক্ষার জন্য পাঠশালাগুলির সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানের কথা ভাবেন নি । " ৩ উক্ত দুটি মৌলিক কারণে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার-হলেও অনেকগুলি সংস্কারবাদী আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে " পশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ধারার প্রবল স্রোত দেশে এল বটে, কিন্তু তা বইল দেশী খাতেই।" ৪ ফলে নব অভ্যুদায়ের যে প্রথম কাঠামো তৈরী হয়েছিল তা পুরোপরি ভারতীয় । প্রকৃত অর্থে নবজাগরণ দেশকে জাগাতে পারেনি ইয়ং বেঙ্গলদের উৎশৃংখল আচরণের প্রতি সামাজিক ঘৃনার কারণে এবং প্রাথমিক শিক্ষায় ও

১। কবিরাজ, নরহরি " স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা", বাণী প্রকাশ, ঢাকা ১৯৮২ । পৃ-১০৪

২। চট্টোপাধ্যায়, শ্রী সতীন্দ্রমোহন " বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা" সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ । পৃ-২৭১

৩। সেনগুপ্ত, সুখময়, "বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষাঃ বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা, " পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-৭-১৫

৪। চট্টোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত । পৃ-২৭২

Dhaka University Institutional Repository

স্ত্রীশিক্ষার প্রসার না হওয়ার কারণে । বাঙালী মুসলিম সমাজ প্রথম থেকেই ইংরেজদের ভাষা, সংস্কৃতি ও ইংরেজী শিক্ষা বয়কট করেছিল আর্তমানে রাজনৈতিক ঘৃণার কারণে। তদুপরি অনেক বঙ্গমনীষী ইংরেজী শিক্ষার কুপ্রভাব থেকে এদেশকে বাচানোর জন্য জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের কথা ভেবেছিলেন । তাদের প্রভাবে সমাজের অন্দরে ইউরোপীয় দর্শন প্রবিষ্ট হতে বাধা প্রাপ্ত হয়েছিল । ১ কারণগুলি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন - মূলতঃ কোন সংস্কার বা চাপিয়ে দেয়া পরিবর্তনমুখী কার্যএম্মে যে বাংলায় আর্থসামাজিক জীবনে মৌলিক পরিবর্তন আসেনা - সে বিষয়ে একটি সাধারণ ধারণা পেয়া যায় ।

এই অমোঘ অপরিবর্তণশীলতার শৃংখলে, বিক্ষোভে, বিদ্রোহে, অচলায়তনে এক অতিপ্রাচীন ও শক্তিশালী জাতিসত্ত্বা - নিরন্তর পরিবর্তন ও শান্তিকামী বাঙালী জাতি বাংলাদেশে যে ঐতিহাসিক মহাকালরেখায় স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রকৃতির সঙ্গে, রোগব্যাধিজরার সঙ্গে বিদেশী-বিভাষী-বৈরী শক্তি ও সভ্যতার সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম করে আপন অস্তিত্ব বজায় রেখে স্বকীয় বিকাশে উন্নত জাতি ও সভ্যতার সাথে শান্তিপূর্ণসহাবস্হানের যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে তার যে সমাজগর্ভের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক (বৈরী কিংবা অবৈরীমূলক) বৈভবের নিত্য সৃজনশীলতায় তাকে রূপেরঙে সন্ধানের নিমিত্তে সম্পর্ক ভিত্তি ও চরিত্র আবিস্কার করার প্রচেষ্টার প্রাথমিক পদক্ষেপ আমাদের বর্তমান গবেষণা । পরবর্তী অধ্যায়, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্হা সম্পর্কিত আলোচনা থেকে তার যাত্রা ।

১। সুখময় সেনগুপ্ত শিক্ষার সাথে ইউরোপের দর্শনের অনুপ্রবেশে বাধাদানকারী হিসেবে তিনজন মনীষীর নাম উল্লেখ করেছেন । এই ৩ জন মনীষী হচ্ছেন স্বামী বিবেকানন্দ, সতীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ । অবশ্য রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে প্রগতিশীল দর্শনের প্রতি বিশ্বাসস্হাপন করেছিলেন ।

সেনগুপ্ত, সুখময়, " বঙ্গদেশে ইংরেজী শিক্ষা ঃ বাঙালীর শিক্ষাচিন্তা," পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ । পৃ- ৫

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) "এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা" সম্পর্কে মার্কসীয় তত্ত্ব ।

ক। কার্ল মার্কসের মত ও ব্যাখ্যা :

সমাজ একটি গতিশীল সত্ত্বা এবং পৃথিবীর সব সমাজই এক ও অভিন্ন বিবর্তন ধারায় আবর্তিত হয়েছে । উক্ত বিবর্তন ধারার অন্তর্নিহিত শক্তি সত্তা ঐতিহাসিক বস্তুবাদ । ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গ্রন্থে এঙ্গেলস একটি বিশেষিত মাত্রিক বৈশিষ্ট্যে শব্দটি ব্যবহার করেছেন । তার ভাষ্যে একত্র হয়ে বলা যায় : " ঐতিহাসিক বস্তুবাদ কথাটি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে ইতিহাস ধারার গতি সম্পর্কে একটি বিশেষ ধারণা বুঝার জন্য যাতে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনার মূল কারণ ও মহতী চালিকা শক্তির সন্ধান করা হয় সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের চারিত্রের মধ্যে, উৎপাদন ও বিনিময় পদ্ধতির পরিবর্তনের মধ্যে, তৎকারণে বিভিন্ন শ্রেনীতে সমাজের বিভাগের মধ্যে এবং এই সব শ্রেনীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে" ।

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ যৌথভাবে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের চর্চা ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদের অনুশীলন করে তাদের উক্ত চিন্তাকে বিজ্ঞান-মন্ডিত করেন এবং সামগ্রিক আবিষ্কারকে তত্ত্বাকারে একটি সাধারন সুত্রাবদ্ধ করেন । সমাজ ইতিহাসের গতির সাধারণ সুত্রটি তারা কমুনিষ্ট পার্টির ইশতেহারে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন :

১। এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, " ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ", নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-১০, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ । পৃঃ - ১৮

—Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের প্রতিযুগে অর্থনৈতিক উৎপাদন এবং যে সমাজ-সংগঠন তা থেকে আবশ্যিকভাবে গড়ে ওঠে তাই থাকে সে যুগের রাজনৈতিক ও মানসিক ইতিহাসের মূলে, সুতরাং (জমির আদিম যৌথ মালিকানার অবসানের পর থেকে) সমগ্র ইতিহাস হয়ে এসেছে শ্রেনী-সংগ্রামের ইতিহাস, সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের শোষিত ও শোষক, অধীনস্থ ও অধিপতি শ্রেনীর সংগ্রামের ইতিহাস, কিন্তু এই লড়াই আজ এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে শোষিত ও নিপীড়িত শ্রেনী (প্রলেতারিয়েত) নিজেকে শোষক ও নিপীড়ক শ্রেনীর (বুর্জোয়া) কবল থেকে উদ্ধার করতে গেলে সেই সংগে গোটা সমাজকে শোষণ, নিপীড়ন ও শ্রেনী-সংগ্রাম থেকে চিরদিনের মতো মুক্তি না দিয়ে পারে না....." ১ ।

উল্লিখিত গতিসূত্রের আবিস্কার এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে তার প্রয়োগ করতে গিয়ে তাঁরা ভৌগলিকভাবে ও জাতিসত্তাগতভাবে বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন সমাজের কাঠামো বর্ণনা এবং কাঠামো চরিত্রকে তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে সমুস্থাপিত করা জন্য বিভিন্ন প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন ।

১। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিদরিখ "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭০ । পৃ -১১ ।

Dhaka University Institutional Repository

সমাজ বিবর্তনের ঐতিহাসিক কালপর্যায়গুলিকে সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করার জন্য প্রচলিত এতদসম্পর্কিত প্রত্যয়গুলিকে আধুনিক সমাজবিজ্ঞান মনস্ক দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী গু মন্ডিত করে নিজস্ব ঢঙে ব্যবহার করেছেন । তার আবিস্কৃত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের কালপর্যায়কে এন্মসন্নিবেশ করলে দেখা যায় যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজের পর শ্রেনী বিভক্ত সমাজগুলি সুনির্দিষ্ট কয়েকটি বিশেষ সামাজিক স্তর অতিক্রম করে এসেছে । এবং প্রতিটি স্তরই শ্রেনীদ্বন্দ্বমান । প্রসংগটি উপলব্ধি আকারে কমুনিষ্ট পার্টির ইসতেহারের শুরুতেই স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়েছে । তারা বলেছেন "আজ পর্যন্ত যত সমাজ দেখা গেছে তাদের সকলের ইতিহাস শ্রেনী সংগ্রামের ইতিহাস । স্বাধীন মানুষ ও দাস, প্যাট্রিসিয়ান এবং প্লিবিয়ান, ,জমিদার ও ভূমিদাস, গিলড্-কর্তা আর কারিগর এককথায় অত্যাচারী আর অত্যাচারিত শ্রেনী সর্বদাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়ে থেকেছে, অবিরাম লড়াই চালিয়েছে, কখনও আড়ালে কখনও বা প্রকাশ্যে ; প্রতিবার এ লড়াই শেষ হয়েছে গোটা সমাজের বিপ্লবী পুর্নগঠনে অথবা দ্বন্দ্বরত শ্রেনীগুলির সকলের ধ্বংশ প্রাপ্তিতে ।" ১

বক্তব্যটি খুবই খোলামেলা এবং দ্বন্দ্বমান শ্রেনীগুলিকে রুপে-রঙে চিনিয়ে দেয় । কিন্তু মুল উদ্দেশ্য শ্রেনী দ্বন্দ্বমান সমাজ বিকাশের ধরণকে প্রতিষ্ঠিত করা । (এটি যদি একটি পূর্ণাঙ্গ সমাজবিকাশের তত্ত্ব হয় তার গতি চরিত্র বৈশিষ্ট্যে । তাহলে অধুনা উত্থাপিত প্রশ্নগুলির (এশীয় সমাজের প্রেক্ষিতে(১) গোটা সমাজের বিপ্লবী পুনগর্ঠন' এবং(২) দন্দ্বরত শ্রেনীগুলির সকলের ধ্বংশ প্রাপ্তি' এই দুটি বিশেষ প্রশ্নের) প্রতি মনোযোগ না দিয়ে পারা যায় না এবং প্রাসঙ্গিকভাবে আরো সংশয়মাত্রিক প্রশ্ন এসে উপস্থিত হয় । যদিও মার্কস্ প্রসঙ্গান্তরে এগুলিকে কেবলমাত্র

১। মার্কস্, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিখ, "কমিউনিষ্ট পার্টির ইশতেহার", (নির্বাচিত রচনাবলী, খন্ড-১ প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯। পৃঃ ১৪২-৪৩

Dhaka University Institutional Repository

একক ঘটনা(Single case) ভিত্তিক ঐতিহাসিক নিয়মবিচ্যুতি হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন ।

ইশতেহারের সামগ্রিক বক্তব্যকে এবং পরবর্তী পর্যায়ের সমর্থক অন্যান্য বক্তব্য কে সংশ্লেষণ করলে সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক পর্যায় ও তৎসন্নিহিত উৎপাদন ব্যবস্থার সাধারণ রূপ পাওয়া যায় । যথা : শ্রেণীহীন আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাসভিত্তিক প্রাচীন ধ্রুপদী সমাজ, ভূমিদাস ভিত্তিক সামন্ত সমাজ, ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার প্রলেতারিয়েত (মজদুর) ভিত্তিক আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ এবং অবশেষে ভবিষ্যতের শ্রেণীহীন সাম্যবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা ভিত্তিক সাম্যবাদী সমাজ ।

ইশতেহারের মধ্যে যে ঐতিহাসিক ধারার কথা বলা হয়েছে তা খুবই সরলীকৃত । পৃথিবীর সব সমাজই একই সময়ে একরূপ অবস্থায় আসেনি । প্রতিটি ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন সমাজের ক্রমবিকাশের অভিজ্ঞতাও অন্যরকম । এই ভিন্নতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মার্কস নিজেও যথেষ্ট সচেতন ছিলেন । ইশতেহার রচনার বেশ কিছু পরের রচনা যে গ্রন্থে তার সমগ্র আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তার ও দর্শনের মূল সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায় । বলতে গেলে একেবারে অপরিবর্তিত রূপে তার পরিণত রচনাতেও অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসঙ্গে ('A Contribution to the Critiqus of Political Economy') 1. গ্রন্থে সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক কাল পর্যায়গুলি পুনঃবিন্যস্ত করেন । উক্ত গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি সমাজ বিকাশের ঐতিহাসিক কাল পর্যায় সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়াস পান । তিনি বলেন প্রাচীন ধ্রুপদী সমাজের পূর্বেকার আদিম সাম্যবাদী সমাজের মধ্যবর্তী স্তরে আর একটি সমাজের অস্তিত্ব আছে ।

---

1. Marx, Karl "A contribution to the Critique of Political Economy", Progress Publishers, Moscow, 1970. PP-19-23

Dhaka University Institutional Repository

সেটা 'এশীয় সমাজ' । এশিয়া সম্পর্কে তার অন্যান্য লেখায় বিষয়টি বিভিন্নভাবে বারংবার উত্থাপিত হলেও সুএাকৃগে উল্লিখিত সেই সুস্পষ্টকারে সন্নিবেশিত হয়েছে । যখন তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক মহলে বিভিন্নভাবে তার চিন্তার আলোচনা সমালোচনা হচ্ছে তখনই তিনি অনেকটা আত্মোপলব্ধির মতই এই গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত কাঠামো প্রণয়ন করেন এবং মূলচিন্তাগুলিকে মোট আকারে Economic and philosophic monuscripts-1844 এর মতই ১ এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন । পরে Capital গ্রন্থে পূর্ণাঙ্গ কলেবরে গ্রন্থাবদ্ধ করেন ।

সংক্ষিপ্তভাবে তিনি অনাগত কিন্তু কাঙ্খিত শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজের শ্রেণীদ্বন্দ্বমান কিন্তু আপেক্ষিক প্রগতিলক্ষণসমৃদ্ধ সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিচারে এশমোন্নত স্তরের পর্যায়গুলিকে সরলরৈখিকভাবে সাজাতে গিয়ে সিদ্ধান্ত আকারে বলেছেন, " ব্যাপক রূপরেখায়, উৎপাদনের এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া প্রণালীকে অভিহিত করা যেতে পারে সমাজের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতির সূচক এক একটি যুগ বলে । " ১ (In broad out line, the Asiatic, ancient, feudal and modern bourgeois modes of production may be designated as epochs marking prgress in t the Economic development of Society." 2

দ্বন্দ্বমান আর্থসামাজিক যুগগুলির প্রগতি চরিত্রের বিষয়ে তিনি এতই নিশ্চিত ছিলেন যে ঐ একই গ্রন্থে তিনি অনেক আশানিয়ে লিখেছিলেন

১। মার্কস, কার্ল, "অর্থশাস্ত্র-বিচার প্রসংগে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩। পৃঃ১৪।

2. MARK, KARL, "A contribution to the Critique of Political Economy", Progress Publishers, Moscow, 1970. P-21

Dhaka University Institutional Repository

'The bourgeois mode of production is the last antagonistic form of the social process of production" ১.

সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণের পূর্বেকার সমাজতন্ত্রী সমাজের দ্বন্দ্বকে তিনি সাংস্কৃতিক ও অবৈরীমূলক দ্বন্দ্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করে উপরোক্ত বক্তব্যের তাত্ত্বিক মর্যাদা রক্ষায় সহায়তা মূল্য প্রদান করেছেন। (অধুনা সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ ব্যাখ্যা করে অনেকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক সংকটকে অবৈরীমূলক দ্বন্দ্ব হিসেবে মেনে নিতে চান না। তারা মার্কসীয় বিকাশ সূত্রের বৈশিষ্ট্যেই মূল্যায়ন করে বলেন যে, এগুলি বৈরীমূলক দ্বন্দ্ব > দ্বন্দ্বমান সমাজের প্রত্যক্ষ সনাক্তিকরণের ক্ষেত্রে (প্রধান দ্বন্দ্ব চিহ্নিত করণ) এশীয় সমাজের কথা সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করেন নি তিনি। ফলে তার স্কুলের তাত্ত্বিকরা ও বৈরী-তাত্ত্বিকরা প্রশ্ন তুলেছেন, উত্তর সন্ধান করেছেন অন্তরে, অতৃপ্তি নিয়ে এখনও অনুসন্ধান সমাপ্ত হয় নি।

উল্লেখিত এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা কি সমাজবিকাশের একটি বিশেষ কাল পর্যায় ? - এই বিশেষ প্রশ্নে মার্কস তার সমগ্র অনুগামী ও পাঠকদের জটিল প্রশ্নের মধ্যে নিক্ষেপ করেছেন। প্রশ্নটির মধ্যে সমাজ দর্শনগত সমস্যা ছাড়াও আর্থরাজনৈতিক এমন কি নিছক রাজনৈতিক সমস্যাও আছে। যে কারণে তার মৃত্যুর একশত বছর পরও সমস্যাটির সর্বসম্মত মিমাংসিতরূপ পাওয়া যায় নি। সে জন্যই প্রশ্নগুলি থেকে যাচ্ছে এবং আরো প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে।

সাধারণভাবে পৃথিবীর সব সমাজের জন্য এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করা মার্কসবাদ সম্মত হয় কি না ? আবার এশিয়ার জন্য আর্থ সামাজিক

---

1. MARX, KARL, "A contribution to the Critique of Policical Economy", Progress Publishers, Moscow, 1970. P-21

Dhaka University Institutional Repository

বিকাশের কোন একটি বৈশিষ্ট্যের কারণে ভিন্ন ধারা স্বীকার করে নেয়া মার্কসের সমাজবিকাশের বিবর্তনবাদী সাধারণগতির তত্ত্বকে দুর্বল করে দেয়া হয় । কিন্তু যদি এমন হয় যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা কোন না কোন আঙ্গিকে পৃথিবীর সব সমাজেই কিঞ্চিতাধিক বর্তমান ছিল, তাহলে তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টি সাধারণ হয় ।

এ প্রসঙ্গে পূর্ণাঙ্গ বিতর্কমূলক আলোচনা করার আগে মার্কসের এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত ধারণা, তার উৎস এবং তৎসম্পর্কিত মতামত সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা যেতে পারে ।

মার্কস ও এঙ্গেলস - এর প্রাচ্য, বিশেষ করে ভারত সম্পর্কিত ধারণা ও চিন্তার প্রাথমিক উৎস - ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্র ও সমাজদর্শন । সমাজবিজ্ঞান কিংবা অর্থনীতির সুনির্দিষ্ট আঙ্গিকে প্রাচ্য সম্পর্কিত বিস্তারিত ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা সপ্তদশ কিংবা অষ্টদশ শতকে বর্ণিত হয় নি । ইততস্তঃ বিক্ষিপ্তভাবে কোথাও প্রাচ্য সম্পর্কিত অল্প বিস্তর বর্ণনা ও মন্তব্য থাকলেও সেগুলি সমাজ বিজ্ঞান কিংবা অর্থশাস্ত্রীয় মানদন্ডে বিজ্ঞানমনস্ক ছিলনা । তৎসত্ত্বেও অষ্টাদশ শতকের প্রচলিত তথ্যগুলি মার্কস এঙ্গেলসের এতদসম্পর্কিত চিন্তার ও গবেষণার প্রাথমিক পর্যায়ের ও কেতাবী উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল । ইউরোপীয় অর্থ-শাস্ত্রে প্রাচ্য সম্মন্ধীয় গবেষণা ও চিন্তাররূপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অর্থশাস্ত্রবিদদের লেখনীতে তদানিন্তন ইউরোপীয় রাজনৈতিক নৈতিকতার মানদন্ডে বর্ণিত হয়েছে । এদের মধ্যে মন্টেস্কু, এ্যাডাম ফারগুসন,(স্কটীয় নৈতিকতাবাদী)

Dhaka University Institutional Repository

এবং ফ্রাঙ্ক কুইসনে (Franceis Quesney, ফিজিওকটদের অন্যতম) উল্লেখযোগ্য । অষ্টাদশ শতকের অর্থনৈতিক ও সমাজদার্শনিকরা মূলত প্রাচ্য সমাজব্যবস্থার অন্ধকারদিকের প্রতি সমালোচনার দৃষ্টি নিয়ে উও সমাজের মানসিক ও মনোজাগতিক গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যকে বিচার করেছেন । তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপে নিম্নোও বওব্যটিই মূর্ত হয়ে ওঠে : প্রাচ্য সমাজটা যেমন বলা হয়ে থাকে - স্বর্ণযুগের, তা নয়, বরং অমূলক ও সংস্কারযোগ্য সমাজ মনোজাগতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত এবং ইউরোপের তুলনায় খুবই নিম্নমানের পর্যায়ে অবস্থান করছে ।

মার্কস ১৮৫৩ সালে প্রাচ্য শব্দটা ব্যবহার করেন । কিন্তু তখনও বুদ্ধিজীবী মহলে এবং এমনকি তার দ্বারাও পূর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নি । (পরবর্তী পর্যায়ে যত ব্যাপক ও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।) এ্যাডাম স্মীথ প্রায় একাকীই এশীয় জাতিগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন । তার ব্যাখ্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সভ্যতার ভাব জাগতিক ও বস্তুগত বিষয়গুলির দূরত্ব পার্থক্য স্থান পেয়েছে । তার ব্যাপক আলোচনায় শুধুমাএ প্রাচ্য প্রতীচ্যের যন্ত্রকৌশল ও ফলিত বিজ্ঞানের পার্থক্যই স্থান পায়নি, সামাজিক উৎপাদন শক্তির ভিত্তি মুও ও আবদ্ধ শ্রমেরও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেছেন । তিনি গ্রাম ও শহরের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেছেন এবং ভূমিকর ও খাজনা সম্পর্কীয় ধারণাকে ইউরোপীয় আদলে সংজ্ঞায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন । তৎকালীন ইউরোপীয় সমাজদার্শনিকদের মধ্যে আলোচ্য লেখকদের প্রভাব ছিল । মার্কসের মধ্যেও এদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । কিন্তু তিনি সমাজবিজ্ঞান ও অর্থশাস্ত্রের

Dhaka University Institutional Repository

দুরত্ব এবং বিচ্ছিন্নভাবে উক্ত দুটি বিষয়ের সীমাবদ্ধতা কাটাতে সক্ষম হয়েছিলেন ।

এ্যাডাম স্মীথকে পরবর্তীকালে অনুসরণ করেছিলেন রিচার্ড জোন্স এবং জন স্টুয়ার্ট মিল । প্রাচ্য সমাজকে 'পলিটিকাল ইকনামিস্টরা' সব সময়েই রাজনৈতিক সমাজ হিসেবে বিবেচনা করেছেন । ঐতিহ্যগতভাবে প্রাচ্যদেশ মুলতঃ তাদের কাছে শ্রমজীবী গরিষ্ঠ মুলধন লঘিষ্ঠ দুস্থমান শ্রেনীসমাজ হিসেবেই পরিচিত ছিল । এবং ভারত ছিল ঐ জাতীয় সমাজে শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন ।

কার্ল মার্কস ১৮৫৯ সালের দিকে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা প্রত্যয়টি ব্যবহার করেছিলেন । এ সময় তিনি সমাজ বিকাশের স্তরগুলি সুএাবদ্ধ করেন । আদিম সমাজের পরে চারটি অর্থনৈতিক সমাজব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে এসেছে - এশীয়, প্রাচীন বা দাস সমাজ (ধ্রুপদী সমাজ) সামন্ত সমাজ এবং আধুনিক বুর্জোয়া সমাজ।

মার্কস এশীয় সমাজের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকেও সে সময় গুরুত্ব সহকারে বর্ণনা করেছিলেন । তিনি লিখেছিলেন যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রামগুলি স্বনির্ভর । কৃষি উৎপাদন ও হস্তশিল্পজাত উৎপাদন গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ (পরিচালনের প্রেক্ষিতে) । সুতরাং গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিনিময় অতি সীমিত । এবং শ্রম-পণ্য শোষণ সম্পর্কের বিকাশ হয় নি (ঘটেনি) । এ প্রসঙ্গে ১৮৬৭ সালে তিনি বলেছিলেন ঃ

Dhaka University Institutional Repository

"In the Asiatic and classical-autioue modes of production, the transformation of the product into a commodity, hence the existence of man as a commodity producer, plays a subordinate role, which yet becomes more significant the further the communities proceed into the stage of their decline." 1

তার উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায় । তা হল - এশীয় ও প্রাচীন ধ্রুপদী সমাজে পণ্য - শ্রম সম্পর্ক একটা পর্যায়ে সম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ছিল । এবং পণ্য উৎপাদককে পণ্যের স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অর্জন করে নি । তার মতে পণ্য সম্পর্কীয় বিচারে চারটি মূল অর্থনৈতিক (আর্থরাজনৈতিক) সমাজব্যবস্থাকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায় । একটি এশীয় ও প্রাচীন-ধ্রুপদী সমাজ এবং অপরটি সামন্ত ও বুর্জোয়া সমাজ । এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও প্রাচীন-ধ্রুপদী সমাজে পণ্য ও পণ্য উৎপাদন শিল্পশৈলী সমাজের অর্থনৈতিক সম্পর্ককে খুবই কম প্রভাবিত করেছে । পণ্য উৎপাদন শিল্পশৈলী এবং পণ্য উৎপাদক হিসেবে একজন ব্যক্তির ভূমিকা পরবর্তী দুটি সমাজ ব্যবস্থায় প্রাধাণ্য পায় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

প্রাচীন - ধ্রুপদী সমাজ ও এশীয় সমাজের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অভিন্ন বিবেচনায় দুটি সমাজকে এক করে দেখার প্রবনতা কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর বুদ্ধিবৃত্তিগত মানসে কাজ করেছে । কিন্তু মার্কস দু' টি সমাজব্যবস্থার দুরত্ব ও পার্থক্য (ঐতিহাসিক - সামাজিক) সম্মন্ধে সচেতন ছিলেন । তিনি মনে করতেন

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of production", Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands, 1975 PP-119-120.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন - ধ্রুপদী সমাজ ও এশীয় সমাজের পার্থক্য মূলতঃ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সম্পর্ক চরিত্রে । দু'টি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই শ্রম সম্পর্কের প্রেক্ষিতবিচারে আবদ্ধ । কিন্তু শ্রমজীবীরা, দাসেরা, ক্লায়েন্টরা famules, servus প্রভৃতি দাস শ্রেণীভুক্ত শ্রমজীবীরা শৃংখলিত থাকাকালীন প্রতিস্থাপনযোগ্য পণ্য ছিল এবং বন্ধনদশা মূলতঃ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ছিল, সমষ্টিগত পর্যায়ে ছিল না (ধ্রুপদী সমাজে) । কিন্তু এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রথাগতভাবে আবদ্ধ শ্রমজীবীরা সমষ্টিগতভাবে গ্রামীণ সমাজের কাছে আবদ্ধ ছিল । এবং গ্রামগুলি কর সংগ্রহের 'একক' হিসেবে পরিগণিত হত । ইউরোপে এই ধরনের গ্রাম সম্প্রদায় প্রাচীন ধ্রুপদী সমাজ বিকাশের বহু আগেই লুপ্ত হয়েছে, শুধুমাত্র কিছু কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া যায় মাত্র ।

পুঁজি (Das Capital) গ্রন্থের প্রথম খন্ডে মার্কস এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্পত্তি/সম্পদের মালিকানা সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত করেন । তিনি বলেন যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রাম্য সম্প্রদায় সাম্যের ভিত্তিতে গ্রামের সম্পত্তি সম্পদের গোষ্ঠীগত মালিকানা ভোগ করত । পুঁজি গ্রন্থের কিছু আগের রচনা Grundrisse গ্রন্থেও তার একই রকম চিন্তা লিপিবদ্ধ হয়েছে । এখানে তিনি বলেছেন :

> "Those age-old small Indian communities, e.g., which exist even yet rest on communal possession of the soil on direct connection of agriculture and handicraft, and on a fixed division of labour,

Dhaka University Institutional Repository

which serves as the determined plan and outline informing new communities. They form unities of production that are sufficient to meet their needs, their areas of production ranging from 100 to a few 1000 acres. The chief amount of the products is produced for the direct needs of the community, not as commodity, and the production itself is dependent of the division of labour in the whole of Indian Socity, which is mediated through commodity exchange. Only the surplus products are transformed into commodities, and a part of this surplus, moreover, only in the lands of the state, to whom a given amount from time out of mind has flowed. " 1

শুধুমাত্র Capital বা Grundisse -তেই নয় মার্কসের ভারত সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন প্রবন্ধে এবং বিভিন্ন পত্রাবলীতে উল্লিখিত বর্ণনায় বিধৃত মূল চিন্তা বিভিন্ন ভংগিমায় প্রকাশিত হয়েছে । তার আলোচিত এশীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে বিষয়টি আরো প্রাঞ্জল হবে । পরবর্তী অনুচ্ছেদে এশীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য (মার্কসের দৃষ্টিভঙ্গিতে) আলোচনা করা হোল ।

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V.-Assen, The Netherlands, 1975. P-121.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(খ) এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

এশীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে এশীয় সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় চিন্তার উৎস ও তার ব্যাখ্যা আলোচনা করা হয়েছে । এই অনুচ্ছেদে উপরোক্ত অনুচ্ছেদের পরিপূরক বিষয় হিসেবে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত সমাজের আর্থসামাজিক বিষয়গুলি মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে আলোচনা করা হোল ।

কার্ল মার্কস তার বিশ্ববিখ্যাত ক্যাপিটাল মহাগ্রন্থে এশীয় সমাজের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করেছেন :-

১। ভূমির উপর সম্প্রদায়গত স্বত্বাধিকার :

ক) ভূমির উপর সম্প্রদায়গত স্বত্বাধিকারের রূপ সারা ভারতবর্ষে একই প্রকার ছিল না । তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রাম সম্প্রদায় কাঠামোগতভাবে বিভিন্ন প্রকার ছিল এবং ভূমির উপর স্বত্বাধিকারের রূপ ও ধরণ সম্প্রদায়ের কাঠামোর সাথে সঙ্গতিরেখে নানাবিধ প্রকৃতির আঙ্গিকের রূপ কাঠামো ধারণ করেছিল ।

খ) সরল সম্পর্কের সম্প্রদায়গুলিতে সমষ্টিগতভাবে ভূমি আবাদ করা এবং সম্প্রদায়ের সদস্যদের মধ্যে উৎপাদের বন্টন করার দায়িত্ব সম্প্রদায় নিজেই পালন করে ।

২। গ্রামের অভ্যন্তরেই হস্তশিল্প ও কৃষির প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান ছিল । সেইসাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই -

Dhaka University Institutional Repository

ক) প্রতিটি পরিবারই সেলাই ও বুনন কর্মকে অতিরিক্ত পেশা হিসেবে গ্রহন করেছিল ;।

খ) গ্রামে প্রায় ডজন খানেক হস্তশিল্প বিশারদ ছিল ।

৩। গ্রামের মধ্যে স্থায়ীভাবে নির্ধারিত শ্রমবিভক্তি : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নুতন গ্রাম সম্প্রদায় গঠনকালে যা মডেল হিসেবে কাজ করেছে ।

৪। দ্রব্যাদি উৎপাদনের সমগ্র প্রক্রিয়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ গ্রাম বিভক্তি অসম্ভব ছিল । ছুতার বা কামারদের বাজার অপরিবর্তীত ছিল । কামার প্রভৃতিরা জনসংখ্যায় বেশী হলেও সমগ্র পণ্য উৎপাদন কাজকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিতে পারতো না । প্রত্যেকেই তাদের পূর্ববর্তীদের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসরণ করত ।

৫। গ্রামের তাৎক্ষনিক প্রয়োজন মিটানোর জন্য উৎপাদন করা হতো ; উৎপাদিত দ্রব্যাদির মজুত গড়ে তোলার ব্যবস্থা ছিল না ।

৬। গ্রামের মধ্যে পণ্য উৎপাদনও ছিল না, পণ্যের বিনিময়ও ছিল না । কোথাও কোথাও পণ্য বিনিময় খুবই স্বল্প পরিমানে ছিল কিন্তু সেই বিনিময়ের সামাজিক প্রভাব ছিল না ।

৭। সামগ্রিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম সম্প্রদায়ের উৎপাদন শ্রম বিভক্তির উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল ছিল না ।

৮। গ্রাম সম্প্রদায়ের সমগ্র উৎপাদনের প্রয়োজনাতিরিক্ত অংশকে পণ্যে রূপান্তর করা হতো ।

৯। প্রয়োজনাতিরিক্ত উৎপাদের একাংশ, যা পণ্যে রূপান্তরিত হয়েছে, খাজনা হিসেবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হতো ।

Dhaka University Institutional Repository

১০। রাষ্ট্র খাজনা হিসাবে কর সংগ্রহ করতো শ্রম ও দ্রব্য খাজনার মাধ্যমে (খাজনা ও করের অভিন্ন রূপ)।

কার্ল মার্কস বিবৃত উক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অনেকাংশ এ্যাডাম স্মীথের সাথে মিলে যায়।

যেমন :- ১। রাষ্ট্র খাজনা হিসেবে কর আদায় করত,

২। গ্রাম ভূ-সম্পত্তির সত্বাধিকারী ছিল,

৩। গ্রামআর্থনীতিক উৎপাদন ব্যবস্থা শহর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল।

বিভিন্ন সময়কার তথ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য চিন্তাবিদদের বক্তব্য থেকে যে তাত্ত্বিক উপাদান পাওয়া গিয়েছিল তার সময় পর্যন্ত তা থেকে মার্কস এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ইতিহাস তত্ত্বের কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আবিস্কার করেছিলেন যার সাথে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্র সমাজের ইতিহাসতত্ত্বের গুনগত পার্থক্য ছিল। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় স্থবির গ্রাম সম্প্রদায়গত সামাজিক জীবন ও এসমাগত রাজবংশের পরিবর্তন এই দুই রাষ্ট্র-সামাজিক প্রাক্রিয়ার মধ্যে একটা ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। বিশাল ব্যবধান এবং যোগাযোগের অব্যবস্থার প্রভাবে গ্রাম সাম্প্রদায়িক জীবন ব্যবস্থার সীমিত সংকীর্ণ কিন্তু সরলরূপ এবং এর সাথে রাজবংশগুলির মধ্যকার সম্পর্ক দুই ভিন্নধর্মী বিষয়কে সম্ভব করেছে : একদিকে (রাজন্যবর্গের অস্তিত্ব ও ক্ষমতা) পরিবর্তন। অন্যদিকে গ্রামসম্প্রদায়ের (আর্থ সামাজিক জীবনের) স্থবির জঁইম অবস্থা। ১

এশীয় সাম্রাজ্যের পতন ও পরিবর্তন শুধুমাত্র পারস্পারিক আন্তসম্পর্কহীনতার কারণেই সম্ভব হয়েছে। এশীয় সাম্রাজ্যের মূল উৎপাদক শক্তির সাথে রাজবংশীয়দের বিচ্ছিন্নতা (রক্ত সম্পর্ক এবং শ্রম সম্পর্ক উভয়তঃ) সাম্রাজ্যের পতন ও পরিবর্তনে

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gurcum & Comp. B.V- Assen, The Netherlands, 1975. PP-121-124.

Dhaka University Institutional Repository

নির্ধারক ভূমিকা পালন করেছে । এবং উৎপাদন ব্যবস্থা এইসব পরিবর্তনের মধ্যে পূর্বাপর একইরূপ ও প্রকৃতির ছিল । কোন পরিবর্তনের মৌলিক আর্থসামাজিক পরিবর্তন সংঘটিত হয় নি এ প্রসঙ্গে Lowrence Krader বলেন,

> ".... The central point to be accounted for in the theory of the Asiatic mode of Production is the practice of the village community as the unit of unfree production or the body of immediate producers. The accidents of history, the dynastic changes, are not only to be recounted, they are also to be accounted for. The accidental is accounted for ~~the~~ in the sense that : (a) there are constant accidental changes, (b) they take the form of dynastic overturns and replacements, (c) they do not disturb the fundamental system of production in the Asiatic Village Communities " 1

ভারতীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তনের ধারার ঐতিহাসিক চরিত্রে তিনটি অনন্য বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান :

১। লাগাতর আকস্মিক পরিবর্তন

২। রাজবংশীয় বিপর্যয়, উচ্ছেদ ও প্রতিস্থাপন

৩। রাজবংশীয় পরিবর্তন বা হঠাৎ গজিয়ে ওঠা সাম্রাজ্য ব্যবস্থা কোনভাবেই গ্রামসাম্প্রদায়িক জীবন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন বা প্রভাবিত করতে পারে নি ।

---

1. KRADER, LOWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gormcum & Comp. B.V-Assen, The Netherland, 1975. P-125.

Dhaka University Institutional Repository

প্রশ্ন উঠতে পারে মহাজনী সুদ প্রথা সম্পর্কে । কেননা ইউরোপীয় সামন্ত সমাজে মহাজনী সুদ প্রথার উদ্ভব ও বিকাশ সামন্ত অর্থনীতিকে ও সামন্ত মালিকানা চরিত্রকে বস্তুগত অর্থেই পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিল । যা পরবর্তী পর্যায়ে বুর্জোয়া বিকাশের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল ।

কিন্তু এশীয়ায় এবং এশীয় সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপারটি ছিল অন্যরকম । এখানে মহাজনী সুদ প্রথা উৎপাদন ব্যবস্থাকে এবং অর্থনীতিকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে নি । বরঞ্চ অর্থনৈতিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে । আর্থিক ব্যবস্থায় স্বাভাবিক চরিত্রকে বিকৃত করেছে এবং সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারনবাদী রাজনৈতিক সুবিধায় আপাতঃ ভাগীদার না হয়ে রাজনীতিকে দুর্নীতিগ্রস্থ ও কলুষিত করেছে - সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে । (অধিকাঠামোর প্রতি ব্যাপক নিয়ন্ত্রণবজায় রাখার মানসে।) এশীয় সমাজের পরিবর্তন সামগ্রিক বিচারে নুতন উপাদান সৃষ্টি ও সংস্থাপন ব্যতিরেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুর্ববর্তীর অনুকরণ বা সুপ্ত চরিত্রের পুনরাবির্ভাব । ঐতিহাসিকভাবে রাজনৈতিক ও ভৌগলিক দু' প্রকার বিষয়েরই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে : কর্মকান্ড ও উৎপাদনের সাধারণ পরিকল্পনা, বিতরণ ব্যবস্থা, বিনিময় ও ভোগ ইত্যাদির গ্রাম বা জেলায় অভ্যন্তরে ব্যবহারিক আচরণগত পুনরাবৃত্তি । ফলে সকল পরিবর্তনই কোন ফলশ্রুতি সৃষ্টি না করেই সাধারণ ধারায় বিলীন হয়েছে । এ প্রসঙ্গে গ্রাম সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র এবং ভূমিমালিকানার প্রেক্ষিতে তাদের সম্পর্ক আলোচনা করা প্রয়োজন । কেননা এশীয় সমাজে গ্রাম সম্প্রদায়ের মুল অস্তিত্ব ছিল সুনির্দিষ্ট গ্রাম-ভূমি এবং রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ঐ গ্রাম-ভূমির উৎপাদের প্রতি । পরবর্তী পরিচ্ছেদে গ্রাম সম্প্রদায় ও রাষ্ট্রের পারস্পরিক সম্পর্ক-ভূমি মালিকানার প্রেক্ষিতে আলোচনা করা হোল ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

১. এশীয় সমাজে রাষ্ট্র ও গ্রাম সম্প্রদায়ের সম্পর্ক ।

এশীয় সমাজে বৈশিষ্ট্যগুলি - তার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্যগুলি আপাতঃ দৃষ্টিতে অন্যরকম মনে হওয়ার কারণে অনেকেই এটিকে স্বতন্ত্র সমাজ হিসাবে উপস্থাপন করতে চান । কিন্তু কার্ল মার্কস সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়মের মধ্যে এশীয় সমাজকে খুঁজে পেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করতেন, প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজ কিংবা তার পরবর্তী স্তর সম্পর্কিত হাম্লানোসুএ বা মিসিংলিংক হিসাবেও এশীয় সমাজকে উল্লেখ করা যেতে পারে । এ প্রসঙ্গে তিনি সমসাময়িক অন্যান্য লেখকদেরকে সমালোচনা করে ১৮৫৯ সালের দিকে লিখেছিলেন ,

> " A ridiculous presumption has latterly got abroad that common property in its primitive form is specifically a slavonian or even exclusively Russian form. It is the primitive form that we can prove to have existed amongst Romans, Teutons, and Celts and even to this day we find numerous examples, ruins though they be in India. A more exhaustive study of Asiatic, and especially of Indian forms of common property, would show how from the different forms of primitive common property, different forms of its dissolution have been developed. Thus for instance, the various original types of Roman and teutonic private property are deducible from different forms of Indian common property." 1

---

1. MARX, KART, "Capital", Vol-I, Progress Publishers, Moscow, 1954 (reprinted in 1974) P-82.

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের এ বক্তব্য থেকে প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজের সাথে অভিন্নসূত্রে গাঁথা ইউরোপের ও এশীয়ার পরবর্তী সমাজের সম্পর্ক সূত্র সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। প্রাচীন ইউরোপে, যেমন এশিয়ায় ঐ সময়েই রাষ্ট্র দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়গুলি মহাসম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল কয়েকটি ঐতিহাসিক-রাজনৈতিক কারণে। এবং উৎপাদন ব্যবস্থায় এসেছিল মৌলিক পরিবর্তন।

ভারতীয় সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা ও সমাজ রাষ্ট্রের সাথে তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্কস মহাসম্প্রদায় প্রত্যয়টির সাহায্য নিয়েছেন। ভূমিমালিকানার ধরন উদ্বৃত্ত শোষনের প্রকৃতি এবং এ দু'য়ের সমন্বয়ে গঠিত সমাজকাঠামোর রূপ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মহাসম্প্রদায় প্রত্যয়টি ভারতের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত। কেননা ইউরোপীয় রাষ্ট্রের আদলে ভারতীয় রাষ্ট্রকে উপস্থাপন করার পক্ষপাতদুষ্টতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অধিকন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রের স্বতন্ত্ররূপটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মার্কস লক্ষ্য করেছিলেন যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদের একাংশ রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হয়, যে রাষ্ট্রকে তিনি মহাসম্প্রদায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই মহাসম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ও স্থিতি সম্পর্কে মার্কসের ব্যাখ্যায় আশ্চর্যজনকভাবে এবং সঠিকভাবে> ভূমি মালিকানার বিষয়টি গুরুত্ব পেয়েছে। তার ব্যাখ্যায় তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে, ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার অনুপস্থিতির কারণে গ্রাম সম্প্রদায় ভূমির মালিকানা ভোগ করে। এবং রাষ্ট্রকে ভূমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। উদ্বৃত্ত শোষনের চূড়ান্ত এবং সর্বোচ্চ স্তররাষ্ট্র হওয়াতে গ্রাম-সম্প্রদায়ের সম্মিলিত রাজনৈতিক রূপ মহাসম্প্রদায় হিসেবে রাষ্ট্র কাঠামোতে বিলীন হয়। এবং এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র একটি মহাসম্প্রদায়। রাষ্ট্র যে প্রভাবশর্ত প্রয়োগ করে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্ধৃত শোষণ করে তার উৎসভূমি সন্ধান ও ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি Grundrisse-তে বলেছেন (Krader এর ভাষ্যে),

> "..... in the absence of private property, the community is the proprietor of the land ; the state is recognised as proprietor, and hence is a higher community. The state exists as a person, and the surplus labour is made over to it in the form of tribute and in the form of labour in common for the actual despot....." 1

অনেকেই মনে করেন যে ভারতের কৃষি সম্প্রদায়ের মধ্যকার সমবায়িক ব্যবস্থার সাথে আদিম শিকারী সমাজের বেশ মিল আছে । দুটোতেই পূর্ব নির্ধারিত শ্রমবিভিত্তির বিষয়টি বর্তমান । মার্কস মনে করতেন শ্রম বিভক্তি সামাজিক হতেই হবে এমন কোন ধরাবাঁধা গদ নেই, ছক নেই । সম্প্রদায়ের শ্রম বিভক্তিটা অনেকটা একটি পরিবারের সদস্যদের শ্রম বিভক্তির মত । যেখানে উৎপাদনের একক, ভোগ, বিতরণ ও বিনিময় সব একই (সমঅধিকারভিত্তিক বিচ্ছিন্নতাহীন একই পরিমাণভিত্তিক) । উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রম সময়ের পরিসংখ্যানগত হিসাব নেই এবং তার জন্য বিশেষ (মানধার্যিক) মূল্য নির্ধারিত নেই ।

চিরায়ত উৎপাদন ব্যবস্থার ঐতিহ্যবাহী ধারক ভারতের কৃষি সম্প্রদায়ের অবস্থা অনেকটা ভিন্নভাবে উন্নততর । কেননা সেখানে পণ্য উৎপাদন এবং বিনিময় সংস্থাপিত হয়েছে । এবং উদ্ধৃত্তমূল্য বা উৎপাদ উৎপাদনের ফলে শ্রম বিভক্তির

---

1. ....KRADER, LOWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gurcum & Comp. B.V.-Assen, The Netherlands, 1975. PP-131-132.

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হয়েছে । এবং সামাজিক শ্রম বিভক্তির কারণে পণ্য উৎপাদন ও উদ্বৃত্তমূল্য বা উৎপাদ সৃষ্টি ও পরিচলন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হয়েছে । এই ব্যবস্থার ফলে শিকারী সমাজের বিশেষ সমবায়ী ব্যবস্থার বিলুপ্তি ঘটেছে ।

অনেকগুলি কারণকে উক্ত ঐতিহাসিক এশিয়াকালের বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করা যায় । তবে তার মধ্যে গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক ও তার সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক সবিশেষ উল্লেখযোগ্য/ভূমিকা রেখেছিল । কেননা এ ক্ষেত্রে বিনিময় ছাড়া গত্যন্তর ছিল না ।

তাছাড়া সম্প্রদায়গুলি আপনা বিকশিত এবং কোন সচেতন রাষ্ট্র বা সামাজিক শক্তির দ্বারা পরিকল্পিতভাবে উন্নয়নের ব্যবস্থাদি নেয়া হয় নি । [মার্কস প্রাচীন পেরুতে একই ধরনের বিকাশের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছিলেন ।] প্রাচীন সাম্যবাদী সমাজের পরে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অনুরূপ সমাজব্যবস্থায় মার্কস ভূস্বত্ব ও মালিকানার একাধিক রূপের পরিচয় সন্ধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন । যেমন, উদাহরণ স্বরূপ 'ইনকা' দের কথা বলা যায় ।

ইনকাদের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত সম্পর্ক (যা মূলতঃ এশীয় সমাজের মত নয়) তা মূলতঃ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যমন্ডিত (সহজাত প্রকৃতির) এবং সম্প্রদায় ও রাষ্ট্র একই সূত্রে । সেখানে পণ্যের বিনিময় নেই ।

> "(....the form of the natural community of the Incas is the state. Here there is an entirely closed natural economy of the state; their community does not engage in exchange of commodities. ") 1

---

1. KRADER, LAWRANCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gurcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands, 1975, P-140

Dhaka University Institutional Repository

উক্ত আবিস্কারের মধ্যে দু'টি স্বধর্মী প্রবনতা আছে :

১। প্রথমত : রাষ্ট্র সম্প্রদায় স্বরূপ :

এ ক্ষেত্রে পণ্যের উৎপাদন এবং বন্টন সম্প্রদায়ের মধ্যেই হয় । অন্য সম্প্রদায়ের সাথে কোন পণ্যের আদান প্রদান হয় না । এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্প্রদায়ের মোট উৎপাদন সমগ্র সদস্যবৃন্দের দ্বারাই ভুক্ত হয়ে থাকে ।

২। দ্বিতীয়ত : সম্প্রদায় রাষ্ট্র স্বরূপ :

এ ক্ষেত্রে সীমিত পরিবারে বিনিময় ঘটে । তবুও সম্প্রদায়ের বাইরে বিনিময় ঘটে না । উদ্ভূত উৎপন্ন/উৎপাদ সম্প্রদায়ের নিজস্ব চৌহদ্দিতেই ভুক্ত হয় । তবে বিশেষত্ব হচ্ছে এই - উৎপাদন সম্প্রদায়গত নয় + সামাজিক ।' সামাজিক উৎপাদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে পণ্যের আকারে বিনিময়িত হয় । সম্প্রদায়গত না হয়ে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার কারণে এটি রাজনৈতিক সমাজে পরিণত হয়েছে ।

মার্কসের মতে সম্প্রদায় ও সমাজের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং একটি রাজনৈতিক সমাজের কতকগুলি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা' সম্প্রদায়ের মধ্যে নেই । পার্থক্য সূচক বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে :

১। পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে সম্প্রদায় সমূহের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরতা ;

২। সমাজের মধ্যে যারা অন্যের জন্যে কাজ করে এবং যাদের জন্য কাজ করে (যাদের দ্বারা কাজে নিয়োজিত হয়) - এই দু'য়ের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য ;

Dhaka University Institutional Repository

৩। ভূমির (মাটির) সাথে সম্পর্ক : মুক্ত কিংবা আবদ্ধ -

৪। ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও সরকারী ভূ-সম্পত্তির মালিকানার স্বতন্ত্ররূপ ও পার্থক্য (কেতাবী ও ব্যবহারিক উভয়তঃ ।

৫। সমাজে শ্রম বিভক্তি ,

৬। রাষ্ট্র সৃষ্টির শর্তসমূহের উৎপত্তি, (শর্ত সমূহের উপাদান হিসাবে পরিণতি প্রাপ্তি ও বিকাশ) ও রাষ্ট্রগঠন ।

মার্কস প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, 'ইনকা' দের মধ্যে এ সব শর্তগুলি উন্মেষকালীন অবস্থায় আছে । উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি বিদ্যমান থাকায় তিনি এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও সম্প্রদায়ের মধ্যকার পার্থক্য উপলব্ধি করতে এবং মোটাদাগে বিভক্তি রেখা টানতে সক্ষম হয়েছিলেন । রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি মূলতঃ (জমি জমার ক্ষেত্রে- উৎপাদনে নিয়োজিত বা অহল্যা উভয় ক্ষেত্রেই) সর্বসাধারণের সম্পত্তি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন সম্পত্তির প্রকৃতি থেকে ভিন্ন । এই দুই প্রকার সম্পত্তি (রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তিমালিকানাধীন) আবার সম্প্রদায়ের সম্পত্তির প্রকৃতি ও মালিকানার রূপ থেকে ভিন্ন । ১

জমিতে মালিকানা মূলতঃ সম্প্রদায়ের (প্রত্যয়টি গ্রামসম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে আরো বেশী প্রযোজ্য) এবং ব্যক্তিমালিকানা ও মালিকানার স্থায়ীত্ব আপেক্ষিক বিচারে পরিবর্তনশীল । জমিতে চাষ করার সুবাদে চাষী শুধুমাত্র উৎপাদের একটি অংশ পায় । কিন্তু চাষকৃত জমির মালিকানা পায় না । এই ধরণের উৎপাদন ব্যবস্থায় পণ্যমূল্য উৎপন্ন হয় । এবং সম্প্রদায়ের ভেতরে পণ্যমূল্য উৎপাদনকারীদের মধ্যে পণ্যের বিনিময়ও হয় । কাজে কাজেই, বিনিময় মূল্যের গুণ আরোপিত হয় (সৃষ্টি হয়) সামাজিক উৎপাদনকারী ও সামাজিক ভোক্তা একই ব্যক্তি হয় না ।

---

1. KRADER, Lawrence, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands, 1975. PP-

Dhaka University Institutional Repository

সামাজিক শ্রম সম্প্রদায়গত ও রাষ্ট্রীয় শ্রম থেকে ভিন্ন প্রকৃতির ও চারিত্রগুণ হয়। এবং এ ক্ষেত্রে উদ্বৃত্ত উৎপাদ এবং উৎপাদিত পণ্যের পার্থক্য সূচিত হয়।

সম্প্রদায় রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, সেই ভূ-সম্পত্তির মালিক। যা 'মূলত রাষ্ট্রের সম্পত্তি'। সম্প্রদায় রাষ্ট্রস্বরূপ হলে ভূ-সম্পত্তির রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। যা প্রাকৃতিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যক্ষ উৎপাদনকারীদের গোষ্ঠী মালিকানার সাথে তুলনামূলক বিচারে গুণগতভাবে আলাদা। জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার খুবই সামান্য। এমনকি প্রাচীনকালে সম্রাট জমির একক মালিক ছিলেন না কিংবা রাজ্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদকে ব্যক্তিমালিকি হিসেবে করায়ত্ত করতে পারতেন না। রাজ্যের সম্পূর্ণ উৎপাদই তার অধিকারে ন্যস্ত হত। তিনি সমগ্র উৎপাদের অধিকারী হতেন - মালিক হতেন না। যেমন প্রত্যক্ষ উৎপাদক উৎপাদের অধিকারী হয় - মালিক হয় না। অপরপক্ষে উৎপাদক সম্প্রদায় ও ভূ-সম্পত্তির মধ্যকার সম্পর্ক রাষ্ট্রের সাথে ভূ-সম্পত্তির সম্পর্কের অনুরূপ। মাটি (ভূমি) সম্প্রদায়ের সম্পত্তি এবং রাষ্ট্র গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীন সমন্বয়কারীরূপে কর্তৃত্বাধিকারী। শ্রম প্রকৃত অর্থে গোষ্ঠী সাম্প্রদায়িক শ্রম (গোষ্ঠীস্বার্থে নিয়োজিত এবং সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরীণ) এবং রাষ্ট্রীয় শ্রম (গোষ্ঠীগতভাবে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে শ্রম নিয়োগ, যেমন, জলাধিক্যতা নিয়ন্ত্রণ বা জলসেচ ইত্যাদি) এই দু'টি রূপ নেয়। ব্যক্তিগত শ্রম নিয়োগ এবং সামাজিক শ্রম এই পর্যায়ে ভিন্ন গুণাগুণ প্রাপ্ত হয়। সম্প্রদায় ও সমাজ পুরোপুরি আলাদা, রাজনৈতিক সমাজ বিকশিত, এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার সামাজিক অধিকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত, বিতাড়িত (ক্ষেত্রবিশেষ)। ঐতিহাসিক আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস ভূ-সম্পত্তির আইনত ভোগের সাথে যৌক্তিক বিচার সম্মত আইনগত মালিকানার অধিকারের মধ্যকার পার্থক্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন, উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি মনে করতেন ভূ-সম্পত্তির আইনত

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ ও বিধানগত মালিকানা পরস্পরের দ্বান্দ্বিক স্বার্থে অবস্থান করে শুধুমাত্র স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের সহবিস্থান নয় ।

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় গ্রাম্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা হত । রাষ্ট্র রাজস্ব আদায় করত । সেই কারণে মালিক । সুতরাং উপপাদ বিশ্লেষণ করত । গ্রাম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রামের মোড়ল রাজস্ব আদায়ে ভূমিকা পালন করত এবং একই সাথে সে রাষ্ট্রের দরবারে গ্রামের প্রতিনিধি ছিল । গ্রাম প্রধান একজন দ্বিবিধচরিত্রের দ্বৈত ব্যক্তিত্ব । একদিকে তিনি খাজনা আদায়ের সূত্র এবং গ্রামে রাষ্ট্রের প্রতিনিধি । অপরদিকে তিনি গ্রাম সম্প্রদায়ের সাথে ঘনিষ্ট-ভাবে সংযুক্ত, কোন না কোন ভাবে রক্তসম্পর্কীয় আত্মীয় ।

(The village headman was an ambivalent figure; on the one hand he was the channel for tax collection, representing the village to the state treasury, and was the representative of the state in the village, on the other hand he was closely connected with the village and frequently had kinship bonds with the villagers.)1.

গ্রাম্য মোড়লশ্রেনী দু' মুখো চরিত্র নিয়ে গ্রাম সম্প্রদায়কে কেন্দ্রীয় শোষণের সুযোগ করে দিত । নিজেও শোষিত উদ্বৃত্ত শ্রমের অংশভাগী হতো এবং একই সাথে গ্রাম সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার ভূমিকা পালন করত । আপাতঃ দৃষ্টে গ্রামের শোষিত সাধারণ মানুষের কাছে একজন কেন্দ্র কর্তৃক অত্যাচারিত ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতীয়মান করার চেষ্টা করত কিন্তু মূলতঃ শোষক-শাসক শ্রেনীর অংশীদার ছিল । ফলতঃ শ্রেনী দ্বন্দ্বে এই মোড়ল শ্রেনীর অনুঘাতমূলক কার্যকলাপের জন্যই কেন্দ্রীয় শোষনের

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands, 1975. P-143.

Dhaka University Institutional Repository

নাগপাশ থেকে গ্রাম সম্প্রদায় নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারতো না ।

কি ছিলো এশীয় সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ ? প্রশ্নটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হওয়ায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে এশীয় সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্বের রূপ বিষয়ে আলোচনা করা হোল ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এশীয় সমাজে শ্রেনীদ্বন্দ্বের রূপ

গ্রাম সাম্প্রদায়িক সমাজ অবশ্যই শ্রেনী সমাজ। কিন্তু শ্রেনীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও বৈরীতা আধুনিক সমাজের তুলনায় উন্নতমানের নয়। শ্রেনী সংঘর্ষের বাস্তব অবস্থা সীমিত সম্ভাবনার মধ্যে আবর্তিত হতো। কেননা গ্রাম প্রধানের অবস্থান ছিল উভয়শ্রেনীতে দ্বৈত ভূমিকায় ছখ চড়িয়ে (?)। (প্রকৃত অর্থে তার উভয় শ্রেনীতে অবস্থান ছিল না। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখবো যে, তিনি শোষক শ্রেনীর।) বিনা মজুরীতে শ্রম শোষণ বা উদ্বৃত্ত উৎপাদের শোষণ তার মাধ্যমেই হতো। আবার সেই গ্রামের স্বার্থেই সপক্ষে রাজকীয় করবৃদ্ধির ও অমানবিক শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম নেতৃত্ব দিত। গ্রামের দুঃখ দুর্দশার কথা রাজদরবারে বা তার প্রতিনিধির কাছে গ্রাম প্রধানই উপস্থিত করতেন।

ফলে শ্রেনীশত্রুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সুযোগ খুবই কম ছিল। তাছাড়া গ্রামে শ্রেনী বৈষম্যের আকারে বিরুদ্ধবাদীদের বিকাশ ও অবস্থান ছিল দুর্বল। এই কারণে গ্রামের অভ্যন্তরে বা জাতীয় ভিত্তিতে শ্রেনী সচেতনতার বিকাশ ও প্রকাশ খুবই সামান্য প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রাম্য প্রধান ছিলেন ধর্মীয় মুখপাত্র এবং প্রধান ঐতিহ্যধারী ব্রাহ্মণ। এবং এরা গ্রাম্য দ্বন্দ্বকে ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ ও অন্যান্য প্রাত্যহিক জীবনের সাথে সংযুক্ত করত যে তার ফলে গ্রাম জীবনের হাজার বছরের ঐতিহ্যে এবং চিরায়ত নিয়মে কোন পরিবর্তন আসতো না। এমনকি গ্রাম্য সুদখোর মহাজনরাও এই শৃংখলা ও শৃংখলের কোন পরিবর্তন আনতে পারে নি। কিংবা তারা পরিবর্তন করতে চায় নি তাদের শ্রেনীস্বার্থের অনুকুল কৌশলগত কারণে।

পরিবর্তন যা হয়েছিল নগরগুলিতে সামান্যভাবে এবং ইউরোপীয় সওদাগরদের দ্বারা বিশেষভাবে সেগুলি উপাদানগতভাবে পুঁজি সঞ্চয় ও পুঁজির এস্টাবলিশমেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

বা এককপুঞ্জিভবন, বিনিয়োগ ও পুনর্বিনিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার শর্তগুলি বহিরাগত আর্থসামাজিক শক্তির কারণে এশীয় সমাজের আভ্যন্তরীণ শক্তির দ্বন্দ্বের বিকশিত ফলশ্রুতিরূপে নয়। ফলে এশীয় সমাজের পরিবর্তনমুখী সত্তা নিরন্তর ও লাগাতার বিকাশের শর্তশক্তির অভাবের কারণে সচল থাকতে পারে নি। বিশেষ বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণে সচলগতি স্তব্ধ করতে বাধ্য হয়েছে। জঙ্গম জড়তা থেকে গ্রাস করেছে ইতিহাসের অমোঘ বিধানে।

লক্ষনীয় বিষয়, মার্কস এশীয় সমাজ ব্যাখ্যায় সমাজের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক এবং ধনতন্ত্রের সাথে তার সম্পর্ক নিয়েই বেশী আলোচনা করেছেন। এবং এই বিষয়টিকে তিনি সমধিক গুরুত্বও দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন গুরুত্বপূর্ণ চারটি উৎপাদন পদ্ধতির (এশীয়, প্রাচীন, সামন্ত ও আধুনিক) মধ্যে ভগ্নদশা হলেও এশীয় সমাজ ব্যবস্থা অন্যান্য অতীতকালের সমাজ ব্যবস্থার মতো বিলীন হয়ে যায় নি, অদ্যাবধি বিদ্যমান রয়েছে।

মার্কস বিশেষ উৎপাদন সম্পর্কে যা, এশীয় সমাজ ব্যবস্থার অনুরে অবস্থান করছিলো - তাকে আবিস্কারের উপরেই বেশী মনোযোগী হয়েছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই উৎপাদন সম্পর্ক ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার বিপরীত। ধনতন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, উৎপাদনের উপায় থেকে মুক্ত শ্রমিকের বিচ্ছিন্নতা। পক্ষান্তরে এশীয় সমাজের দুর্বলতা হচ্ছে মুক্ত শ্রমিকের অস্তিত্বহীনতা। এবং এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে নির্ধারক উপাদান হিসেবে ধনসঞ্চয়নহীনতা, সঞ্চিত ধনের পুঁজিরূপে পরিণতি লাভের অসমর্থতা এবং পুঁজির স্বাধীনতাহীনতা ও শ্রমিক নিয়োগ, নিয়ন্ত্রণ, শোষণ ও শোষিত শ্রমের পুঁজিতে পরিণত করার কৌশল করায়ত্ব করার অসমর্থতা।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের সাথে রিচার্ড জোন্সের এতদসম্পর্কিত চিন্তার ও উপলব্ধির কিছুটা মিল আছে। তিনি এশীয় পশ্চাদপদতাকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যা করেছেন :

"....the backwardness of the traditional Asiatic system lay in its lack of circulation of money hence the inability to transform labour into capital, hence the inability to concentrate capital and accumulate it . " 1

মার্কসের মতামতের সাথে জোন্সের মতামতের এই বিশেষ ক্ষেত্রে বেশ মিল দেখা যায়। পুঁজি সঞ্চয়ন প্রক্রিয়া তার আধিপত্যের ঐকান্তিক আবশ্যকতার কারণে শ্রমিকের ও শ্রমের উপর নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করতে ও শ্রমবন্ধ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। এই বাধ্যবাধকতা পারস্পরিক গতিশীলতার শর্ত সৃষ্টি করে। মুক্ত শ্রমিকের উৎপত্তি ও বিকাশ ধনতন্ত্রায়নের আবশ্যকীয় শর্ত। যা এশীয় সমাজে বিরল ঘটনা। এ সম্পর্কে মার্কসের আবিস্কার ক্যাপিটাল এর দ্বিতীয় খন্ডে পরিলক্ষিত হয়। এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন :

" What is lacking in the Asiatic mode of Production is free labour, the formally free labourers, and the freedom of the labourer from the bondage of the village community, which is the bondage of the Soil. " 2

এশীয় সমাজে বন্ধন সামন্তীয় বন্ধনের প্রকৃতি থেকে ভিন্ন ছিল। সামন্ত বন্ধন ভূমির সাথে বন্ধন এবং একক মালিকানাধীন। এশীয় সমাজে সামাজিক ও

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V.Assen, The Netherlands, 1975. P-153.

2. Ibid. P-153.

Dhaka University Institutional Repository

আর্থরাজনৈতিক বন্ধন গ্রাম সমাজের বা গ্রাম সম্প্রদায়ের সাথে অটুট । একই সাথে এই বন্ধন মাটির সাথেও । মাটির দাসত্বের সাথে সম্প্রদায়ের দাসত্বও করতে হয় । এক অমোঘ বন্ধনে আমৃত্যু আবদ্ধ থাকতে হয় । এ থেকে মানবিক দেহমন চৈতন্যের মুক্তি মেলে না । এই অটুট বন্ধনের সাথে সামন্তীয় মাটির বন্ধনের মিল পাওয়া যায় না ।

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্হা সামন্তরূপেও যে পৌঁছায় নি [১] তার কারণ ভূমি খাজনার চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় এশীয় সমাজ ব্যবস্হায় ভূমি খাজনা সাধারণভাবে প্রধানতঃ শ্রম খাজনা যা চাষী শ্রেনী (ভু-কর্ষক) রাষ্ট্রকে ভূমির মালিক হিসেবে ও সার্বভৌম হিসেবে প্রদান করে থাকে ।

এশীয় সমাজ ব্যবস্হায় শ্রম খাজনা বিনামজুরীতে শ্রমিক নিয়োগের মাধ্যমে শোষন করা হতো । (অনেকগুলি প্রকারের মধ্যে একটি) এবং এটি মুলতঃ অতিরিক্ত শ্রমকার্য - প্রাথমিক নিয়োগের মধ্যে যার অস্তিত্ব সুপ্ত ছিল এবং এর জন্য কোন মূল্য দেয়া হতো না । এই অতিরিক্তশ্রমকালের শ্রমদাতৃ/দাত্রী উৎপাদক হিসেবে ভূমিতে কাজ করে এবং সেই অতিরিক্ত শ্রমের বিনিয়োগ প্রসুত উৎপন্ন সম্পদ ভুমি খাজনা বা শ্রম খাজনার আকারে রাষ্ট্র বা সার্বভৌমকে প্রদত্ত হয় । এখানেই ভূমির মালিক ও ভূমির অধিকারীর মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হয় । ভুমি এবং উৎপাদনের উপায় এ ক্ষেত্রে একাত্ম হয়েছে ।এবং উৎপাদক আবদ্ধ । [২] এই সামন্তবাদী ভু-সম্পর্কের সর্বত্র বলবত ছিল ।

এশীয় সমাজের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খাজনা এবং করের মধ্যকার পার্থক্যহীনতা । বলা যায় ঐতিহাসিক কারণে একে অপরের সাথে একাত্ম

১। মার্কস ও এঙ্গেলসের মন্তব্য ।
২। মুক্ত শ্রমিক অর্থে মুক্ত নয় ।

Dhaka University Institutional Repository

হয়ে গিয়েছিল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট হারিয়ে বা অর্জন করতে না পেরে । এবং রাষ্ট্র ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ভূ-স্বামী ।

মার্কস এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে একটি স্বতন্ত্র আর্থরাজনৈতিক সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন ১৮৫৭ - ৫৮ সালের দিকে তার বহুল আলোচিত বিতর্কিত গ্রন্থ Grundrisse -তে । যা ' পরবর্তী পর্যায়ে Capital -এর তৃতীয় খন্ডে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতে বিশেষ পরিমার্জনার পর পরিশিলিত রূপে প্রতিফলিত হয়েছে । এখানে তিনি রাষ্ট্রকে একমাত্র ভূ-স্বামী হিসেবে উল্লেখ করেছেন খাজনা ও করের ঘনিষ্ট একাত্মতার ঐতিহাসিক বাস্তবতার ফলশ্রুতি হিসেবে ।

এশীয় খাজনা ও করের ঘনিষ্ট একাত্মতা সম্পর্কের বিষয়টি Adam Smith প্রথম পর্যায়ে ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবী মহলে অবতারনা করেন । পরে Richard Jones এটি নিয়ে বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছিলেন । কিন্তু তিনি তার পূর্বসুরী Adam Smith - এর এতদসম্পর্কিত ধারণার মধ্যে কোন মৌলিকত্ব আনেন নি বা মৌলিক পরিবর্তন করেন নি । এদের পরবর্তী পর্যায়ে কার্লমার্কস খাজনা ও করের একীভূতির বিষয়টি সম্পর্কিত ধারণাকে আরো নিগূঢ়অর্থে পরিশীলিতভাবে গ্রহন করেন । মার্কসের কাছে খাজনা ও করের একীভবন বুদ্ধিজীবী মহলে প্রচলিত তদনিন্তনকালীন সর্বশেষ সন্ধানকৃত সমাজ ব্যবস্থা ছাড়াও ভিন্ন একটি সমাজব্যবস্থার সন্ধান দেয় ।

এটিকে তিনি একটি ঐতিহাসিক আর্থরাজনৈতিক ঘটনা হিসেবে গ্রহণ করেন এবং তার সাথে তিনি সমাজ ইতিহাসের বৈপ্লবিক ঘটনাবলীর সমন্বয় সাধন করেন । এবং Capital - এ তিনি তার আবিস্কৃত সমাজব্যবস্থা এবং বিবর্তন ধারায়

Dhaka University Institutional Repository

তার অবস্থান সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত ব্যক্ত করেন। এখানেই তিনি রাষ্ট্র ও ভূমির সম্পর্ক, মালিকানার ধরন, কর ও খাজনার উৎস এবং তার প্রকৃতি, সম্পত্তির অধিকার ও উৎপাদেয় বন্টন ও বিনিময়, উদ্বৃত্তমূল্যের শোষণ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে এশীয় সমাজব্যবস্থার মুখ্য আর্থরাজনীতিক উপাদান সমূহ পারস্পরিক সম্পর্কচরিত্রে সনাক্ত করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, এশিয়ায় স্বৈরশাসকই ভূমির সত্ত্বাধিকারী। এ প্রসঙ্গে তিনি সুস্পষ্টভাবেই বলেছেন যে,

> "..... there is no property in land in Asia in which the state is not landlord. In consequence of the unification of landlordship and Sovereignty in the state, in this system of political economy, there is no form of tax other than ground rent - which is collected from the cultivators. " 1

খাজনা ও করের একাত্মতার কারণে ভূমি মালিকানা এমন একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে, যার ফলে সামন্তশ্রেণীর বিকাশ (ভূমি মালিকানাকে ভিত্তি করে ঐতিহাসিক বৈপ্লবীক ঘটনা হিসেবে) ঘটেনি। এশিয়ায় যে 'এশীয়সমাজ' ঐতিহাসিক বাস্তবতা নিয়ে স্থায়িত্ব পেয়েছিল সে সম্পর্কে তিনি তার বিভিন্ন লেখার মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আমরা পরবর্তীঅধ্যায়ে প্রাক বৃটিশ ভারতীয় গ্রাম সম্প্রদায়ের রূপ ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা কালে ভূমিতে মালিকানাহীনতার কারণ ও শর্তসমূহ এবং ফলশ্রুতি সন্ধান করার চেষ্টা করব এবং ধ্রুপদী লেখকদের মতামতের তুলে ধরার চেষ্টা করব।

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode Production", Van Gurcum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-155

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ধ্রুপদী লেখকদের ধারণা
(হেনরী মেইন, ম্যাটকাল এবং মার্কস)

কার্ল মার্কস ও ফ্রেডরিক এঙ্গেলস মনে করতেন যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে যে বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থাকে তারা একটি অনন্য (সমাজ বিকাশের মৌলিক কালপর্যায়) উৎপাদন ব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পান সেটিকে সনাক্ত করতে সামাজিক সম্পর্ক এবং উৎপাদন সম্পর্কগুলির সংগে ভৌগলিক সীমারেখা ও অবস্থান একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত শর্ত (ভূমিকা পালনকারী) হিসেবে যৌক্তিক বিচারে স্থান পাচ্ছে । এই ভৌগলিক সীমারেখা ও অবস্থান ছাড়াও উৎপাদন সম্পর্কের বিচারে একটি বিশেষ ও অনন্য শর্ত (তাদের মতে একমাত্র নির্ধারনী শর্ত) হচ্ছে ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানার অনুপস্থিতি ।

ভূমিতে ব্যক্তি মালিকানার প্রকৃতরূপ সম্পর্কে তিনি (কার্ল মার্কস) বিভিন্নভাবে সুস্পষ্ট বক্তব্য ও মন্তব্য রেখেছেন । এঙ্গেলসকে লিখিত তার (মার্কসের) একটি পত্রে (২রা জুন ১৮৫৩) প্রাচ্যের জমিতে মালিকানার রূপ সম্পর্কে বর্নিয়ারের ধারনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন :

> " .... প্রাচ্যের, তিনি তুরস্ক, পারস্য ও হিন্দুস্থানের উল্লেখ করেছেন, সমস্ত ঘটনায় জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অনুপস্থিতিকে বের্নিয়ে সার্বিকভাবে ভিত্তি বলে ধরেছেন । এই হল আসল চাবি এমনকি প্রাচীর স্বর্গেরও " । ১

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও ভূমিতে ব্যক্তিমালিকানার রূপ সম্পর্কে এঙ্গেলস এর লেখাতে মার্কসের বক্তব্যেরই প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় । ৬ই জুন ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মার্কসকে লেখা তার একটি চিঠিতে এঙ্গেলস্ সুস্পষ্টরূপে ব্যক্তিমালিকানার অভাব এবং ভৌগলিক অবস্থানকে প্রাচ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থার শ্রেনী সম্পর্ক সনাক্ত করার জন্য

১। মার্কস কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিক "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ । পৃঃ -৩৩১ ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ উপাদানরূপে বর্ণনা করেছেন । তিনি সামাজিক উপাদান ও ঐতিহাসিক শর্ত-গুলিকে তাদের বিশিষ্টরূপে সবিস্তারে উল্লেখ করে তার উপলব্ধিকে আরো সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন । তিনি লিখেছিলেন ঃ

" জমিতে ব্যক্তিমালিকানার অভাব সত্যিই গোটা প্রাচ্যের চাবিকাঠি । এর মধ্যেই তার রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ইতিহাস । কিন্তু প্রাচ্য বাসীরা ভূমি মালিকানার এমন কি সামন্তরূপেও যে পৌঁছলনা, তা ঘটল কি করে ? আমার ধারণা তা প্রধানতঃ আবহাওয়ার সঙ্গে জমির প্রকৃতি মিলে, বিশেষ করে যাতে রয়েছে সাহারা থেকে শুরু করে আরব, পারস্য, ভারত ও তাতারিয়া হয়ে উচ্চতম এশীয় মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট মরুভূমি । কৃষির প্রথম শর্ত এখানে হল কৃত্রিম সেচ এবং তা হয় গোষ্ঠীর, প্রদেশের নয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাজ । প্রাচ্য সরকারের কখনো এই তিনটির বেশী বিভাগ ছিল না ঃ কোষাগার (স্বদেশ লুন্ঠন), যুদ্ধ (স্বদেশ ও বর্হিদেশ লুন্ঠন) এবং পাবলিক ওয়ার্কস (পুনরুৎপাদনের ব্যবস্হা ।..... সেচ ব্যবস্হা ক্ষয় পাওয়ার সংগে সংগে ভূমির কৃত্রিম উর্বরীকরণ বন্ধ হয়ে যায় এবং তাতেই ব্যাখ্যা হয় এই অনাথা - অদ্ভুত ঘটনাটার যে একদা যেখানে ছিল চমৎকার আবাদ তেমন বড়ো বড়ো এলাকা এখন পতিত ও ফাঁকা (পালমিরা, পেত্রা, ইয়েমনের ধ্বংসাবশেষ, মিশর, পারস্য ও হিন্দুস্হানের নানা জেলা) , এতেই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কেন একটা বিধ্বংসী যুদ্ধেই শতকের পর শতক জনহীন হয়ে থাকতে পারে একটা দেশ, লোপ পায় তার সমগ্র সভ্যতা ।...." ১

১। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস ফ্রিডরিক "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ । পৃঃ ৩৩২ ।

Dhaka University Institutional Repository

মার্কস ও এঙ্গেলস এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্য ও বিশেষ রাজনৈতিক প্রকৃতি সম্পর্কে একমত ছিলেন। এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে অচলায়তন গ্রাম সমাজ ও তার সংগঠন এবং তার আর্থসামাজিক কাঠামো সম্পর্কে কার্ল মার্কস বিস্তারিত বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা দিয়েছেন। তার গ্রাম সমাজকাঠামো সম্পর্কিত বর্ণনায় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার শ্রেনী সম্পর্ক ও ভূমিতে উৎপাদক শ্রেনীর অধিকার, উৎপাদনে নিয়োজিত সামাজিক শক্তিগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক এবং শ্রেনীদ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও ফলশ্রুতি ইত্যাদি বিষয়ে মার্কসীয় ধারণা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়েছে।

কার্ল মার্কস তার ভারতে 'বৃটিশ শাসন' প্রবন্ধে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি সংগঠন, শ্রমজীবী শ্রেনীর সম্পর্ক এবং তার ফলশ্রুতিতে যে সমাজ কাঠামো অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে গড়ে উঠতে বাধ্য হয়ে তার বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রকাঠামোর চরিত্র সনাক্ত করতে গিয়ে তিনি ভারতীয় গ্রাম সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃত চরিত্র আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তার লব্ধ আবিস্কার সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নোক্তরূপে বর্ণনা করেছেন :

> ".... সকল প্রাচ্যবাসীর মতো হিন্দু কর্তৃক তার কৃষি ও বাণিজ্যের প্রাথমিক সর্তস্বরূপ বড়ো বড়ো পাবলিক ওয়ার্কসের ভার কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ছেড়ে দেওয়া, এবং অন্যদিকে সারাদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং কৃষি ও শিল্পোদ্যোগের ঘরোয়া বন্ধনে ছোট ছোট কেন্দ্রে জোট বাঁধা - এই দুইটি অবস্থায় প্রাচীনতম কাল থেকে একটা বিশেষ চরিত্রের সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে - সৃষ্টি করেছে তথাকথিত গ্রাম-ব্যবস্থা, তাতে এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিটি সম্মিলন পেয়েছে স্বাধীন সংগঠন ও বিশিষ্ট জীবনধারা।" ১

১। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক, "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে," প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১। পৃঃ ৪০।

Dhaka University Institutional Repository

এশীয় সমাজব্যবস্থায় গ্রামগুলির একক বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকা বিষয়ে কার্ল মার্কসের পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তিনি উপলব্ধি করেন যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদনের একক হচ্ছে ক্ষুদ্রা ক্ষুদ্র গ্রাম । যে গ্রামগুলি বিভিন্ন দিক দিয়ে অন্যান্য জনপদ থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত । উৎপাদন প্রনালী ও শ্রেণী কাঠামো সার্বজনীন হলেও ভূমি সম্পদের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট, ব্যবহারিক চরিত্র ও সম্পদ কুক্ষিগত করার ধরণ আত্মগত ।রাজনৈতিক বিবেচনায় সমাজ সংগঠনের একটি স্বাধীন বৈশিষ্ট্য আছে । অবশ্যই সার্বভৌমত্বহীন । গ্রাম সমাজকাঠামো বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলিকে এক একটা ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র স্বরূপ বলে উল্লেখ করেছেন । তদানিন্তনকালের একটি সংসদীয় প্রতিবেদনে গ্রামগুলি সমন্ধে যে বিবরণ দেয়া হয়েছিল তার সাহায্য নিয়ে তিনি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের পূর্ণ চিএকল্প তুলে ধরেছেন ।

বৃটিশ কমন্স সভায় ১৮১২ সালে উপস্হাপিত ৫ম রিপোর্টে বলা হয়েছিল (ভারতীয় গ্রাম সম্পর্কে) :

> " A village geographically considered, is a tract of country comprising some hundreds or thousands of acres of arable and waste land ; politically viewed it resembles a corporation or township . " 1

এই রিপোর্টে তদানিন্তন প্রাচ্য বিশারদের অনেকেই প্রভাবিত হয়েছিলেন । এই রিপোর্টের বর্ণনায় অনুপ্রাণিত হয়ে এবং ১৮৩৩ সালের অন্য আর একটি রিপোর্টের সাহায্য নিয়ে Sir C.T. Metcalfe গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে তার যুগান্তকারী উক্তি করেন ।

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V. -Assen, The Netherlands, 1975. P-63.

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সকলবৈরী প্রাচ্য বিশারদদের বিতর্কের মুখে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাস নিয়ে লেখেন :

> "..... the village communities in India as Little republics, having nearly everything they want for themselves and almost independent of any foreign relations. " 1

কার্ল মার্কস যেমন ম্যাটকাফ - এর লেখায় প্রভাবিত হয়েছিলেন তেমনি Raffles-এর লেখাতেও নিজের মতের সপক্ষে বক্তব্য খুঁজে পেয়েছিলেন । সার্বভৌম গ্রাম সম্প্রদায় সম্পর্কে Sir Thomas Stampford Raffles - এর উপলব্ধি যুক্তি নির্ভর, তথ্যনির্ভর ও স্পষ্ট ছিল । তিনি কাঠামোগত সম্পর্কাশ্রয়ী মতামত ব্যক্ত করেছিলেন :

> "Under this simple form .... the inhabitants have lined from time immemorial. The boundaries of the villages have seldom altered; and though the villages themselves have been sometimes injured, and even disolated by war, famine and disease, the same name, the same limits, the same interests, and even the same families, have continued for ages. The inhabitants give themselves no trouble about the breaking up and division of Kingdoms; while the village remains entire, they care not to what power it is transferred, or to what severiegn it devolves; its internal economy remains unchanged " 2

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V. -Assen, The Netherlands, 1975. P-63
2. Ibid. P.67

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায় তৎকালে অধিকাংশ প্রাচ্য বিশারদই প্রায় অভিন্ন মত পোষণ করতেন। যেমন - বলা যায় Wilks ও Campbell - দের কথা একই সাথে Sephinstone -এর নামও উল্লেখ করা যায়। এদের লেখাতে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় (স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম সমাজ) সম্পর্কে একই রকম মতামত পরিলক্ষিত হয়েছিল। তবে Wilks একটু প্রত্যয়গত দূরত্বে অবস্থান নিয়েছিলেন। তিনি গ্রামগুলি সম্পর্কে, তাদের স্বয়ংসম্পূর্ণতা সম্পর্কে 'Republic' শব্দটি ব্যবহারের পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি সে সময়ে ঐ জাতীয় অন্য একটি পরিচিত শব্দ 'Corporation' ব্যবহার করে Republic শব্দের প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তিনি তার নিজস্ব মতে যুক্তি ও বিশ্বাসের সাথেই Republic শব্দের প্রতিস্থাপন করেছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, সনাতন প্রথা ও আইন গ্রাম সম্প্রদায় ও সাধারণ মানুষ প্রতিপালন করলেও রাজা বা জমিদারদের প্রতি জোর পূর্বক চাপানো যেত না। স্বেচ্ছায় তারা মেনে না নিলে প্রয়োগ করা যেত না। (স্বার্থের দ্বন্দ্ব হলে প্রায়ই বহুবিধ ক্ষেত্রে এ ঘটনা ঘটত)। তবুও এই গ্রামগুলির এই অনন্য বৈশিষ্ট্যকে গুরুত্ব না দিয়ে পারা যায় না বিধায় তিনি মন্তব্য করেছিলেন সার্বভৌম গ্রাম সম্প্রদায় না হলেও এগুলি ঐতিহ্যধারী গ্রাম করপোরেশন ছিল। সে গ্রাম্য করপোরেশনের একটি নিজস্ব অর্থনীতি ছিল। যা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের থাকে। আর গ্রামগুলি শুধু উৎপাদনে নিয়োজিত একক নয়। একটি অনন্য সম্প্রদায়ও।

লেঃ কঃ উইকস্ তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'Historical Sketches of the south of India, in an attempt to trace the history of Mysoor ; from the origin of the Hindoo Government of the state, to the extinction of the Mohammedan Dynasty in 1799-তে

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

গ্রাম সম্প্রদায়ের করপোরেশন চরিত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা কালে বলেছেন :

..... Indian Villages are communities in the strict sense. They ran their own affairs according to ancient tradition, a close corporation that was self-sustaining both in its economic life and in its government. As a corporation, it had a corporate stock of land; as an economically self-sustaining unity, it maintained both agricultural specialists and specialists or officers who guarded its borders and supervised the distribution of the village water supply, cleaned its clothes and announced the seasons of seed-time and harvest. The cultivators of the soil participated directly in the division of the village lands which they tilled. They were the primary members of the corporation. They compensated the Village Officers either in allotments of land from the corporate stock, or in fees, consisting of fixed propertions of the crop of every cultivator in the village. The Officers did not have the same rights as did the cultivators......." 1

382823

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V-Assen, The Netherlands, 1975. PP-62-63.

Dhaka University Institutional Repository

কার্ল মার্কস অবশ্য ক্যাম্পবেল, ম্যাটকাফ প্রমুখের প্রভৃতির মত গ্রাম সম্প্রদায়গুলিকে 'little Republic' বলতে বেশী পছন্দ করতেন। তিনি এবং এঙ্গেলস্ দুজনাই এই বিষয়ে একমত ছিলেন। তাদের মধ্যে সামান্যতম ধারণাগত পার্থক্য (এমনকি মার্কসের মৃত্যুর পরে এঙ্গেলসের বিশেষ/প্রত্যয়ে যখন ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ধারণাগত পার্থক্য স্বীকার করে নিতে হয়েছে তখনও) ছিল না। তারা কখনই স্বয়ং সম্পূর্ণ স্বাধীন (?) গ্রামগুলিকে করপোরেশন বলেন নি।

করপোরেশন না বলার অনেকগুলি কারণ থাকতে পারে। তবে গতিহীনতা একটি নিয়ামক শর্ত। করপোরেশন গতিশীল। পক্ষান্তরে গ্রামসম্প্রদায়গুলি স্পন্দনহীন, অনড়। মার্কস-এঙ্গেলস দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নরহরি কবিরাজ তার 'স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙলা' গ্রন্থে লিখেছেন :

> '' স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলিই তখনকার দিনে সমাজের ছিল মূল ভিত্তি। এই আপাতসুন্দর গ্রামগুলির জীবন ছিল অনাড়ম্বর, স্পন্দনহীন, অনড়। অল্পে সন্তুষ্টি, কৃচ্ছ-সাধন, চিরাচরিত আদব কায়দায় অভ্যস্ত জীবনধারা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কের অভাব ভারতের গ্রাম সমাজকে গতিহীন করে রেখেছিল।'' ১

এই গতিহীন, অচল অনড়, স্থাবর জঙ্গম, সমাজটিকে মার্কস বিভিন্নভাবে কিন্তু একই মর্মসারে (মর্মবস্তু) তুলে ধরেছেন তার বিভিন্ন মৌলিক রচনায়, প্রবন্ধাদি ও পত্রাবলীতে। উপরে উল্লেখিত পার্লামেন্টারী রিপোর্টে গ্রামগুলি সম্বন্ধে যে বিবরণ দেয়া হয়েছিল ও চারিত্র মূল্যায়ন করা হয়েছিল সেটিকে ভিত্তি ধরে এবং তদানিন্তন প্রাচ্য বিশারদদের (যেমন বার্নিয়ের) মৌলিক রচনা ও সমালোচনার সাহায্য নিয়ে তিনি একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের পূর্ণ চিত্ররূপ তুলে ধরেছেন। এঙ্গেলসকে লিখিত

১। কবিরাজ, নরহরি, স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা, বানী প্রকাশ ঢাকা, ১৯৮২। পৃঃ - ৪।

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর একটি পত্রে (১৪ই জুন ১৮৫৩ইং) নিম্নোক্তভাবে গ্রাম কাঠামোর বর্ণনা দিয়েছেন :

" ভৌগলিক ভাবে দেখলে একটি গ্রাম হল কয়েকশত বা কয়েক হাজার একর আবাদী ও পতিত জমির একটি অঞ্চল । রাজনৈতিকভাবে দেখলে তার ধরনটা কর্পোরেশন বা পৌরায়তনের মতো । প্রত্যেকটা গ্রামই হলো এবং মনে হয় চিরকালই হয়ে থেকেছে বস্তুতপক্ষে একটা পৃথক গোষ্ঠী বা প্রজাতন্ত্র স্বরূপ । পদাধিকারীরা (১) পটেল, গৌড়, মন্ডল ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষায় তার বিভিন্ন নাম, সেই হল মুখ্য, গাঁয়ের ব্যবস্থাপনার তদারক করে সেই, গ্রামবাসীদের কলহ নিষ্পত্তি করে , পুলিশের কাজ দেখে, গ্রামের রাজস্ব আদায়ের কাজ করে । (২) কার্ণম, শানবোয়াগ বা পাটোয়ারী হল হিসাবরক্ষক । (৩) তৈলার বা সহলওয়ার আর (৪) তোন্ডী হল গ্রাম ও শস্যের বিভিন্ন ধরনের প্রহরী । (৫) নির্ঘন্টী জলাশয় বা নদীর জল ন্যায্য মাত্রায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্টন করে (৬) জোশী বা জ্যোতিষ্কী বীজবপণ ও ফসল তোলার কাল এবং সব রকম কৃষি কাজের শুভাশুভ দিন বা মুহূর্ত নির্দেশ করে (৭) কামার ও (৮) ছুতার কৃষিকাজের সহুল যন্ত্রপাতি এবং কৃষকদের সহুলতর বাসগৃহ বানায় । (৯) কুম্ভকার গড়ে গ্রামের এক মাত্র বাসনকোসন (১০) রহক পরিস্কার করে পাষাক কটি । (১১) নাপিত ও (১২) রৌপ্যকার প্রায়ই একই ব্যক্তি সেই সঙ্গে সে গায়ের কবি ও শিক্ষক সবই । তারপর হল পুজাচর্নার ব্রাহ্মণ । এই সরল ধরনের পৌর শাসনের আওতায় অনাদী কাল থেকে বাস করে আসছে দেশবাসীরা । গ্রামের সীমানা বদল হয়েছে কদাচিত , এবং যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ ও মারীমড়কে গ্রামগুলি কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্ত এমনকি বিধ্বস্ত হলেও একই গ্রাম একই সীমা একই স্বার্থ এমন কি একই বংশ চলে এসেছে যুগের পর যুগ । রাজ্যের

Dhaka University Institutional Repository

বিলোপ বা ভাংগাভাংগি নিয়ে অধিবাসীরা ভাবে না, গ্রামটি যতক্ষণ অখন্ড থাকছে ততক্ষণ কোন ক্ষমতার হাতে তা গেল, কোন সার্বভৌমের তা করায়ত্ত হল তা নিয়ে তাদের ভাবনা নেই ; গ্রামের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি অপরিবর্তিতই থাকে ।" ১

পটেল সাধারণতঃ বংশানুক্রমিক পদ । গোষ্ঠী গুলির কোন কোনটাতে গ্রামের সমস্ত জমি চাষ হয় একত্রে । অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতি প্রজা চাষ করে তার নিজের জমিটুকু । তার ভেতরে আছে দাসত্ব ও জাতিভেদ প্রথা । পতিত জমিগুলি সাধারন চারনভূমি । ঘরোয়া সুতাকাটা ও কাপড় বোনার কাজ করে বৌ-ঝিরা । এই যে শান্ত-সরল প্রজাতন্ত্রগুলি পাশের গ্রামের হাত থেকে সাগ্রহে রক্ষা করে শুধু নিজ গ্রামের সীমানা,..... । অচলায়তন এশীয় স্বেচ্ছাচারের জন্য এর চেয়ে পাকা ভিত্তি কেউ অনুমান করতে পারে বলে মনে হয় না। গ্রামগুলি সম্পর্কে এও উল্লেখ করা উচিত যে মনুতেই তার উল্লেখ মেলে এবং তাঁর মতে গোটা ব্যবস্থাটার ভিত্তি হল ; একজন উচ্চতর কর সংগ্রাহকের অধীনে দশ গ্রাম, তারপর শতগ্রাম, তারপর সহস্র গ্রাম " ২ ।

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও এশীয় স্বৈরাচারের ভিত্তি ছিল এইসব অচলায়তন । গ্রামগুলির জীবনধারা শান্তসরল হলেও যেহেতু সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার মূল একক হিসেবে গ্রামগুলি দায়িত্ব পালন করেছে তাই এশীয় স্বৈরাচারের সহায়ক উপাদান হিসেবে গ্রামগুলির সমাজ কাঠামো তথা শ্রেণী কাঠামোকে দায়ী করা চলে ।

মার্কস মনে করতেন এশীয় সমাজ এমনই একটি অচলায়তন যার কাঠামো গড়া স্হিতি-সাম্যের ভিত্তিতে এবং এক অর্থে সর্বগ্রাসী । অর্থাৎ এই সমাজে যারা অনুপ্রবেশ করেছে তারা নিজেরাই ভারতীয় হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

১। মার্কস কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ । পৃঃ ৩৩৩ - ৩৩৪ ।

২। প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

কেননা ইংরেজদের আগমনের আগে পর্যন্ত ভারতে কোন উন্নত সভ্য জাতের আগমন ঘটেনি । এবং সেই জন্যই " আরবী, তুর্কী, তাতার, মোগল যারা একের পর এক ভারত প্লাবিত করেছে তারা অচিরেই হিন্দু ভূত হয়ে গেছে । ইতিহাসের এক চিরন্তন নিয়ম অনুসারে বর্বর বিজয়ীরা নিজেরাই বিজিত হয়েছে তাদের প্রজাদের উন্নততর সভ্যতায় " । ১

উপনিবেশ পূর্বে অচলায়তন কি ইংরেজ উপনিবেশিক শোষনকালে পরিবর্তিত হয়েছিল ? এপ্রসঙ্গে কার্ল মার্কস বলেছেন যে, এশীয় অচলায়তন মূলতঃ অপরিবর্তিত থেকেই গেছে । ইংরেজরা জমিদারী প্রথাকে কায়েম করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে । অনেকেই মনে করেন যে, ভারতে এই সময় জমিদারী প্রথা ইউরোপীয় সামন্ত প্রথার অনুরূপ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় । এ প্রশ্নে মার্কস বলেন জমিদারী প্রথা মূলতঃ খাজনার আকারে লুন্ঠনের একটি কুটকৌশল মাত্র । কেননা এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে ইংরেজরা লাভবান হয়েছিল বটে কিন্তু এশীয় স্বৈরাচারের মূল কাঠামোগত চরিত্রের কোন মৌলিক পরিবর্তন হয় নি । তিনি এই অদ্ভুত ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, " জমিদার হল ইংরেজী ল্যান্ডলর্ডের এক অদ্ভুদ ধরন - খাজনার শুধু এক দশমাংশ পেত তারা, বাকি নয় দশমাংশ তুলে দিতে হত সরকারের হাতে । রায়ত হল ফরাসী চাষীর এক অদ্ভুত ধরন - জমিতে তাদের নেই কোন মৌরসী পাট্টা আর ফসলের সংগে সংগে প্রতি বছর বদলাচ্ছে করভার " । ২

উপরোক্ত ব্যাখ্যায় দেখা যাচ্ছে যে, মালিকানা স্বত্ব জমিদার কি রায়ত কেউই পাচ্ছে না । ফলে পূর্বেকার সমাজ কাঠামো অপরিবর্তিত থেকে গেছে । এশীয় সমাজে ইংরেজরা অনেক কিছু পরিবর্তন করলেও জমিদারী প্রথা প্রবর্তন করে মৌলিক ভাবে ভূমিতে মালিকানা স্বত্বের মধ্যে নূতন বিশেষত্ব আরোপ করতে পারেনি । এশীয় ব্যবস্থাই কোন না কোন রূপে রয়ে গেছে । জমিদার রায়ত সম্পর্ক সম্বন্ধে

১। মার্কস, কার্ল, ও এঙ্গেলস, ফ্রিডারিক, " উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে ", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ । পৃঃ ৮৬ ।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ -৮২ ।

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ করে তিনি বলেন, "বাংলায় পাচ্ছি ইংরেজী ল্যান্ডলর্ডিজম, আইরিশ, মধ্যস্বত্ব প্রথা, জমিদারকে করসংগ্রাহকে পরিণত করার অষ্টীয় প্রথা এবং রাষ্ট্রকেই আসল ভূস্বামী করার এশীয় প্রথার সমাহার" । ১ রাষ্ট্রকে আসল ভূস্বামী করার কারণেই এশীয় অচলায়তন অপরিবর্তিতই থেকেছে । মৌলিক কোন পরিবর্তন আসেনি ।

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাম্প্রতিক মার্ক্সবাদীরা এবং প্রাচ্য-বিশারদরা মার্কসসহ ধ্রুপদী লেখকদের মতামতকে নির্বিচারে মেনে নিননি । তারা ঐতিহাসিক ও সামাজিক নিদর্শন ও উপাদান সমূহ সনাক্ত করে মার্কসের ও ধ্রুপদী লেখকদের সমালোচনা করে ভিন্নমতের অবতারনা করেছেন এবং এতদসম্পর্কিত নূতন মতবাদের জন্ম দেয়ার চেষ্টা করেছেন । এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অনুর্নিহিত রহস্য অনুধাবনের জন্য তাদের মতামত অত্যন্ত আগ্রহ উদ্দিপক কৌতুহলের জন্ম দিয়েছে বিধায় পরবর্তী অধ্যায়ে সংক্ষিপ্তভাবে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালের লেখকদের মতামত আলোচনা করা হলো ।

১। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রিডরিক "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ । পৃঃ ৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(খ) ধ্রুপদী লেখকদের সমালোচনা :

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কসবাদীদের সাম্প্রতিক মতামত ।

কার্ল মার্কসের বিতর্কিত প্রত্যয় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে ইতিহাস-বেত্তাগণ তাদের নিজস্ব ধরনের সমালোচনা-পর্যালোচনা করেছেন এবং কোন না কোন ভাবে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন । তাদের মধ্যে বহুল আলোচিত ও বহুজনগ্রাহ্য কয়েকজনের তাত্ত্বিক মূল্যায়নকে তুলনামূলকভাবে সন্নিবেশন করা যেতে পারে ।

১। প্লেখানভ ও উইটফোগেল :-

প্লেখানভ ও উইটফোগেল এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার মার্কসীয় তত্ত্বকে পুরোপুরি গ্রহন করেছিলেন - অবশ্যই তাদের নিজস্ব নিয়মে । এদের তত্ত্বকে দ্বিমুখী মডেলের বিশ্লেষণ বলে ধরা হয় । তারা উভয়েই মনে করতেন এশিয়া ও ইউরোপে আর্থসামাজিক বিকাশ দুই ধারায় সম্পন্ন হয়েছে । এবং এই বিকাশের কারণ হিসেবে ভৌগলিক ও আবহাওয়াগত পরিবেশ প্রতিবেশের সাথে সভ্যতার ও এই সভ্যতার বিকাশের ধারার যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক তার কথা উল্লেখ করেছেন । তারা মনে করতেন যে, উপরোক্ত কারণে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির দুটি অর্থনৈতিক অবস্থা সমসাময়িক অস্তিত্ববান হতে পারে । বিশেষ করে প্লেখানভ মনে করতেন প্রতীচ্যে দাস যুগের পর সামন্তযুগ এবং অতঃপর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্বাভাবিক পরিণতি ঘটেছে । কিন্তু প্রাচ্য ঠিক প্রতীচ্যের মত সমাজ বিকাশের নিয়ম মেনে xxx বিকশিত হয়নি । প্রাচ্যে দাষ যুগের আগমনের আগেই এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছে এবং সেটিই স্থায়ী রূপ নিয়েছে । তিনি বলেন :

"In the west there developed in succession the classical, feudal and capitalist modes of production;

Dhaka University Institutional Repository

in the East, on the other hand, the Asiatic mode of production became established " 1

প্লেখানভের দ্বিমুখী বিকাশের তত্ত্বকে ছক বদ্ধ করলে নিম্নোক্ত সুর কাঠামো পাওয়া যায় ঃ

প্লে নভের মূল্যায়নের সাথে ট্রটস্কির মূল্যায়নের সাযুজ্য আছে । তারা উভয়েই মনে করতেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের উভয়েরই আর্থ-সামাজিক ধারার অভিজ্ঞতা বিভিন্ন ।

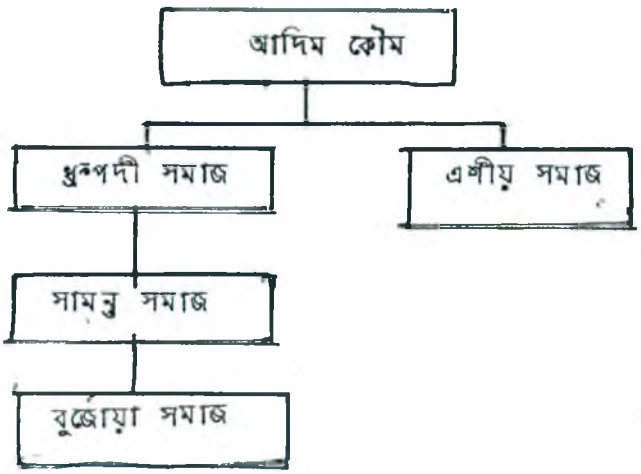

ট্রটস্কির আলোচনার এলাকা তদানিন্তন রাশিয়া । তিনি জারের আমলের দুই ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সহ অবস্থান লক্ষ্য করেছিলেন । জারের সাম্রাজ্য প্রাচ্যে প্রবিষ্ট হলে দেখা যায় যে, এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার পাশাপাশি ইউরোপীয় সমাজ এদুটোই টিকে আছে । প্লেখানভ ও ট্রটস্কি দুজনই রাশিয়াকে আধা এশীয় সমাজ মনে করতেন । এবং রাশিয়া বাদে এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল ।

1. MELOTTI UMBERTO, "Mark and the Third World", The Mac Millan Press Ltd. London, 1977. P-12

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই মনে করেন, উইটফোগেল মন্টেস্কুর চিন্তা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। উইটফোগেলের প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের ধরণা মূলতঃ এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার একটি বিশিষ্ট রূপ। উইটফোগেল তার প্রাচ্যের স্বৈরতন্ত্রের ধারণাকে সমৃদ্ধ করার জন্য মন্টেস্কু, হেগেল, ইউরোপীয় কয়েকজন পর্যটক ও বিটিশ অর্থনীতি-বিদদের পরোক্ষ সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। উইটফোগেল মনে করতেন বিশেষ ভৌগলিক অবস্থার কারণে এশীয় দেশসমূহে কেন্দ্রীয় সেচব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছিল। সে ধরনের অবস্থা ইউরোপে কখনই দেখা দেয়নি। উইটফোগেলের এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ধারণা শুধুমাত্র এশিয়াকে নিয়ে নয় বরঞ্চ ইউরোপ ছাড়া সমগ্র এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকার কেন্দ্রস্থল (ইনকা ও আজটেক) সমগ্র ওমানিয়া এবং রাশিয়া উক্ত প্রত্যয়ের পরিধির অনুভুক্ত।

এশীয় স্বৈরতন্ত্রের ব্যাখ্যায় তিনি সম্পত্তির মালিকানার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি তুলনা করে দেখিয়েছেন যে, ইউরোপীয় সমাজ ব্যক্তিগত উৎপাদন স্বত্ব ভোগ এবং প্রাচ্য সমাজ রাষ্ট্রীয় উৎপাদন স্বত্ব ভোগের উপর দাঁড়িয়ে আছে এবং সম্পত্তির উপর মালিকানার রকমফেরই এর একমাত্র কারণ। যেহেতু প্রাচ্যে সামন্ত মালিকানা ছিল না তাই রাষ্টশাসন সামন্ত শ্রেণীর অধিকারে না গিয়ে ব্যক্তির স্বৈরাতান্ত্রিক শাসনে গিয়েছিল। তার মতে -

> "In the west the ruling group was always a class of proprietors; in the orient it was always a hierarchy of revenue collectors, a clique of consumers, of government income " 1

---

1. BESSAIGNET PIERRE (ed) "Social Research in East Pakistan", Asiatic society of Pakistan, 1964. P-278.

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত খাজনা সংগ্রহকারীরা কোন কোন সময় মধ্যসত্ত্ব ভোগ করেছে বটে তবে কখনই স্বৈরতন্ত্রের রূপকে খর্ব করতে পারেনি । বরঞ্চ এরা স্বৈরতন্ত্রের হাতকে শক্তিশালী করেছে । এবং শক্তিশালী স্বৈরতন্ত্রের কাছে ব্যক্তি বিশেষ বা অর্থনৈতিক উপাদান ও শক্তি সম্পূর্ণরূপে অবনত হতে বাধ্য হয় । এবং উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় সমগ্র সমাজ ও সভ্যতা স্বৈরতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিশেষ অর্থে গতিহীন জড়ীম অবস্থায় উপনীত হয়েছে । তার এতদ্‌সম্পর্কিত বক্তব্যকে সংশ্লেষিত করে বলা যায় যে,

> "The traditional orient on the contrary, generated a human type drilled in the spirit of total submission and total obedience; in other words, its structure fastered subservient apathy and total loneliness (powerlessness before the state machine)" 1

এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্রহীনতা ও সামগ্রিক অর্থে নিঃসহায় অবস্থা এশীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি । এশীয় স্বৈরতন্ত্র ও এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা কোন কোন অর্থে সমার্থক ধরে নিয়ে উইটফোগেলের চিন্তাচেতনাকে মার্কসীয় "এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা" তত্ত্বের অনুসারী বলা যেতে পারে ।

২। এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে নয়া একমুখী বিকাশবাদীদের মতামত :

সম্প্রতি কয়েকজন মার্কসবাদী ইতিহাস তত্ত্ববিদ এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে বক্তব্য ও মতামত প্রদান করেছেন । যাতে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থাকে কার্ল মার্কসের মৌলিক সমাজবিবর্তন তত্ত্বের একটি কাল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । এদের মধ্যে কাঠামোতত্ত্ববিদ Manrice Godelier, প্রাচ্যতত্ত্ববিদ Jean chesneause

---

1. BESSAIGNET, PIERRE (ed) "Social Research in East Pakistan", Asiatic Society of Pakistan, 1964. P-279

Dhaka University Institutional Repository

আফ্রিকা তত্ত্ববিদ Jean Suret - cannale ও চীনতত্ত্ববিদ Ferenc Tokei উল্লেখযোগ্য। এদের সাথে সমার্থক মতামত রেখেছেন রাশিয়ার অর্থনীতিবিদ Evgenij Varga এবং আমেরিকার ভারততত্ত্ববিদ Daniel Thorner প্রমুখ ব্যক্তিত্ব আছেন।

এদের সবাকার মতামতের সারসংক্ষেপ করলে দেখা যায় যে, তারা সকলেই এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ। যুক্তিতর্কের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তারা সকলেই একমত হয়েছেন যে, আদিম কৌম সমাজের পরই এশীয় সমাজ ব্যবস্থা সর্বব্যাপী বিদ্যমান ছিল। কৌম সমাজ ও বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবর্তী তারা দুইটি সমাজের পরিবর্তে তিনটি সমাজ ব্যবস্থার পরস্পর সম্পর্কিত রূপের কথা বলেছেন। তাদের মতামতকে ক্রমধারায় সন্নিবেশ করলে নিম্নোক্ত রূপ পাওয়া যায় -

আদিম কৌম সমাজ

এশীয় সমাজ

ধ্রুপদী সমাজ/দাস সমাজ

সামন্ত সমাজ

বুর্জোয়া সমাজ

সমাজতন্ত্রী সমাজ

তাদের মতামতের সাথে মার্কসের মতামতের খুবই মিল লক্ষ্য করা যায়। মার্কস 'অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসংগে' গ্রন্থের ভূমিকায় প্রায় একইরূপ মন্তব্য করেছেন।

– Dhaka University Institutional Repository

মার্কসের Grundrisse এর সূত্র ধরে Godelier আবার সাত প্রকার বিকাশস্তরের অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এখানে তিনি জার্মানীর উৎপাদন ব্যবস্থাকে সাধারণ ধারায় নিয়ে এসেছেন এবং ধ্রুপদী সমাজকে দুইভাগে ভাগ করে ধ্রুপদী ও দাস সমাজ নামকরণ করে সমাজ বিকাশের স্তরগুলি পূর্ণবিন্যস্ত করেছেন।

Godelier দাবী করেছেন যে, এঙ্গেলস জার্মানীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বিশেষত্ব সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত ছিলেন এবং ইউরোপে সামন্তবাদী সমাজ সৃষ্টির জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে বলে বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন। এবং কার্ল মার্কস এঙ্গেলসের মতামত গ্রহণ করেছিলেন।

Godelier এর শেষ মতকে এক্যস্তরে সাজালে নিম্নরূপ কাঠামো পাওয়া যায় :-

আদিম কৌম সমাজ

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা

ধ্রুপদী উৎপাদন ব্যবস্থা

দাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা

জার্মানীয় উৎপাদন ব্যবস্থা

সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থা

ধণতন্ত্রী উৎপাদন ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

Godelier -এর উপরোক্ত সুত্রীকরণ সরাসরি মার্কসবাদ বিরোধী বলে মনে হয় না। যদিও কার্ল মার্কসের কোন লেখায় ৭ স্তরী বিকাশের কথা পাওয়া যায় না।

৩। এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে Melotti এর বক্তব্য :

কার্ল মার্কসের বিভিন্ন সময়কার বক্তব্য ও মতামত সংশ্লেষন করে এবং সমাজবিবর্তন সম্পর্কে অন্যান্য মার্কসবাদীদের বিতর্কের সুত্র ধরে Melotti একটি সাধারন ছক আকার চেষ্টা করেছেন। তিনি মার্কসের Grundrisse -তে উল্লেখিত মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে এবং অন্যান্য তাত্ত্বিকদের সাহায্যকারী বক্তব্যের সংশ্লেষণে একটি জটিল ও বহুস্তর বিশিষ্ট সামাজিক বিবর্তনের ধারণা দাঁড় করিয়েছেন। তার মতে পৃথিবীর সবদেশের সকল সমাজ একই নিয়মে বিকশিত হয়নি বা একই স্তর পার হয়ে আসেনি। তবে কয়েকটি স্তর আছে খুবই সাধারন এবং বাকী প্রকারগুলি কয়েকটি বিশেষত্বমন্ডিত। এবং এই বিভিন্ন প্রকার স্তর বিভাগের কারণ হিসেবে ভৌগলিক, ও রাজনৈতিক শর্ত সমূহকে ভূমিকা পালনকারী হিসাবে উল্লেখ করেছেন। তিনি মনে করেন এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অধিপত্য ও শোষণের সম্পর্ক ঘটেছে এবং তার ফলে উভয় সমাজই প্রভাবিত হয়েছে।

Melotti -এর জটিল স্তরবিন্যাসকে সাধারনভাবে সন্নিবেশ করলে নিম্নোক্ত সমাজ বিবর্তন কাঠামো পাওয়া যায় :

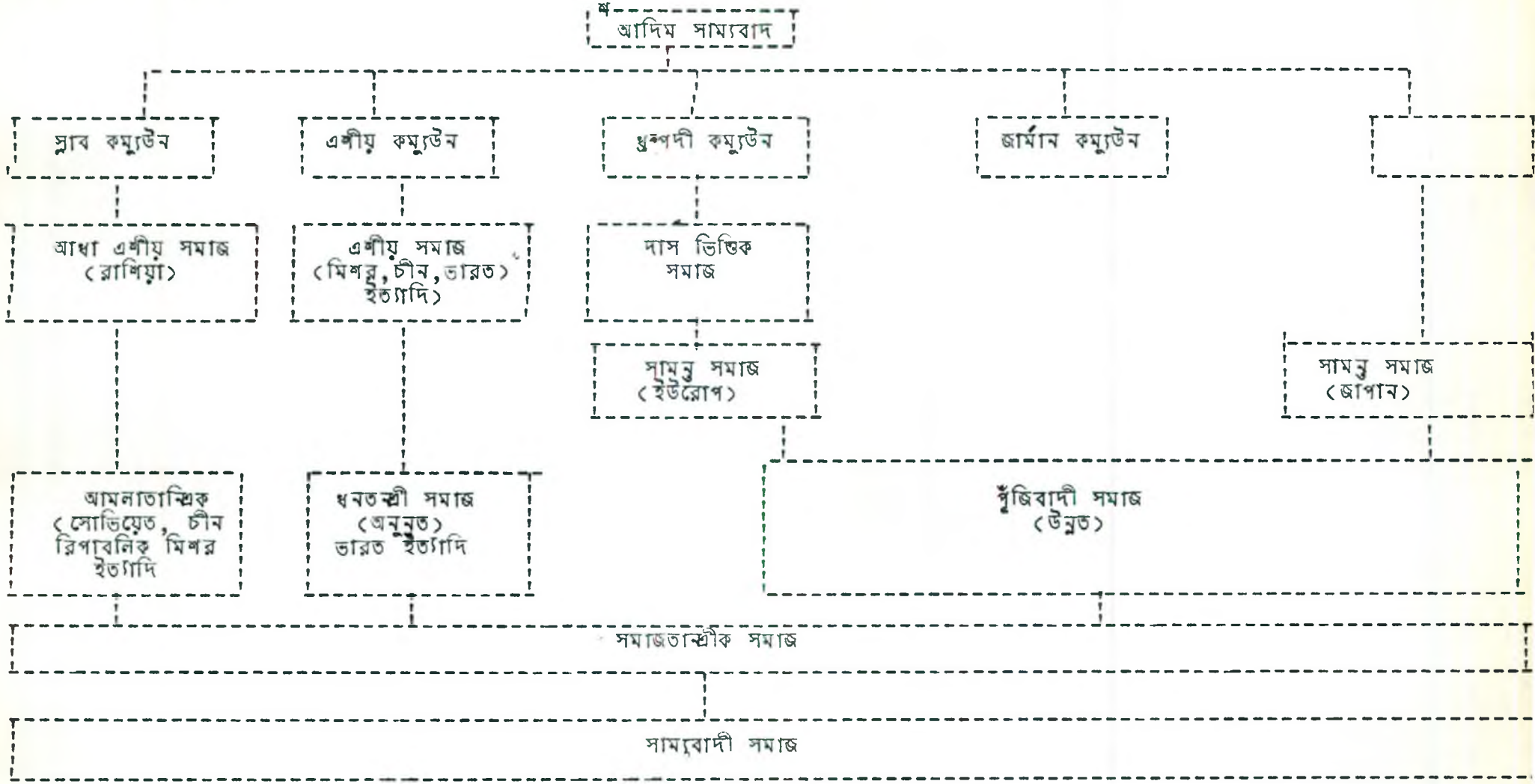

Melotti - এর জটিল ছক

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

Melotti মনে করেন যে, পৃথিবীর সব সমাজই আদিম কৌম সামাজিক অবস্থা বিদ্যমান ছিল । এবং সকল সমাজই সমাজতন্ত্রের পথে সাম্যবাদে উত্তরণ করবে । এই সাম্যবাদে উত্তরণের পথ সবারকার জন্য একই প্রকার হবে না । কেননা ইতোমধ্যে অনেকেই ভিন্নতর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে । যেমন আদিম কৌম সমাজের পর ইউরোপে তিন ধরনের বিশেষ কৌম সমাজের উদ্ভব হয় । যথা স্লাভীয়কৌম, ধ্রুপদী-কৌম, জার্মানীয়-কৌম । এবং এশিয়ায় এশীয় -কৌম সমাজের উদ্ভব হয় । উপরোক্ত সব সমাজই একই নিয়মে সামন্ত সমাজে উপনীত হয়নি । যেমন রাশিয়া আধা এশীয় সমাজে, মিশর, চীন, ভারত ইত্যাদি এশীয় সমাজে এবং শুধুমাত্র ধ্রুপদী সমাজই দাসভিত্তিক সমাজে পরিণত হয়েছে । দাসভিত্তিক সমাজ থেকেও বর্বর আগ্রাসনের মাধ্যমে জার্মানীয় সমাজ থেকে সামন্ত সমাজের উদ্ভব হয়েছে ।

এশীয় সমাজ উপনিবেশিক আগ্রাসনের ফলে অনুন্নত ধণতন্ত্রী সমাজে এবং ইউরোপ উন্নত ধণতন্ত্রী সমাজে পরিণত হয়েছে । তিনি জাপানকে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বাইরে রেখে বিচার করেছেন । কেননা জাপানে উন্নত ধণতন্ত্র বিকশিত হয়েছে এবং সেখানে সামন্তত্ন্ত্র বিকশিত হয়েছিল । [তার বক্তব্যকে একটি সাধারণ ছকে সন্নিবেশ করা হলো।পৃ-১৯]

Melotti এর বক্তব্য মার্কসবাদ বিরোধী বলে মনে হয় না । বরঞ্চ মার্কসীয় ধারণাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রবল চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । যে সমস্ত বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে অধুনা ইতিহাস বেত্তাদের মধ্যে, তার জবাব দেবার জন্যই মনে হয় Melotti এই কষ্টকর ও যুক্তিযুক্ত নববিকাশ কাঠামো প্রণয়ন করেছেন । তার সমাজ বিবর্তন ধারা থেকে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় অন্য বিষয়গুলি সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও । ১

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্হার অনেক সমালোচক বাংলাদেশে বিশেষ করে ভারতে সামন্তবাদের বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন । যারা 'এশীয় সমাজ' এক স্হবির, সমাজ মানেন না তারা অনেকেই মনে করে কোন না কোন রকমের সামন্তবাদ ভারতে এবং বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । যেমনটি ইউরোপে হয়েছিল ঠিক তেমনটি না হলেও মুলতঃ ভারতীয় মধ্যযুগের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্হাও তার সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত উৎপাদন ব্যবস্হা মুলতঃ সামন্তবাদী । বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে এবং আমাদের আলোচ্য গবেষণার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত বিধায় পরবর্তী অধ্যায়ে ভারতীয় সামন্তবাদের উৎস (হিন্দু শাসন আমলে উৎপাদন ব্যবস্হায় সামন্তীয় উপাদান) সম্পর্কে আকর গ্রন্থের সহায়তায় ও ঐতিহাসিক নিদর্শনাবলীর বিশ্লেষণের সাহায্যে বিষদ আলোচনা করা হলো ।

১। MELOTTI, UMBARTO, "Marx and the Third World", The Mac Millan Press Ltd. London, 1977, PP-8-27.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) হিন্দু শাসন আমলে বাংলাদেশের সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিশ্লেষণ।

বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ আলোচনা করার সময় ভারতীয় সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব, বিকাশ আলোচনায় আসে। কেননা প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় যে, বাংলাদেশ বহুবার স্বাধীনতা হারিয়ে ভারতীয় রাজা বা সম্রাটদের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। ফলে ভারতীয় সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক বাংলাদেশের সমাজে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।

ভারতীয় সামন্তবাদের সূচনায় দেখা যায় খ্রীষ্টির প্রথম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণদেরকে যে ভূমি অনুদান দেয়া হয়েছিল তার মাধ্যমেই উৎপাদন ব্যবস্থায় সামন্ত সম্পর্ক দৃঢ়মূল প্রতিষ্ঠা পেতে থাকে। সামন্ত সম্পর্কের উদ্ভব ও বিকাশের প্রশ্নে রামশরণ শর্মা বলেছেন, "খ্রীষ্টিয় প্রথম শতাব্দী থেকে ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত ভূমি অনুদানের মধ্যেই রাজনৈতিক সামন্তবাদের ইতিহাস খুঁজতে হবে"। ১

অধিকাংশ ভারততত্ত্ববিদ সপ্তম থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসকে সামন্ততন্ত্র প্রভাবিত যুগ বলে গণ্য করে থাকেন। তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত নন। অনেকেই মনে করেন যে, মধ্যযুগীয় ইউরোপের যে সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এককালে অভিহিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্র নামে, তার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ভারতের সমাজ ব্যবস্থার প্রভূত পার্থক্য ছিল। ভারতে শাসকশ্রেণীর মধ্যে এমোচ্চ স্তরবিন্যাসের কাঠামো ছিল দুর্বল, এমন কি কোন কোন পর্যায়ে তা একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। ভূস্বামীরা কখনোই তাদের জমিদারীর শাসক ছিলেন না। বিনা পরিশ্রমিকের জবরদস্তি শ্রম অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খাটানো হোত কেবলমাত্র দুর্গ, সেচব্যবস্থা ইত্যাদি নির্মানের কাজে। এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা সাধারণতঃ আদায় করা হোত সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় কর হিসেবে। কোন কোন ভারততত্ত্ববিদ মনে করেন যে, এশীয় ধরণের সামন্ত সম্পর্কের বিকাশ হয়েছিল মৌর্যদের কালে, বিশেষ

১। শর্মা, রামশরণ, "ভারতের সামন্তবাদ", কে,পি, বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭। পৃ-২২২।

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ করে গুপ্তদের সময় থেকেই । এবং এ সময়কার সামাজিক উৎপাদন সম্পর্ক সামন্ত সম্পর্ক । যদিও পরবর্তীকালে এ সকল উৎপাদন সম্পর্ক এটুট থাকে নি ।

বাংলাদেশে সামন্ততন্ত্র সম্পর্কীত বিতর্কিটির আদি সূত্র জমিতে মালিকানার চরিত্রের মধ্যে নিহিত । প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় যে, গ্রামগোষ্ঠীগুলি জমিতে সাধারন মালিকানা ও কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি করতো । যদিও সামাজিক বৈষম্য শুরু হয়েছিল বৈদিক আর্য সমাজেই । বৈদিক যুগে সম্পত্তির মালিকানা ও গৃহপালিত পশুর মালিকানার উপর ভিত্তি করে ধনী উচ্চ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি দেখা দিয়েছিল অত্যন্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্তরগুলি । ভূমিদানের বিষয়টি সে সময়েও দেখা গিয়েছিল । যদিও গ্রামগোষ্ঠী ইচ্ছামতো জমির বিলি বন্টন হত তবুও দেখা যায় যে, সম্পত্তির অধিকার ও সামাজিক পদমর্যাদার পার্থক্যের ভিত্তিতে সামাজিক অসাম্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ার পথ সুগম হয়ে উঠেছিল । এর ফলে গোষ্ঠীর কিছু কিছু সদস্য ধনী হয়ে উঠলেন এবং এককালে যা ছিল ঐক্যবদ্ধ সমাজ তার মধ্যে দেখা দিতে লাগলো বিশেষ সুবিধা প্রাপ্ত একেকটি সম্প্রদায় । এইসব সদস্য এমন কি বহু দাসের (বা এশীতদাসের) মালিকও হয়ে উঠলেন, অথচ ওই একই সংগে দারিদ্রদশায় পতিত সমাজের অন্যান্য সদস্য ব্যক্তি স্বাধীনতা হারিয়ে নিজেদেরই উপজাতি গোষ্ঠী ও গ্রামীণ সমাজের মধ্যে অপরের অধীন হয়ে পড়লেন । অথর্ববেদ ও ঋগ্বেদে এশীতদাসী ও এশীতদাসের উল্লেখ পাওয়া যায় । স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে বৈদিকযুগে দাস প্রথা বর্তমান ছিল । পরবর্তী যুগে বৃহৎ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার ফলে দাস সমাজ সামন্ত সমাজে রূপান্তরিত হতে থাকে, ভারতীয় সমাজে যা একচ্ছত্র বলবৎ ছিল - যার অধীনে রাজা ও প্রজা জমির স্বত্ব - উপস্বত্ব ভোগ করতেন তার প্রবল প্রকোপ ধীরে ধীরে কমতে থাকে । শর্মা মনে করেন গুপ্ত যুগের শুরুতে এই পরিবর্তনের সূচনা হয় ।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের সামন্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা হওয়ার পূর্বে জমির মালিকানা সম্পর্ক কি ছিল তা পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, বিশেষ ধরনের দাস সমাজের অস্তিত্ব ছিল। দাস সমাজ সম্পর্কে ইতিহাসবেত্তারা মনে করেন যে, "সে সমাজে যে এশীতদাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল তাকে মোটামোটি অপরিণত, পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থাই বলা উচিত।" ১

এই অপরিণত পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাংগতে থাকে মগধ ও মৌর্যযুগে (খৃীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়টিতে) প্রাচীন ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে নতুন উৎপাদন সম্পর্ক গড়ে উঠতে থাকে। এই যুগটি সর্বমোট চার শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল বলে মনে করা হয়। এ যুগের ভূমি মালিকানা ও উৎপাদন সম্পর্কসম্বন্ধে জানা যায় যে, রাজা জমির সর্বময় মালিকানা ভোগ করতেন এবং কৃষি কাজে নিযুক্তি চাষী রাজস্বের আকারে জমিতে উৎপন্ন ফসলের একটি সুনির্দিষ্ট অংশ রাজাকে দিতেন এবং এই শর্তে কৃষি জমির উপর মালিকানা সত্ব ভোগ করতেন।

"রাজস্বের প্রধান ধরনটি ছিল যাকে বলা হয় 'ভাগ' (অর্থাৎ রাজাকে দেয় অংশ) তা-ই, সাধারনত এই ভাগটি ছিল কৃষির উৎপাদসমূহের এক-ষষ্টাংশ"। ২ রাজা এক ষষ্টাংশ ভোগের অধিকারী হওয়ার কারণে তাকে ষড়ভাগিনও বলা হত। মালিকানার প্রশ্নটি এ সময়ে তর্কাতীত ছিল না। কৌটিল্য রাজাকে ভূমির প্রকৃত মালিক মনে করতেন না। রাজ্য রক্ষা ও প্রজা পালনের জন্য বেতনভুক্ত মনে করতেন। রঘুবংশে উল্লেখ আছে যে, রাজা পৃথিবীকে রক্ষা করেন বলে খনিগুলিকে বেতন হিসাবে পান "এবং রাজকর রাজার প্রতি নিবেদিত সামান্য একটু উপহার ছাড়া কিছু না"। ৩

১। আন্দ্রোনভ, কোকা, বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি ও কভোভাস্কি, গ্রিগোর, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃঃ-৫০।

২। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৮।

৩। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজা প্রজা শোষণের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতেন । দেখা যায় যে, যে সমস্ত অঞ্চলে উর্বরতা বেশী এবং পরিবেশ-প্রতিবেশ ও উৎপাদন কৌশলের কারণে জমিতে বেশী ফসল হয় সেখানে অনেক বেশী পরিমাণে রাজস্ব আদায় করা হত । কোন কোন ক্ষেত্রে উক্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল উৎপাদিত ফসলের একতৃতীয়াংশ । গ্রাম সমাজের মুক্ত সদস্য ও ছোট ছোট স্বাধীন কৃষি-জীবিরা রাজস্বের প্রধান অংশ বহন করতে বাধ্য হত । এ ছাড়াও রাজা বিশেষ প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অপব্যবহার করেও প্রজাকুলকে নিঃস্ব করতেন । পতনজলী বলেছেন যে, মৌর্য রাজারা স্বর্ণ সংগ্রহের প্রয়াসে মূর্তি প্রতিষ্ঠা করতেন । " ১..... বিশেষ বিশেষ মন্দিরে এই সব দেব মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর এ গুলির উদ্দেশ্যে যে সব মূল্যবান উপহার, উপচার নিবেদিত হোত সে সমস্ত যথাকালে জমা পড়ত রাজকোষে" কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও উক্ত উপায়ে ধন সম্পত্তির সংগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় । তিনি বলেছেন যে, "অর্থনৈতিক সংকটের সময় রাজ. নিজ রাজকোষ পূর্তির জন্যে বিভিন্ন মন্দির থেকে মূল্যবান অলংকার, ইত্যাদি নেবারও অধিকারী ছিলেন ।" ২

রাজা যে ভূ-সম্পত্তির একচ্ছত্র মালিকানা ভোগ করতেন সেই মালিকানায় মধ্যসত্বভোগীদের আগমন ঘটতে থাকে এ সময়কালে । প্রায় ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণেরা রাজকর দেয়া থেকে অব্যাহতি পেতে থাকে । এবং এদের সাথে যুক্ত হয় বেদাভিজ্ঞ পন্ডিত, আশ্রমবাসী সন্যাসী ও রাজার পুরোহিতবর্গ । " রাজকর থেকে কারা অব্যাহতি লাভের যোগ্য তার তালিকা দিতে গিয়ে কিছু কিছু পুথিতে 'রাজার অনুচরবৃন্দ' অর্থাৎ যারা রাজার অধীনে চাকুরী করেছেন, তাঁদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ।" ৩

১। আন্দোনভা, কোকা, বোনগার্দ - লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভাস্কি, গ্রেগোরি, "ভরতবর্ষের ইতিহাস," প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ পৃঃ ৯৯

২। প্রাগুক্ত ।

৩। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

এই সমস্ত রাজকর থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত ব্যক্তিরা জমির উপস্বত্ব ভোগ করতে থাকে এবং সমগ্র রাজ করের বোঝা কৃষক ও কারুশিল্পীদের ওপর চেপে বসে । স্পষ্টতই ভূ-সম্পত্তির মালিক ও কৃষকশ্রেণীর মধ্যে একটা শ্রেণী বিভেদ দেখা দিতে থাকে । অনেকে মনে করেন যে, সামন্ত সম্পর্কের উন্মেষের এটাই এশান্তিকাল । এই শ্রেনীভেদ প্রবলতর হতে থাকে এবং সুবিধাভোগীশ্রেনীর হাতে সম্পত্তি কুক্ষিগত হতে থাকে ।

এ সময়ে সামন্ত প্রথা প্রবলতর হয়ে উঠতে পারেনি কয়েকটি কারণে । তার মধ্যে প্রধাণতঃ রাষ্ট্রীয় সেচ ব্যবস্থা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । যেহেতু উৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমের ধরনটাই ছিল কৃষিকাজ তাই রাষ্ট্রীয় সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়েছিল । এবং এর বিকল্প গড়ে ওঠেনি । কেননা অধিকাংশ জমির মালিক ছিলেন রাজা স্বয়ং । ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে সেচ ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহন করা ও সেই পরিকল্পনা কার্যকর করা ছাড়া কৃষি উৎপাদনকে নিশ্চিত করার অন্য উপায় ছিল না । তবে গ্রামীণ সমাজগুলি যৌথভাবে এবং কৃষকরাও ব্যক্তিগতভাবে ছোট ছোট সেচের ব্যবস্থা করতেন ।

রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রন থাকা সত্ত্বেও "খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের দ্বিতীয়ার্ধে ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তির মালিকানার আরও প্রসার ঘটে " ১

দেশের ভূ-সম্পত্তির মালিকানা প্রধাণত তিনটি ভাগে বিভক্ত ছিল । প্রথমতঃ গ্রামের কৃষকেরা অল্প পরিমাণে জমি নিজে চাষের আওতাধীন রাখতে পারতো এবং সে জমির মালিক ছিল কৃষক নিজেই, দ্বিতীয়তঃ গ্রামগোষ্ঠীগুলি যৌথভাবে চাষ আবাদ করতো বলে যৌথ মালিকানা ছিল , এবং রাজার খাস দখলী জমির উৎপাদনের মালিক ছিলেন রাজা কিন্তু চাষ করতেন কৃষকরা । ধনী মালিকেরা নিজেরা চাষ না করে কৃতদাস ও ক্ষেতমজুর দিয়ে চাষ করাতেন ।

১। আন্তোনভা কোকা, বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভস্কি গিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮২ । পৃঃ ১১৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

জমির মালিকানার বিষয়টি সুনির্দিষ্ট ছিল । ভূ-সম্পত্তির উপর অধিকার অলংঘনীয় ও সুরক্ষিত ছিল । মনুসংহিতায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ আছে যে, "একমাত্র জমির মালিকেরই অধিকার আছে তার জমি সম্বন্ধে যে কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার, প্রয়োজন বোধ করলে তিনি নিজের জমি বিক্রী করতে , দান করতে, বন্ধক রাখতে কিংবা ইজারা দিতে পারেন ।" ১

জমির উপর প্রজার ব্যাক্তিমালিকানাকে এই সময় খুব বিস্তার সাথে মূল্য দেয়া হয়েছিল । নারদ স্মৃতি (খ্রীষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দী) প্রজার মালিকানাকে খুবই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হিসেবে উল্লেখ করেছে । এমনকি রাজা-প্রজার মালিকানার দ্বন্দ্ব নিয়েও মন্তব্য করেছে । তার মতে রাজা ব্যক্তিমালিকানাকে ক্ষুন্ন করে কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন না । ব্যক্তিমালিকানার ভিত্তিকেও লংঘন করতে পারেন না ।২ তবে রাজশক্তি সর্বদাই সম্পত্তির মালিকদের অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করে থাকে । রাজা প্রজার এই দ্বন্দ্বের বিষয়টি বৃহস্পতি-স্মৃতিতেও উল্লেখিত হয়েছে । তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর এ স্মৃতি গ্রন্থে (বৃহস্পতি-স্মৃতি) সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে "রাজা যদি ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি এক ভূ-স্বামীর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে তা অন্যকে দান করেন, তবে তিনি আইন-এর বিরুদ্ধ কাজ করবেন ।" ৩

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়টির সুত্র ধরে বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতে ব্যক্তিমালিকানাধীন জমির অস্তিত্ব ছিল না বা ব্যক্তিবিশেষ ভূ-সম্পত্তির মালিক ছিল না - এ সম্পর্কে বিভিন্ন জনের উক্তি ও মতামত সর্বাংশে সঠিক হতে পারে না । (মেগাস্থিনিসের যে বিবরণ থেকে ডিওডোরাস মন্তব্য করেছেন এবং যা থেকে ইউরোপের ইতিহাসবেত্তারা পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করেছেন সেই বিষয়টি সম্পর্কেও একই মন্তব্য করা যায়) । ব্যক্তিমালিকানাধীন, জমির নিয়ত বৃদ্ধি হওয়ার কারণে সামাজিকভাবে

১। আন্তোনভা, কোকা, বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভস্কি গিগোরি, ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮২ । পৃঃ ১১৮

২। নারদ স্মৃতিতে উল্লেখ আছে যে স্বয়ং রাজারও অধিকার নেই ব্যক্তি মালিকানার ভিত্তিকে লংঘন করার.... "

প্রাগুক্ত । পৃ-১১৯

৩। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

রাজা ও প্রজার জমির প্রকৃতি ও খাজনার প্রকৃতি বিশিষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দেয়। রাষ্ট্রীয় জমি ও রাজার খাস দখলিভুক্ত জমি ছিল রাজার একচ্ছত্র অধিকারে। রাজার নিজস্ব অনুচরেরা তার সম্পত্তির দেখাশোনা করতেন। রাষ্ট্রীয় জমি বলতে বোঝাত জঙ্গলাজাত, খনি ও পতিত বা অনাবাদী জমি। রাজস্বের প্রকৃতিতেও ভিন্নতা দেখা যায়। "রাজার নিজস্ব জমি থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হত তাকে বলা হত 'সীতা', আর অন্যান্য ব্যক্তিগত ভূ-সম্পত্তি থেকে যে কর আদায় করা হত তাকে বলা হোত ভাগ।" ১ স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, 'সীতার' পরিমাণ সর্বাধিক ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে সমগ্র উৎপাদনের অর্ধেক কোন কোন সময় তিন চতুর্থাংশ। কিন্তু ভাগ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই একষষ্ঠাংশ ছিল " ২

ভূ-সম্পত্তির উপর কৃষকদের বংশানুক্রমিক মালিকানা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হতে থাকে মৌর্যোত্তর কালে এবং গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করার ফলে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শিথিল হয় এবং রাজশক্তির বিকেন্দ্রীকরণ হতে থাকে। এই বিকেন্দ্রীকরণের ধারায় রাজক্ষমতা ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণদের হাত হয়ে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের হাতে প্রতিস্থাপিত হতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যান্য পেশাজীবীরাও ভূমিদান পেতে থাকেন। সামন্ত মহারাজা স্বামী দাস জনৈক বণিককে এইরূপ একটি ভূমিদান করেছিলেন।

ভূমিদানের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তার চিরস্থায়িত্ব। যাকে ভূমিদান করা হত তিনি বংশানুক্রমে ভূমির মালিকানা পেতেন। পূর্বেকার সাময়িক ভূমিদান প্রথা উঠে গিয়ে যে চিরস্থায়ী ভূমিদান প্রথা চালু হয় তার ফলে মধ্যস্বত্বভোগী সামন্তরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবল ক্ষমতাধর উৎপাদনশর্ত হিসেবে নিজেদের ভূমিকা ও স্থান সুদৃঢ় করে নেয়। এই অবস্থা সৃষ্টি হয় "খ্রীষ্টীয় পঞ্চম

১। আন্দ্রোনভা কোকা, বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভাস্কি গ্রিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃঃ ১২০

২। একটি প্রাচীন মহাকাব্যে রাজা সম্বন্ধে উক্তি করা হয়েছে যে 'তিনি শস্যের ষড়ভাগের অপহর্তা।'
প্রাগুক্ত। পৃ-১২০।

Dhaka University Institutional Repository

শতকের পর থেকে যখন রাজারা ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি সম্পর্কিত প্রায় সকল রাজকর, শাসন পরিচালনা ও আইনগত দায়দায়িত্বগুলি ওই সব জমির মালিকদের হাতেই ছেড়ে দিতে থাকেন।" ১ ফলে উৎপাদন সম্পর্ক মারাত্মকভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। ভূমিদাস প্রথার জন্ম হতে থাকে এবং পুরাতন কৃষকদের ভূমি থেকে উৎখাত করে ক্ষেত মজুরে পরিণত করার প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। বেগার প্রথাও দেখা দেয়। "কাম সূত্র থেকে জানা যায় যে গুপ্তকালে এবং গুপ্তোত্তর কালে গ্রাম প্রধান নিজের সুখসুবিধার জন্য বেগার আদায় করে থাকত। কাম সূত্রের অনুসারে কৃষকরমনীদের বিনা পারিশ্রমিকে বিভিন্ন প্রকার কাজ করতে বাধ্য করা হত। যেমন গ্রাম প্রধানের ধান তোলা, তার বাড়ীতে জিনিষপত্র পৌছানো বা বাড়ি থেকে জিনিষপত্র অন্যত্র নিয়ে যাওয়া, ঘরদুয়ার পরিস্কার করা, পশম পাট বা সুতো কাটা, ইত্যাদি।" ২

এই সমস্ত মধ্যস্বত্বভোগী বা ভূস্বামীরা যে ভূমির উপর মালিকানা ভোগ করতেন তাকে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিতে ভিন্নরূপে দেখা হত। সামন্ত ভূ-স্বামী বা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রের কাছে ভূমি বলতে বোঝাত সেই ভূ-খন্ড যার অধিবাসীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে হোত প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণে বেঁধে দেয়া রাজস্ব।

কিন্তু স্বাধীন কৃষকের কাছে ভূমি শব্দটির অর্থ ছিল যে জমিতে সে স্বাধীন চাষাবাদ করতে পারে সেই নির্দিষ্ট একখানি ক্ষেত। এই জমি কৃষক দীর্ঘকাল কাজে না লাগালেও এর উপর তার অধিকার অক্ষুন্ন থাকতো।

সামন্তবাদ বিকাশের সাথে সাথে ব্যক্তিমালিকানা ক্ষুন্ন হতে থাকে। গ্রাম অনুদান প্রথা বৃদ্ধি পেতে থাকলে স্বনির্ভর গ্রামগুলির স্বাধীন কৃষকরা দানগ্রহিতার ভূমিদাসে পরিণত হতে থাকে।

১। আন্তোনভা, কোকা, বোগার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভস্কি, গ্রিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮২। পৃঃ ১৭৮।

২। শর্মা, রামশরণ, "ভারতে সামন্ততন্ত্র", কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭। পৃঃ ৪১-৪২।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগের কৃষকদের অবনতির অনেক গুলি কারণের মধ্যে করের বোঝা অন্যতম । দান গ্রহিতারা নূতন কর আরোপ করার অধিকারী হওয়ায় রাজাকে দেয় এক ষষ্ঠাংশ ছাড়াও কৃষকেরা সামন্তদেরকে নানাবিধ কর দিতে বাধ্য হত ।

কৃষকদের অবনতির দ্বিতীয় মুখ্য কারণ এক বিশেষ জাতীয় বেগার প্রথা । এই নূতন ধরনের বেগার প্রথা পূর্বেকার ক্রীতদাস ও ভাড়াটে শ্রমিকদের দ্বারা যে বেগার খাটানো হত তার থেকে আলাদা ছিল । বেগার প্রথার অত্যাচার বাংলা দেশ ও বিহারে সবচেয়ে বেশী পরিলক্ষিত হয়েছিল ।

অনুদানভোগী দানলব্ধ জমি পুনরায় দান করার মাধ্যমে কৃষকদের উপর যে অতিরিক্ত মধ্যসত্বভোগীর অধিকার চাপিয়ে দেয়া হত অনেকেই তাকে কৃষকদের সর্ব্বশান্ত হওয়ার তৃতীয় কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন । অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, "অনুদানভোগী তার নিজের অধিকার অন্যকে ভোগ করতে দিতে পারার অধিকারী ছিল । ফলে অধঃস্তন আর একটি মধ্যসত্বভোগীর সৃষ্টি হয় । "মধ্যযুগের আরম্ভকালের কিছু ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায় যে, রাজা ও প্রকৃত জমি চাষীর মধ্যে জমির উপর কোন না কোন প্রকার অধিকার রাখে এমন চারটি শ্রেনীর অস্তিত্ব ছিল । " ১

উপরোক্ত তিনটি কারণে কৃষকদের স্বচ্ছলতা চলে যেতে থাকে এবং অনেকেই দরিদ্রতর হতে হতে ক্ষেতমজুরে পরিণত হয় । কৃষকরা তাদের জমি জমা বাকী খাজনার কারণে ভূ-স্বামীকে হস্তান্তর করতে বাধ্য হয় এবং চাষকাজ করার নিমিত্তে প্রয়োজনীয় লাঙল গরুর জন্য ভূ-স্বামীর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে ।

১। শর্মা, রামশরণ, "ভারতের সামন্তবাদ", কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭ । পৃঃ ২২৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

ভূ-স্বামীরা কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকারের অপপ্রয়োগ করে বা প্রকৃত অর্থের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে কৃষকদেরকে তাদের জমিদারী থেকে উৎখাত করতে পারতেন। ফলে স্বাধীন কৃষকরা তাদের নিজের জমিতেই ক্ষেত-মজুর হয়ে কাজ করতে বাধ্য হত।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, রাজা ভূ-সম্পত্তির অনুদান দেয়ার সাথে সাথে গ্রামের কৃষক ও অন্যান্য অধিবাসীদেরকেও দান করতেন। এই দানের বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হত। কেননা দেখা গেছে যে কৃষকরা সামন্তদান পছন্দ করত না। মধ্যসত্বভোগীর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তারা গ্রাম পরিত্যাগ করে অন্যত্র বসতি স্থাপন করতো। গ্রাম ত্যাগকারী কৃষকরা অনাবাদী জমি আবাদ করে সরাসরি রাজার প্রজা হওয়ার চেষ্টা করতো। তাদের জন্য সে সুযোগ সব সময়ই উন্মুক্ত থাকতো। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চাষ করবে (পত্তনি আবাদ অর্থে) সে জমির মালিকানা ঐতিহ্যগতভাবে তারই। এই পালিয়ে যাওয়ার প্রবণতা রোধ এবং পালিয়ে যাওয়ার কারণে উদ্ভূত শ্রমিক সংকট পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রাজা তার দানপত্রে অধিবাসী সমেত গ্রামদান প্রথা চালু করেন। শর্মা উল্লেখ করেছেন যে, "অনুদত্ত গ্রামের অধিবাসী শিল্পী, রাখাল এবং চাষীদেরও মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় ভূমিদাসের মত দান গ্রহীতার হাতে সমর্পন করা হয়েছিল। শ্রমিকের অভাবের ফলেই প্রাচীন অর্থ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখার জন্য এইরূপ প্রথার প্রচলন হয়েছিল বলে মনে হয়" ১

মধ্যযুগের সামন্ত সমাজে তিন ধরণের ভিন্ন জীবন যাত্রার ও জগতের অস্তিত্ব ছিল। প্রথমতঃ সামন্ত প্রভু বা মন্দির ও তার অনুগামী ও সংশ্লিষ্ট জগত। দ্বিতীয়তঃ গ্রামীন সুনির্ভর স্বায়ত্বশাসিত সমাজ ও তৃতীয়তঃ অপূর্ণ বিকশিত শহর।

১। শর্মা, রামশরণ, "ভারতের সামন্তবাদ", কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭। পৃঃ ২২৫।

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজের সাধারণ রূপ আলোচনা করার আগে শহরগুলি বিকশিত না হওয়ার কারণগুলি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা যেতে পারে ।

ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণে নিশ্চিত হওয়া যায় যে মধ্যযুগের ভারতে শহরগুলি বিকশিত হয়েছিল । এয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতেও শহরগুলি ব্যাপক স্বায়ত্ব শাসন ভোগ করত । বিকাশমান নগরগুলির মধ্যে সমুদ্র-বন্দরগুলি অধিকতর বেশী মাত্রায় স্বাধীনতা ভোগ করতো । নগর পরিষদ নগরের অধিবাসীদের জীবন যাত্রা নিয়ন্ত্রণ করত । সাধারনতঃ নগর পরিষদের সদস্যপদে থাকতেন অপেক্ষাকৃত ধনী ও অধিক প্রভাবশালী জাতি বা সম্প্রদায়গুলির প্রধানরা । সাধারনতঃ বনিকদের প্রতিনিধিরা পরিষদগুলির সদস্য হতে পারতেন এবং কখনো কারুশিল্পীরাও (যেমন : তামা-কারিগর, তৈলকার ইত্যাদি) এই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হতেন । নগর পরিষদ শহরের আইন শৃংখলা রক্ষা করা ও মামলামোকদ্দমা নিষ্পত্তি করতে পারতো । এমনকি তারা নিজ দায়িত্বে শুল্ক ও করের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিতে পারতো । এই নগর পরিষদগুলি ছিল বহু সম্প্রদায়ের মিলিত সংগঠন । এবং বহু পরিমাণেই এগুলি ছিল স্বায়ত্বশাসিত ।

শহরগুলির বিকাশের প্রথমাবস্থায়ই স্বাধীন ও স্বাভাবিক পরিণতি ব্যহত হয় । শহরগুলির বিকাশের কালে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা প্রবল ছিল । কিন্তু পরবর্তীকালে সামন্তদের ক্ষমতাবৃদ্ধির সাথে সাথে শহরের স্বাধীন বিকাশ বন্ধ হতে থাকে । পূর্বেকার নিয়মে রাজস্বের ভাগ রাজাকে না দিয়ে সামন্তের মাধ্যমে দেয়ার প্রথা চালু হওয়ার কারণে স্বাধীন বণিক-সংঘগুলি তাদের কার্যক্ষমতা হারাতে থাকে । অনেক ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীরা রাজস্ব আদায় করতে এবং রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট

– Dhaka University Institutional Repository

করতে থাকলেন । এমনকি ছোট ছোট দোকান ও কারশিল্পীদের মহল্লা থেকে সামন্ত ভূ-স্বামীরা নিজেরাই খাজনা আদায় করতে থাকায় নগর পরিষদ ও বণিক সংঘ তাদের রাজনৈতিক প্রভাব হারাতে থাকে । ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পর থেকে রাজারা একেকবারে একটি বা কয়েকটি গোটা শহরই দান করে দিতে লাগলেন সামন্ত ভূ-স্বামীদের হাতে । ফলে চতুর্দশ শতাব্দী থেকে শুরু করে শহর গুলির সু-প্রশাসন ব্যবস্থার কার্যত আর অস্তিত্বই রইল না । সামন্তভূ-স্বামীরা ঠিক যতখানি গ্রামে ততখানিই শহরে প্রবর্তন করলেন স্বৈর-শাসনের । এর পর থেকে বণিকরা ধন সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও সামন্ত-ভূ-স্বামীদের খেয়াল খুশীর শিকার হয়ে উঠলেন । প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, রাজা বা সামন্ত রাজার প্রয়োজন মতো মোটা মোটা অর্থের যোগান না দিলে তাদের উৎপীড়ন করা, এমন কি কখনও কখনও কারারুদ্ধ করাও হতে লাগলো । ফলে পুঁজিতন্ত্রী সম্পর্কের বিকাশ ভূমিব্যবস্থাতেই ধ্বংশ হয়ে যায় ।

নগরগুলির বিকাশ রুদ্ধ হওয়ার কারণে সামন্ত স্বৈর-তন্ত্র চরম পর্যায়ে উপনীত হতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হতে থাকে । ফলে বহু সাম্রাজ্যের পতনও হয় । ১

ষষ্ট থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বহু বিচিত্র রাজা ও রাজ্যের আবির্ভাব ঘটেছিল । যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাড়িয়েছিল । কিন্তু এর মধ্যেই ভারতীয় সমাজের সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনে সামন্ততন্ত্রীভবনের একটি দীর্ঘ ও এমিক প্রক্রিয়া সুগভীর ক্রিয়াশীল ছিল । দু' ভাবে উক্ত প্রক্রিয়া কাজ করে । একদিকে যতবেশী পরিমাণে জমি এমশঃ খাজনার অধীন করা হতে লাগলো তত বেশী পরিমাণে সেগুলি বিলি করা হতে লাগলো ভূমি

১। আন্দ্রোনভা,, কোকা, বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভস্কি, গ্রিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ । পৃঃ ১৬১-২৬৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

দান হিসাবে । আর এই সব দান করা জমির গ্রহিতারা কেন্দ্রীয় সরকার ও তাদের উপর নির্ভরশীল কৃষক-প্রজাবৃন্দ উভয়ের সংগেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ বেশী বেশী অধিকার ভোগের সুযোগ সুবিধা পেতে লাগলেন । অপর দিকে গ্রামীণ সমাজের মধ্যেই গ্রাম সংগঠনের কর্মচারিরা বিশেষ করে মোড়লেরা প্রায়ই ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদের ওপর অধিকতর ক্ষমতা-প্রয়োগের অধিকারী হয়ে উঠলেন । নিজ নিজ গ্রামের মধ্যে ভূমি রাজস্বের বাটোয়ারার ব্যাপারে তাদের কর্তৃত্ব ক্ষমতা অধিকতর গুরুত্বপুর্ণ হয়ে উঠল এবং ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকলো । এর অর্থ ইতিপুর্বে এইসব গ্রামকর্তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল সমগ্রভাবে সমাজের স্বার্থ রক্ষা করে চলা, কিন্তু অতঃপর প্রধান গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার হয়ে দাড়াল রাষ্ট্রযন্ত্রের কর্তৃত্বাধীন গ্রামীণ শাসন ব্যবস্থার পরিচালক হিসেবে তাদের ভূমিকাই । অধিক অনাবাদী জমি কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে এই গ্রামকর্তাদের নিয়ন্ত্রন ক্ষমতার মধ্যে দিয়ে এবং নিজেদের প্রয়োজনে জমি দখল ও অন্যান্য গ্রামবাসীর বেগার খাটুনিকে ইচ্ছেমতো কাজে লাগানোর মধ্যে দিয়ে এইরকম কিছু কিছু গ্রাম্য মোড়লেরও কার্যত ছোটখাট, সামন্ততান্ত্রিক ভূ-স্বামী হয়ে দাড়ানোর সুযোগ হলো । আর কার্যত তারা এইসব পদমর্যাদার অধিকারী হলেন তা পরে রাজকীয় সনদবলে আইন সংগত হয়ে দাড়াল ।

আলোচ্য যুগে (খ্রীষ্টীয় ষষ্ট থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) অধিকাংশ খোদাইকরা লিপিতে রাজার ধর্মপ্রবনতা প্রচারে উদ্দেশ্য, ব্রাহ্মণদের ভূমি দানের বর্ণনাও পাওয়া যায় । এই সমস্ত ভূমিদানের উল্লেখ করা হয়েছে 'চিরস্থায়ী' আখ্যা দিয়ে এবং এগুলিকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে টেকসই উপাদানের ওপর সাধারনত তাম্রফলকের গায়ে । অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষ ভাবে অপর কিছু কিছু মানুষকেও ভূমিদান করা হত তখন আর তা লিপিবদ্ধ করা হোত সহজে নষ্ট হয় এমন তালপাতায় নয় ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত তাম্রফলকের মতো তামার পাতেই । তবে এটাও সম্ভব যে রাজকার্য নির্বাহ

Dhaka University Institutional Repository

সময়কালের জন্যেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের (নির্বাহী) এ ধরনের কিছু কিছু ভূমিদান করা হতো ।

বিনা ব্যতিক্রমে এবং বিশেষ করে বংগদেশে এই ধরনের ভূমিদানের অধিকারী ছিলেন সামন্ততান্ত্রিক রাজারা । এরা কখনো কখনো কেন্দ্রীয় শাসন কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুযায়ী আবার কখনো বা তাদের অজ্ঞাতসারে (যথেষ্ট সাহসী হয়ে) এই সমস্ত ভূমি দান করতেন । খ্রীষ্টীয় দশম শতকে বড় বড় রাজ্যের ক্ষয়প্রাপ্তির দিনে এই ধরণের ভূমিদানের রেওয়াজ বিশেষভাবে চালু হয় ।

খোদাইকরা লিপিগুলিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বিভিন্ন ব্যক্তির যেমন সার্বভৌমরাজা, বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জেলা শাসক, প্রভৃতির খেতাব, পদমর্যাদা, ইত্যাদির উল্লেখ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে বিশেষ করে বংগদেশে এক বিকশিত সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল ।

এইসব সামন্তপতিরা নানাবিধ অবৈধ কর আরোপ করতে থাকেন । কিছু কিছু অবৈধ করের মধ্যে বিবাহ, নিঃসন্তান অবস্থা, উৎসব উদ্‌যাপণ ও ভূ-স্বামীর গৃহের পারিবারিক উৎসব-উদ্‌যাপণ উপলক্ষে ধার্যকর হতো। পূর্বেকার সুনির্দিষ্ট কর ছাড়াও সামন্তদের ইচ্ছা মাফিক কর আরোপ করার ফলে সমগ্র করের পরিমাণ এমন বিশাল আকার ধারণ করে যে, কৃষকরা কার্যত নিঃস্ব হয়ে পড়ে । এর সাথে যোগ হয় বাধ্যতামূলক শ্রম । এই বাধ্যতামূলক শ্রম বা বেগার খাটা ছিল ইউরোপীয় 'ক্যরভে'রই একটা রকমফের ।

এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার একটা দুর্বল দিকও ছিল । ভারতে যুদ্ধ বিগ্রহ ও রাজা বদলের পালা চলে ছিল দীর্ঘদিন ধরে । ফলে সামন্তরাও পরিবর্তিত হতে থাকে । যদিও মন্দিরগুলিকে তখন ভূমিদান করা হোত 'যতদিন চন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

সূর্যের অস্তিত্ব আছে ততদিন' এর জন্য এবং উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে মন্দিরের জমিতে সম্ভাব্য হস্তক্ষেপকারীর বিরুদ্ধে অভিশাপ বানী লিপিবদ্ধ থাকত, তবু ঐতিহাসিক দলিল পত্রাদি থেকে এটা পরিস্কার হয়ে ওঠে যে প্রায়শই বিশেষ করে রাষ্ট্রিক উপপ্লবের সময়ে যখন এক রাজ্যের পতন ও অপর এক রাজ্যের উৎথান ঘটত কিংবা যখন বিদেশী আগ্রাসকের অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারন পরাধীন হয়ে পড়ত তখন কেবলমাত্র সামন্ত-ভূস্বামীদের তালুকই নয়, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ও মন্দিরের অধীন জমি জমাও রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নিত । এ থেকে বোঝা যায় কিভাবে ওই যুগে রাষ্ট্রের অধীনস্থ জমি ও সামন্ত ভূ-স্বামীদের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমির আপেক্ষিক পরিমাণের মধ্যে অনবরত রদবদল ঘটত । ১

ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্রের মত দৃঢ়মূল আর্থসামাজিক অবস্থায় উপনীত না হয়ে একটি পরিবর্তনশীল মধ্যেসত্বভোগী অস্থায়ী সামন্ত প্রথার জন্ম দেয় । কিন্তু গ্রামীণ সমাজের যে মোড়ল বা ক্ষুদে সামন্ত মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসে তার পরিবর্তন না হয়ে বরং স্থায়ী হয় ।

অনেকে মনে করেন যে, মোঘল আমলে জমিদারী ব্যবস্থা নুতন করে সামন্ত সম্পর্ক সৃষ্টি করেছিল । ভারতে হিন্দু আমলের পর মুসলিম আমলেই কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্র প্রবল হয়ে উঠেছিল বিধায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই মুসলমান শাসন আমলে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

১। আন্তোনভা, কোকা, বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভাস্কি, গ্রিগোরী, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ । পৃঃ ২৫৭-২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(খ) মুসলমান শাসন আমলে বাংলাদেশের সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ও বিকাশ।

বাংলাদেশের সামন্তবাদের শ্রেষ্ঠ কাল হিসাবে হিন্দু আমলকেই উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামন্তযুগের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছিল বলে মনে করা হয়। রামশরণ শর্মা বলেছেন "প্রাকমুসলিম মধ্যযুগকে ভারতীয় সামন্তবাদের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে।" ১ কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, মুসলমান আমলে নগদ দান প্রথার সূত্রপাত হয় এবং পুরানো সামন্তবাদের মৌলশর্ত ভূমিদাস প্রথার উপর ভিত্তি করে বিকশিত সামন্তবাদের এক্ষবিকাশ ঘটে। তার সাথে একমত হওয়ার আগে আমাদের মুসলিম আমলে সামন্তবাদের প্রকৃতরূপ পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

ভারতের মুসলিম আমলকে মধ্যযুগ হিসেবে অনেক ঐতিহাসিক চিহ্নিত করেছেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর পর থেকে পুরো মুঘল আমল মধ্যযুগ হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে আরব আগ্রাসকরা আসতে থাকেন। এবং এরপর থেকে ভারতে মুসলমানী শাসনের প্রভাব ধীরে ধীরে দৃঢ় হতে থাকে সুলতানী আমল পার হয়ে মোঘল আমলে তা দৃঢ়মূল প্রথিত হয়।

এই মুসলমান আমলই মধ্যযুগীয় ভারতের দ্বিতীয়পর্ব। মুসলমান আমলে সামন্তবাদের রূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় হিন্দু আমলের সামাজিক, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের ফলে নূতন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা (সম্পর্ক) সৃষ্টি হয়েছে। যেমন মধ্যযুগীয় হিন্দু আমলের "ভারতে ছিল বলতে গেলে তিনটি বিভিন্ন জগৎ ও তার তিন ধরনের বিচিত্র জীবনযাত্রা-প্রণালীর অস্তিত্বঃ প্রথম সামন্তপ্রভু বা মন্দির ও তার অনুগামী ও সংশ্লিষ্ট জগৎ; দ্বিতীয়, গ্রামীণ সমাজ, এবং তৃতীয়-শহর।" ২

১। শর্মা, রামশরণ, "ভারতের সামন্তবাদ", কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭। পৃঃ ২৩০।

২। আন্তোনভা, কোকা, বোনগার্দ-লেভিন ও কতোভস্কি, গ্রিগোরি, ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃঃ ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম আমলে এই তিনটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাই বিপুলভাবে পরিবর্তিত হয়। সামন্তপ্রভু বা মন্দির ও তার অনুগামীরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারায় কিংবা বদল করতে বাধ্য হয়। গ্রামীণ সমাজ তার ভূমি মালিকানায় একাধিপত্য রাখতে ব্যর্থ হয় এবং মুসলিম শাসকেরা কেতাবী সার্বভৌমত্ব এবং শোষক মালিকানা চাপিয়ে দেয়। আর শহরগুলি হারায় তাদের স্বায়ত্বশাসন। শহরগুলির সমৃদ্ধির সময়ে তাদের উপর ভূস্বামী ক্ষমতা কায়েম হয়।

মুসলিম আমলের এই পরিবর্তনের মূল কারণ নিহিত আছে - ভূমি মালিকানা এবং ভূমি রাজস্বব্যবস্থার উপর। ভূমি মালিকানা এবং ভূমি রাজস্বের মূলভিত্তি গ্রাম হলেও উপসত্বভোগী হিসেবে জমিনদারী ব্যবস্থা কায়েম হয়। এই উপসত্বভোগীদের সামাজিক অবস্থান ও শ্রেণী চরিত্র অনুধাবনের জন্য মুসলিম আমলের জমিদারী ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিষদ পর্যবেক্ষণমূলক আলোচনা প্রয়োজন হেতু করা যেতে পারে।

আধুনিক সমাজ ঐতিহাসিকগণ জমিদার বা জমিনদার বলতে জমির মালিককেই বুঝিয়ে থাকেন। তাছাড়া 'জমিদার' বৃটিশ শাসকদের দ্বারাই প্রথম সৃষ্টি কি-না তা নিয়ে বিতর্ক আছে। প্রশ্ন উঠেছে ঃ মুঘল আমলের লেখাপত্রে ব্যবহৃত জমিনদার কথাটি আজকের অর্থই বোঝাত কিনা। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই শব্দটির তখন কি অর্থ ছিল সে বিষয়ে কি 'আইন-ই-আকবরী' কি আরও সহজলভ্য কোন ঐতিহাসিক তথ্যসূত্রে কোথাও সরাসরি কোন ব্যাখ্যা দেওয়া নেই। অনেকেই অনেকটা অনুমানের মতো মতামত হাজির করেছেন। সাধারনভাবে গৃহীত এই মত যে, মুঘল আমলে 'জমিনদার' বলতে আসলে বোঝাত সামন্ত প্রধান। আর সাম্রাজ্যের যে অংশগুলি প্রত্যেক্ষভাবে প্রশাসনের আওতায় ছিল সেখানে তার কোন অস্তিত্বই থাকতে পারে না। সমসাময়িক তথ্যসূত্রে প্রায়শই জমিনদার কথাটি যে সাধারনভাবে

Dhaka University Institutional Repository

'প্রধান' দের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই । তবে এটি তার সামগ্রিক বা এমনকি প্রকৃত অর্থ কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে । কেননা আইন-ই-আকবরীতেই যথেষ্ট নজির আছে যে প্রত্যক্ষ প্রশাসনিক এলাকাতেও জমিনদার ছিল ।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে "জমিনদার" এর কোন সংজ্ঞা নেই । এর মূল উপাদানগুলির কোন বিবরণ নেই । ফলে জমিনদার শব্দের ঐতিহাসিক বুৎপত্তি আলোচনার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ।

আক্ষরিকভাবে 'জমিনদার' এই ফার্সী যৌগিক শব্দটির অর্থ 'যার জমি আছে' । শব্দটি ভারতে তৈরী হয়েছিল অনেক আগে, ১৪ শতক নাগাদ, খোদ পারস্যের রাজস্ব সংক্রান্ত নথিপত্রে শব্দটি পাওয়া যায় না । আবুল ফজল প্রায়ই 'বুমী' বলে জমিনদারদের সমার্থক আরেকটি ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন । অন্যান্য লেখকরা এটি কদাচিত প্রয়োগ করেন । আক্ষরিক দিক থেকে এটি জমিনদার এর সমার্থক (বুম অর্থ জমি) । পারস্যে এই শব্দটি কোন পরিভাষিক অর্থে ব্যবহার হতো বলে মনে হয় না । এই দুটি ফার্সী শব্দ বিশেষ করে "জমিনদার" বেশ চালু হয়ে গেলেও অনেক স্থানীয় নাম টিকে ছিল । ধরা হতো সেগুলি দিয়ে জমিনদারী সত্বই বোঝায় । অযোধ্যায় ছিল সতারহী এবং বিশ্বী, আর বলা হয়েছে রাজস্থানে ভূমিয়ারা ছিল জমিনদারদের যথার্থ প্রতিরূপ"।১ ১৭ শতকের শেষ দিকে, কার্যত সারাদেশ জুড়েই তালুক এবং তালুকদার বলে এক নূতন শব্দগুচ্ছের সাক্ষাত পাওয়া যায় । কতক জায়গায় জমিনদারী ও জমিনদার এর বদলে এই নাম ব্যবহার করা হয়েছে । বুৎপত্তিগতভাবে তালুক শব্দের অর্থ সংযোগ । ব্যবহারিক দিক দিয়ে এর অর্থ বুৎপত্তিগতভাবে অর্থের সাথে মেলে না ।২

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী ১৯৮৫ । পৃঃ ১৫০

২। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার - এর সর্বাধিক ব্যবহৃত সমার্থক শব্দ হলো 'মালিক' । কোন কোন নথিতে জমিনদারকে সরাসরি মালিক আখ্যা দেয়া হয়েছে । বহু নথিতেই দেখা যায় একই সত্ত্বের (মালিকানার রূপ ও প্রকৃতি) নাম হিসেবে এক জোড়ে রাখা হয়েছে মিলকিয়ৎ ও জমিনদারী । অন্যান্য সমার্থক শব্দগুলি অস্পষ্ট হলেও 'মালিক' এই আরবী শব্দটির নিজস্ব অর্থ আছে । মালিক অর্থ সত্ত্বাধিকারী । ইংরেজীতে যাকে বলা হয় প্রাইভেট প্রপার্টি (ব্যক্তিগত সম্পত্তি) মিলকিয়ৎ মানে প্রায় তাই । ১

মুহাম্মদ শাহ্-র আমলের শেষদিকে আনন্দ রাম মুখলিস দিল্লী দরবারের জনৈক কর্মচারী "জমিনদার শব্দটির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন মনে হয় এটিই তার আসল কথা । বুৎপত্তিগতভাবে (দর আসল) জমিনদার বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তি যিনি জমির অধিকারী (সাহিব এ জমিন) কিন্তু এখন এর অর্থ দাড়িয়েছে কোন ব্যক্তি যিনি গ্রাম বা শহরের মালিক এবং আবাদ চালাচ্ছেন" । ২ চাষীদের সত্যিও সত্যিও কখনও কখনও মালিক বলা হতো । কিন্তু মুখলিস-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী তাদের জমিনদার বলা চলে না । জমির মালিক মাত্রেই জমিনদার নন । জমিনদারীর সঙ্গে যোগাযোগ গ্রামের, জমির নয় । এই সময়ের নথিপত্রে সর্বদাই বলা হয়েছে, জমিনদারীর আওতায় কোন গ্রাম বা গ্রামের অংশ বিশেষ আছে, কখনই এত বিঘা বা এলাকার নির্দিষ্ট একর নয় । জমিনদারী এলাকা বোঝাতে মাঝে মধ্যে 'বিশ্বা' বলে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা আসলে ঐ নামের এলাকার একর অর্থাৎ এক বিঘার একের কুড়িভাগ বোঝায় না । এটি গ্রামের একের কুড়িভাগের সুচক ।" ৩

সুতরাং জমিনদারী ছিল চাষীকে বাদ দিয়ে তার ওপর তলার এক গ্রামীণ শ্রেণীর স্বত্ব । চাষীদের সঙ্গে এই শ্রেণীটির আসল সম্পর্ক কি ছিল সে বিষয়ে খোঁজ

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানী ১৯৮৫ । পৃঃ ১৫০

২। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৫১

৩। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

করার আগে একটি বিষয় লক্ষণীয় ঃ সারা গ্রাম জুড়ে জমিনদারদের অধিপত্য ছিল না। প্রত্যেক জনপদেই মনে হয় এক বিরাট সংখ্যক গ্রামে কোন জমিনদারী স্বত্বই ছিল না। সুতরাং জমিনদারী গ্রাম থেকে আলাদা করে তাদের বলা হোত 'রাইয়তী' বা চাষী অধিকৃত গ্রাম। ১

জমিদারী স্বত্ব এবং রাইয়ত স্বত্বাধিকার সকল স্থানে একই রকম ছিল না। রাইয়াত গ্রামগুলি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী ছিল না। যদিও বাদশাহী প্রশাসন তাদের থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করত তবুও জমিদাররা জোর জবরদস্তি করে উপস্বত্ব ভোগ করত। যেমন গুজরাটে জমি ছিল রাইয়াত গ্রাম এবং জমিনদারদের দখলে ছেড়ে রাখা ছিল, তেমনি বিরাট এলাকার 'জমিনদারী গ্রামেরও দুটি করে অংশ থাকত। 'বাট' নামের অংশটির রাজস্ব জমিনদারদের হাতেই থাকত। 'তলপদ' বলে অন্য অংশটির রাজস্ব সংগ্রহ করত বাদশাহী প্রশাসন। পরের দিকে জমিনদাররা শুধুই তলপদই দখল করেনি, রাইয়াতী গ্রাম থেকেও তারা জোর করে গিরাস নামের জবরদস্তি আদায় করত।

জমিনদাররা জোর করে উপস্বত্ব ভোগ করলেও জমির কেতাবী মালিকানা এবং ঐতিহ্যগত মালিকানা রাইয়াতী গ্রামে প্রজাদের ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

জমিদারদের ও চাষীদের 'মিলকিয়ৎ' স্বত্ব ছিল পরস্পর নিরপেক্ষ। যেখানে একটা থাকত সেখানে তার অন্যটা থাকত না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এমনও হয়েছে যে, জমিনদারদের অধীনে গেলে চাষীরা তাদের দখলী স্বত্ব হারাত। এমন উদাহরণ থাকা সত্ত্বেও পরস্পর নিরপেক্ষ মালিকানায় অস্তিত্ব মেনে নেওয়া যায়।

১। হাবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, ১৯৮৫। পৃঃ ১৫২

Dhaka University Institutional Repository

জমিনদাররা জমির উপস্বত্ব একটা নির্দিষ্ট হারে ভোগ করত । কোথাও আইন সম্মতভাবে কোথাও বা জমিনদার নির্দিষ্টহারে বাদশাহকে কর দিত । কিন্তু তার আয় সর্বক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ছিল না । কোথাও কোথাও যেমন বাংলায়, জমিনদার গ্রামের রাজস্ব বাবদ কর্তৃপক্ষকে একটা বাধা অংকের টাকা দিত, তারপর প্রথামত বা নিজের নির্দিষ্ট হারে চাষীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করত । সেক্ষেত্রে তার আয় দাড়াত শুধু এই - যা সে সংগ্রহ করেছে আর তার থেকে কর্তৃপক্ষকে যা দিয়েছে এর বিয়োগফল । যেসব এলাকায় বাদশাহী প্রশাসন স্বয়ং কৃষকদের রাজস্ব হার বেঁধে দেওয়ার ব্যাপারে জোর করত সেখানে জমিনদারকে নিজের সুবিধার জন্য আলাদা উপকর বসাতে হতো । কিন্তু এ ধরনের এলাকায় প্রশাসনের প্রবনতাই ছিল রাজস্ব দাবী এতই বাড়িয়ে দেওয়া যাতে কৃষককে তার পক্ষে যতটা দেওয়া সম্ভব তার সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছুতে হয় । অর্থাৎ তার উৎপন্নের যাবতীয় উদ্বৃত্তই রাজস্ব দাবির আওতায় পড়ে যায় । এখানে ভূমি রাজস্ব দাবি কৃষকের কাছ থেকে অন্য সব আর্থিক দাবীর জায়গা দখল করে নিত । মনে হয়, অন্যান্য দাবীগুলি যেন ভূমি রাজস্ব থেকেই মেটানো হচ্ছে বা তার থেকেই ছাড় দেওয়া হচ্ছে পরিণামে এই চেহারা নিতে শুরু করে । জমিদারদের দাবী যখন এই চেহারা নিত, আর আদায়ীকৃত রাজস্বের ওপর একটি ব্যয়ভার হিসেবে দেখা দিত, তখন তাকে বলা হতো 'মালিকানা' । দিল্লী এবং বাংলার রীতিনীতির সঙ্গে ওয়াকিবহাল জনৈক সরকারী কর্মচারীর সংকলিত ১৮ শতকের একটি রাজস্ব পরিভাষাকোষে বলা হয়েছে 'মালিকানা' হলো জমিনদারের একটি অধিকার (হক) । যখন তারা জমিনদারের জমিকে মীর-এ পরিণত করে (অর্থাৎ এর ওপর সরাসরি রাজস্ব নির্ধারণ করে আর কৃষকদের থেকে খাজনা আদায় করে) তখন তারা তাকে (জমিনদারকে) মালিক হওয়ার দরুন (মিলকিয়ৎ) প্রতি একশ বিঘা বা প্রতি একশ মন পিছু ধরে দেয় । অন্যএ বলা হয়েছে, এই ভাগ দেওয়া হত শুধু তখনই, যখন জমিনদারের জমি সীর হয়ে আছে বা মীর করে দেয়া হয়েছে ।

– Dhaka University Institutional Repository

তখন সে নিজেই রাজস্ব দেয়, তখন সে মালিকানা পায় না, পায় শুধু নানকর (কাজের জন্য একটা ভাতা) । সুতরাং মালিকানা দেওয়া হত শুধু তখনই যখন জমিদারকে এড়িয়ে গিয়ে রাষ্ট্রই সরাসরি ভূমিরাজস্ব নির্ধারণ ও সংগ্রহ করত । বাংলাদেশে শেরশাহের আমলে সুষ্ঠু জরিপ এবং ১/৪ অংশ রাজস্ব নির্ধারণ করা হয় । এবং রাষ্ট্র-রায়ত সম্পর্ক সরাসরি ও প্রত্যক্ষ করা হয় । ১

উক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় জমিনদারী একটি বিশেষ ব্যবস্থাপনায় ভূমিরাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা – যাকে মালিকানা বলা হয়েছে এবং যার সাথে অন্য উপায়ে রাজস্ব আদায়ের বিশেষ পার্থক্য আছে । 'নানকর' ব্যবস্থা অনেকটা রাজকর্মচারী হিসেবে নিজের জমির রাজস্ব ভোগ করার মত । ওয়েব্বার যে ব্যবস্থাকে প্রিবেন্ডালাইজেশন হিসেবে উল্লেখ করেপ্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন ২ ।

জমিদার মনে হয় প্রায়ই তাদের আর্থিক দাবী ছাড়াও চাষীদের কাছ থেকে কয়েকটি ছোটখাট উদ্বৃত্ত পাওনাও আদায় করত ।.....এ ছাড়াও জমিনদাররা কখনও কখনও কোন শ্রেনীর লোকদের দিয়ে বেগার খাটিয়ে নিত " । তবে বেগার খাটানো বাধ্যতামূলক ছিল এখন প্রমাণ পাওয়া যায় না । সম্ভবতঃ বেগার খাটানো নিয়মতান্ত্রিক ছিল না – এটি জবরদস্তিমূলক ছিল । ২

১। শেরশাহের আমলে রাষ্ট্রের সঙ্গে রায়তের সম্পর্ক কতটা সোজাসুজি হতে পেরেছিল এই অবশ্য দ্বিমতের অবকাশ আছে । প্রথম জীবনে শেরশাহ তাঁর দেশ সাসারামে জায়গীরদার ছিলেন । জায়গীরদার ও রায়তের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তখন তিনি দেখেছিলেন । তাই রাষ্ট্র ও রায়তের মধ্যে একটা সোজাসুজি যোগাযোগ স্থাপনের অভিলাষ তাঁর মনে হওয়ার কথা । কিন্তু বাংলায় যখন তিনি অধিপতি, তখন এদেশের সুপ্রতিষ্ঠিত বারভূইয়াদের ডিঙিয়ে আমিল কারকুন দিয়ে রাজস্ব শাসন অসম্ভব বলেই মনে হয় । অথচ, প্রজার মঙ্গলের জন্য তার মনোভাব ছিল সুদৃঢ় । তিনি বলেছিলেন,

অ: পৃ: দ্র:

Dhaka University Institutional Repository

"আমি তাদের (প্রজাদের) অবস্থা সর্বদা পর্যবেক্ষণ করবো যেন কেউ তাদের উৎপীড়ন না করে , কারণ, যদি কোনো শাসক নিরীহ কৃষকদের বে-আইনী থেকে রক্ষা করতে না পারে, তাহলে তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় নিতান্তই জুলুমের সামিল ।" তাই পুরোপুরি না হোক, বেশ কিছু জমি জরিপ করিয়ে ফসলের এক-চতুর্থাংশ রাষ্ট্রের ভাগ তিনি ধার্য করতে পেরেছিলেন । অধিকন্তু তিনি এসেই যখন দেখলেন যে, আফগান সেনানায়কদের জায়গীরে রায়ত ও জায়গীরদারের সোজাসুজি সম্পর্কের জায়গায় ইজারাদার নামক মধ্যপদলোভী একদল লোকের দৌরাত্ম্য প্রতাপে প্রজা হিমসিম খায়, তখন তিনি সেই সব জায়গীরের আয়তন কমিয়ে তা খালসা জমির সঙ্গে জুড়ে দিলেন ।.....
শেরশাহের রাজত্বকাল ছিল অল্প দিনের । তাই, সদিচ্ছা তাঁর যাই থাকুক না কেন, বাস্তবে তা তিনি পরিণত করতে পারেন নি । অনেকেই মনে করেন, আকবর বাদশাহের আমলে রাজা টোডরমলের ভূমিব্যবস্থা যা পরবর্তী মুঘল আমলে বহুদিনব্যাপী চালু ছিল তা মূলতঃ শেরশাহের ভূমিব্যবস্থার সকল অনুকরণ । আকবর বাদশাহ প্রতি দশবছর পরপর প্রজামঙ্গলের জন্য নতুন বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন । কিন্তু বাস্তবে টোডরমলের বন্দোবস্তের পর ছিয়াত্তর বছর পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয় নি । শেরশাহের আগের সুলতানী আমলে প্রজামঙ্গলের সাথে ভূমিব্যবস্থার সম্পর্ক ছিল না ।

ভট্টচার্য, নৃপেন্দ্র "বাংলার ভূমি ব্যবস্থা", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৩। পৃঃ ১০-১২

২। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১৬১

Dhaka University Institutional Repository

জমিনদারী দাবীর পরিমাণ এবং অধিকার সুস্পষ্ট ছিল না এবং সব এলাকায় একই প্রকার ছিল না। লুটতরাজের পর্যায়ে না পৌঁছুলে "জমিনদাররা চাষীর উদ্বৃত্ত উৎপন্নের উপর যে ভাগ বসাত, তা এই একই জমির ওপর কর্তৃপক্ষের আদায়কৃত ভূমিরাজস্বের তুলনায় কমই ছিল।" ১ তার ওপর জমিনদারের ভাগ ইচ্ছামত বাড়ানো যেত না। জমিনদার নিয়মতান্ত্রিক ও সনাতন প্রথার মধ্যে বাধা থাকতেন। জমিনদারীর স্বত্ব কেনা বেচারও উদাহরণ আছে। সেখানে দেখা যায় জমিনদারী স্বত্বের দাম মোট ভূমি রাজস্বের চেয়ে কম। যেমন বাংলায় ১৭০৩ সালে ইংরেজরা কয়েকজন জমিনদারের কাছ থেকে ১৩০০ টাকা দিয়ে 'ডহী কলকাত্তা' ও আরও দুটি গ্রাম কিনেছিল। এই গ্রামগুলির জন্য জমা বা বার্ষিক রাজস্বের পরিমান ছিল ১১১৪ টাকা ১৪ আনা। " ২ এই পার্থক্য থেকেই বোঝা যায় জমিনদারী এবং জমির মালিকানার মধ্যে দুরত্ব যতই থাক জমিনদারী অধিকার ছিল এবং তা একটি বিশেষ প্রকৃতির শর্ত নির্ভর ছিল। মূলতঃ জমির উৎপন্ন ফসলের একটি অংশের উপর তার অধিকার ছিল। কিন্তু সে অধিকার অসীম নয় সীমাবদ্ধ। দু'ভাবে এই সীমা নির্ধারিত হত। প্রথমত চলতি প্রথা দিয়ে, দ্বিতীয়ত : বাদশাহী বা সরকারী নিয়ম কানুন দিয়ে। জমিনদাররা হয়ত পোশাকী-ভাবে মালিক বলে পরিচিত ছিল, তার স্বত্বকেও বলা হতো 'মিলকিয়ৎ' কিন্তু উপনিবেশিক যুগে যে ভূমিকর দিত আর ইচ্ছামত উচ্ছেদযোগ্য প্রজাদের কাছ থেকে সুনির্দিষ্টহারে খাজনা আদায় করত, জমিনদারকে তার সমান কল্পনা করার চেয়ে বড় ভুল আর কিছুই হতে পারে না।" ৩

ইরফান হবিব জমিনদারী স্বত্ব এবং ভূমিমালিকানার মধ্যে পার্থক্যটা দৃঢ়ভাবে অনুভব করেছিলেন। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, "জমিনদারী বলতে জমির ওপর কোন স্বত্বাধিকারী বোঝাত না।" ৪

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা। পৃঃ ১৬৪

২। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬২ (লেখ্রী পুঁজির আয় বাদ দিয়ে হিসাব ধরা হয়েছে)

৩। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬৩

৪। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৬৫

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু জমিনদারীর মালিকানা স্বত্বের বিষয়টি তা হলে কোথায় যাবে ? ইরফান হবিব বলেছেন, ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে গণ্য এমন সামগ্রীর যাবতীয় চিহ্ন জমিনদারী ব্যাপারটির (জমিনদারীর আওতায় জমির নয়) গায়ে লেগে ছিল। ওয়ারিশ সূত্রে জমিনদারী পাওয়া যেত এবং ইচ্ছামত বেচাকেনা চলত " । ১ এই যে বৈশিষ্ঠগুলি বর্তমান ছিল তা থেকে মালিকানার স্বত্বের ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয় । মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ নিয়ম হিসেবে বলা হয়েছে জমিনদারী বংশানুক্রমিক কিন্তু এটি প্রাচীন ঐতিহ্যের মধ্যেই আছে । "জমি বিক্রি বা বিবাদ সংক্রান্ত সমসাময়িক নথিপত্রে প্রায়ই দেখা যায় এক বা অন্য দল জমিনদারীর ওপর অধিকার দাবী করছে মৌরসী সূত্র পাওয়ার ভিত্তিতে, যেন মৌরসই তাদের প্রাথমিক অধিকার দেয় । " ২ কিন্তু জমিনদারী নিরঙ্কুশ ভাবে হস্তান্তর যোগ্য ছিল বলে মনে হয় না । বাদশাহী প্রশাসন ইচ্ছা করলে জমিদারী নিয়ে নিতে পারত । তবে মুঘল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে জমিনদারী ও স্থায়িত্ব পেতে থাকে । "জমিনদারী যে বিক্রয় যোগ্য - এই নীতি প্রথম সরাসরি ঘোষনা করা হয়েছে কেবলমাত্র ১৮ শতকের রাজস্ব সংক্রান্ত এক পরিভাষা কোষে । সত্যিকারের বেচাকেনার নথিবদ্ধ নজির পাওয়া যায় আকবরের আমল থেকে । আওরঙ্গজেবের আমলে এ ঘটনা আরও ব্যাপক হয়ে উঠে ।" ৩ এমনকি বেচাকেনার ব্যাপারটি এতই স্বাভাবিক হয়ে ওঠে যে পুরো জমিদারী বিক্রি না করে " অধিকারী জমির এক অংশ রেখে অন্য অংশ বিক্রি করতে পারত ।" ৪ উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যেমন অংশ ভাগ হত, বিক্রির সময়েও অংশ ভাগ বিক্রি করা যেত । জমিনদারী স্বত্বের বিভিন্ন অধিকার থেকে এমন মনে করার কারণ নেই যে, জমিনদারী এক প্রকার মালিকানা । কেননা মালিকানার অন্যান্য প্রধান শর্তগুলি জমিনদারী স্বত্বে ছিল না ।" জমিনদারী স্বত্বের অধিকারীরা সম্পত্তি বলে বিবেচিত

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১৬৫

২। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৬৫

৩। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৬৯

৪ । প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

কোন বস্তুর মতো ধরা ছোয়ার যোগ্য বস্তুর অধিকারী ছিল না । তাদের ছিল সমাজের উৎপাদনের ওপর একটি বাধা ভাগের আইনগত অধিকার । " ১ কিন্তু এই অধিকার ঐতিহাসিক শর্তের এন্মবিকাশের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল । নিছক চাপিয়ে দেয়া নয় ।

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস থেকে দেখা যায় এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর চাষাবাদের অঞ্চল, গবাদিপশু ইত্যাদি দখল করছে । হয়ত বা পুরো গ্রামটিই দখল করছে । এক গোষ্ঠী থেকে অন্য গোষ্ঠীর কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়াতেই কোন এক পর্যায়ে বিজিত গোষ্ঠীর উপর অধিপত্য এবং মধ্যস্বত্ব ভোগের মৌলিক শর্ত থেকেই জমিনদারী স্বত্ব দানা বাধে । মুসলমান শাসকরা এই ধরনের গোষ্ঠীর জমিনদারী মালিকানা নিরবে মেনে নেয়নি । মেনে নেয়নি হিন্দু আমলে অনুদত্ত গ্রাম মালিকানা । কেননা সম্রাটদের মূল আয় আসতো খাজনা থেকে । অনুদত্ত গ্রামের নিস্কর ভূমির খাজনার পরিমাণ চিন্তা করেই সেগুলিকে দখল ও পুনঃ ন্যস্ত (বন্দোবস্ত দেয়া) করা হয়েছিল । গোষ্ঠী মালিকানা এবং হিন্দু সামন্তদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া গ্রাম গুলিতে জমিনদারী স্বত্ব আরোপ করে নির্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে জমিনদার নিয়োগ করা হত । কিন্তু স্থায়ী মালিকানা দেয়া হত না । গ্রামের বাসিন্দাদের উচ্ছেদের নিয়ম মুসলমান শাসকরা করেনি । উচ্ছেদের ক্ষমতা জমিনদারের না থাকার কারণে প্রথাগতভাবে সম্পত্তির মালিকানা তার কাছে আসেনি । জমিদার তার জমিদারী স্বত্ব এবং বলপূর্বক চাপানো উপস্বত্ব ভোগ করেছে ।

জমিদারী ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল সশস্ত্র বাহিনী । এই সশস্ত্র বাহিনীই জমিনদারী স্বত্ব প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণের প্রথম ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত হিসেবে

১। হবিব ইরফান, "মঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

দেখা দেয় । আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে সাম্রাজ্যের জমিনদারদের সৈন্য ছিল চুয়াল্লিশ লক্ষেরও বেশী এবং সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক বাহিনী ছিল'। আইন-ই-আকবরীতে ঘোড়সওয়ার এবং পদাতিক বাহিনীর সংখ্যাও উল্লেখ করা হয়েছে । জমিনদাররা দুর্গও তৈরী করত । এই দুর্গগুলি ছিল জমিনদারদের সশস্ত্রবাহিনীর দৃশ্যমান প্রতীক । এগুলি ছিল তাদের কেল্লা, সৈন্যদের আস্তানা ও ঘাটি । কিন্তু তাদের আসল ক্ষমতা নিহিত ছিল লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র অনুচরের মধ্যে । দিল্লীর সম্রাটের বা অন্য প্রকৃত কর্তৃপক্ষের কাছে সশস্ত্র অনুচরের কোন হিসাব ছিল না । আইন-ই-আকবরী বা অন্য কোথাও ঘোষিত সৈন্যবাহিনীর ছাড়া সশস্ত্র অন্য কোন গোপন বাহিনীর হিসাব পাওয়া যায় না । কিন্তু এই বাহিনীর অস্তিত্ব সম্পর্কে তারা অবহিত ছিলেন । সাধারণতঃ এইসব সশস্ত্র অনুচরেরা বাছাই হয়ে আসত জমিনদারের নিজস্ব কওম থেকে । বাদশাহী প্রশাসনের আওতায় বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ জমিনদারের কওমের সশস্ত্র লোকদের জমিনদারের বিদ্রোহের সহযোগী এবং সশস্ত্র গোপন অনুচর বাহিনী মনে করে নির্বিচারের হত্যা করা হত । এবং এই সব গোপন সামরিক বাহিনী সাধারন চাষী হিসেবে চাষাবাদও করত । অনেক ক্ষেত্রে গ্রামবাসীদেরকে হয়ত বা বাধ্য করা হত যুদ্ধ করতে কিন্তু প্রয়োজনের সময় বাধ্য হয়ে লড়াই করানোর জন্য গ্রামবাসী পাওয়া গেলেও তাদের যুদ্ধ বিদ্যা জানা থাকবে এমন আশা করা যায় না । তাই বাদশাহী প্রশাসন সশস্ত্র চাষীকে যোদ্ধা বা বিদ্রোহী হিসাবে হত্যা করত এটা বিশ্বাস করা যায় । কেননা তারা ধরেই নিত যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেছে যারা তারা আপাতঃ দৃষ্টে চাষী হলেও মুলতঃ গোপন সামরিক বাহিনীর লোক । " বিহারে ফরিদ (পরে শেরশাহ)-এর *এর বাবার জায়গীরে যে সব জমিদার তার কতৃত্ব অগ্রাহ্য করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে ফরিদ-এর অভিযান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে : ঝড়ের বেগে গ্রামে ঢুকে, যত লোক সেখানে ছিল তাদের সবাইকে মেরে, পুরনো বাসিন্দাদের তিনি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলেন,

Dhaka University Institutional Repository

এবং সেই জমিতে নতুন চাষী বসিয়েছিলেন । এর পেছনে নিশ্চয়ই এমন ধারনা কাজ করেছিল যে, পুরনো চাষীরা হয় জমিদারের অনুচর নয়তো নিদেন পক্ষে, যুদ্ধের সময় তাদের হয়ে লড়েছিল " । ১ এই যুদ্ধ অভিযান এবং বিদ্রোহ দমনের পদ্ধতি সে সময় সাধারন রেওয়াজে পরিণত হয়ে ছিল বলে মনে হয় । সেদিক থেকে দেখলে শেরশাহের উল্লেখিত অভিযান স্বাভাবিক ছিল এবং কোন সমসাময়িক ঐতিহাসিক এই জাতীয় অভিযানকে অস্বাভাবিক হিসেবে বর্ণনা করেননি । এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এটি একটি সাধারন ঘটনা এবং এই সশস্ত্র গ্রামবাসী বা সশস্ত্র চাষীবাহিনী জমিদারদের গোপন সশস্ত্র বাহিনীর অংশ । অর্থাৎ জমিদাররা প্রকাশ্যে এবং গোপনে সশস্ত্র বাহিনী সংরক্ষণ করতেন ।

ইরফান হবিব জমিদার শ্রেনীর শ্রেনীঅবস্থানগত বৈশিষ্ট সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, জমিদার শ্রেনী চাষীদের উৎপন্নের উপর ভাগ বসাত - এই অর্থে তারা ছিল শোষক শ্রেনী । জায়গায়-জায়গায় এই ভাগের অংশে হেরফের হলেও সব মিলিয়ে চাষীদের কাছ থেকে ভূমিরাজস্ব এবং অন্যান্য কর-উপকর বাবদ রাষ্ট্রের তরফে যা আদায় করা হতো তার তুলনায় জমিদারের ভাগ ছিল গৌন ।

জমিদারের স্বত্বাধিকার সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেছেন জমির উপর তাদের অধিকার ছিল মৌরসী । গোষ্ঠীর জায়গা বদল বা জমি বিক্রির দরুন জমিনদারী অধিকারে হাত পড়লেও সাধারনত বহুপুরুষের জমির অনেক গভীরে থাকত জমিদারীর শেকড় । ২

মুঘল আমলে জমিনদারী স্বত্বের বিভিন্ন বৈচিত্রময় তথ্য আছে । জমিনদারী স্বত্ব যেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে সেখানে দেখা যায় পুরো জমিনদারীর উপর জমিদারের স্বত্ব নেই । " বাদশাহী অঞ্চলের অধিকাংশ প্রদেশে জমিনদারদের স্বত্ব

১। হবিব ইরফান, " মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১৭৯

২। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

ছিল কেবলমাত্র জমির একটা অংশের উপর । আর ছিল রাইয়ুতী এলাকা । সেখানে চাষীদের সুত্বই ছিল একমাত্র সুত্ব" । ১ রাইয়ুতী এলাকায় প্রশাসনের কাজ-কারবার ছিল সরাসরি চাষীদের সঙ্গে । সমগ্র মুঘল রাজসু প্রশাসন যন্ত্রের ওপরেই তার ছাপ ও পড়েছিল । চাষীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ অর্থ্যাৎ চাষীদের জমির ওপর রাজসু নির্ধারণ ও তাদের কাছ থেকেই রাজসু আদায় সরকারী বিধানে বিশেষ করে তোডরমল, ফতহউল্লাহ সিরাজী, আইন এবং আওরঙ্গজেবের বিধানে (রসিকদাসের উদ্দেশ্যে ফরমান) জমিনদারের উল্লেখ নেই । যদিও ভুমি রাজসু নিধারণ ও আদায়ের গোটা কার্যপ্রণালী সম্পর্কে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া আছে । তাই মনে হয় রাজসু ব্যবস্থার স্বীকৃত কাঠামোয় জমিনদারের কোন স্থান ছিল না'' ২

জমিনদারের ব্যবহারিক দিক একেবারেই ছিল না এমন কথা জোর করে বলা যায় না । জমিনদারকে বিশেষ বিশেষ সময়ে ব্যবহার করা হত । অনাদায়ী রাজস্বের কারণে জমিনদারকে দায়ী করা এবং জবাব দিহির ব্যবস্থা ছিল । এমন অনেক প্রমান পাওয়া যায় যে "জমিনদার যে জমির উপর জমিনদার হিসেবে তার সুত্ব দাবী করত সে জমির রাজসু দাখিল করার জন্য সাধারনতঃ তাকেই ডাকা হয়েছে " ৩ । আবার অনেক ক্ষেত্রে তালুকদার বলে জমিনদারকে বুঝানো হয়েছে । "তালুকদার মানে 'তালুক' এর অধিকারী । " ৪ তালুকদার শব্দের ভিন্নধর্মী অর্থ ছিল । কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে ঐ সময়ে ১৮ শতকের দিকে দুটি বেশ প্রচলিত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল । এক, ইজারাদার, দুই-ক্ষুদে জমিনদার । মুঘল প্রশাসনে বহু ক্ষেত্রেই তালুকদার শব্দটি জমিনদারের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়েছে এমন নজির আছে ।

তালুকদার ও সাধারণ জমিনদারের মধ্যে পার্থক্য আছে । তালুকদার তার আওতাধীন পুরো জমির উপর মালিকানা দাবী করতে পারত না । সে যে জমির

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ পৃঃ ১৮১

২। প্রাগুক্ত ।

৩। প্রাগুক্ত ।

৪। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

খাজনা আদায়ের দায়িত্বে থাকত তার এক অংশের জমিনদার ছিল । অর্থাৎ স্বত্বাধিকারী ছিল । এ ক্ষেত্রে জমিনদার বা তালুকদার রাজকর্মচারী বা কর আদায়কারী -করদাতা ভূস্বত্বাধিকারী নয় । সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়ে জারি করা দুটি ফরমানে এই স্বত্বকে 'খিদমত' বা চাকরীর একটি পদ বলে উল্লেখ করা হয়েছে ।" ১

বিভিন্ন তথ্য প্রমাণে বোঝা যায় এই নিয়মটি কেবল কথার কথা নয় । এর ব্যবহারিক দিকও ছিল । নানকার প্রথা চালু ছিল সে সময়ে । এই নানকাকে ভাতা মনে করা যেতে পারে । সবক্ষেত্রে নানকারের পরিমাণ এক ছিল না । পরিমানে ব্যক্তি বিশেষে পার্থক্য থাকলেও প্রতিক্ষেত্রেই সুনির্দিষ্ট ছিল । ইরফান হবিব উল্লেখ করেছেন " রাজস্ব আদায় ও দাখিল করার " খিদমত" বাবদ জমিনদারদের সত্যই 'নানকর' বলে একটি ভাতা দেওয়া হত - হয় দাখিলী রাজস্বেরই একটা অংশরূপে বা জমিনদারকে দেওয়া লাখেরাজ জমি হিসেবে । " ২

মুঘল আমলে রাজস্ব সংগ্রহ যন্ত্রের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে থাকত " চৌধুরী" । সাধারনতঃ সে নিজেই হত জমিনদার । খিদমতের জন্য যে ভাতা পেত তাকেই বলা হত নানকার । জমিনদারী বলতে রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বও পড়ে বলে ধরা হতো " । ৩ প্রায়ই দেখা যেত যে, জমিনদারী এবং চৌধুরাই শব্দ দুটি একযোগে ব্যবহৃত হয়েছে ।

মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার নিয়ম বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, " ভূমি - রাজস্ব বসানো হতো চাষীদে ওপর, যদিও বা জমিনদার সেই রাজস্ব বাদশাহী কোষাগারে জমা দিত, চাষীই কিন্তু ছিল আসল রাজস্ব দাতা । " ৩

বাংলাদেশের ব্যবস্থাটা ছিল একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ । ভারতের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন প্রকার দেশজ ব্যবস্থার সাথে মুঘল স্বার্থের সমন্বয় করে একটি

১। হবিব ইরফান, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা" , কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা , ১৯৮৫, পৃঃ ১৮৬

২। প্রাগুক্ত ।

৩। প্রাগুক্ত ।

Dhaka University Institutional Repository

'চালু' ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হত। কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য থাকত সবসময়েই ভূমি রাজস্বের শোষণের পরিমাণ সর্বোচ্চ করার দিকে। কাজে কাজেই জমির পরিমাণ এবং জমিতে কর্ষনকারী চাষীর দিকেই তাদের নজর থাকত।

মধ্যস্বত্বভোগীরা মুখ্য হত না কোন সময়েই, মুখ্য হত চাষীরা যারা উৎপাদন করত ফসল এবং রাষ্ট্রের ভাগ দিত সাধারনভাবে অর্ধেক। মুঘল দরবারে জমিনদারদের ভাতা বাদ দিয়ে বাকীটা জমা পড়ত। অর্থ্যাৎ জমিদাররা সম্রাটের অংশই তাদের 'সেবা' কাজের জন্য নিত। এতে করে মোট উপার্জন কমত। তাই সুযোগ পেলেই মুঘল সম্রাটেরা সরাসরি রাজস্ব আদায়ের দিকে (স্হায়ীভাবে ভূমি রাজস্ব আদায়ের দিকে) ঝুকত এবং স্হায়ী ভাবে ভূমিরাজস্ব বাধা তাদের জন্য লাভজনক ছিল। কেননা অজন্মা ইত্যাদি কারণে 'জমা' কম হওয়ার সুযোগ এর ফলে রহিত হত।

বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্হা ছিল অনেকটা এ রকম। এখানকার জমিদাররা এবং প্রজারাও নির্দিষ্ট বাধা অংকে ভূমি রাজস্ব দিত। আইন-ই-আকবরীতে বলা হয়েছে যে, 'বাংলার জমা' ছিল পুরোটাই নগদী।" ১ এই নগদী ব্যবস্হার কারণে বাংলার ভূমি রাজস্ব একটি দিদিষ্ট সময়ের বন্দোবস্ত -তে পরিনত হয়েছিল। এর সাথে ইংরেজ আমলের বন্দোবস্তের কিছুটা তুলনা করা চলে। ইরফান হবিব মনে করেন ইংরেজ আমলের "ভূমি রাজস্ব বন্দোবস্ত তা সে ছির বা দীর্ঘ মেয়াদী যে ধরনেরই হোক-সম্পর্কে ইংরেজরা সে ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ করত তার কিছুটা অন্তত বাংলার (বাস্তব) অবস্হা থেকেই নেওয়া, পুরোপুরি ভিনদেশী নয়" ২। তার এই মন্তব্য থেকে বোঝা যায় ইংরেজ আমলের জমিদার প্রথা বাংলায় মুঘল আমলেও ছিল।

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্হা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫। পৃ। ১৮৭

২। প্রাগুক্ত। পৃঃ ১৯০-৯১

Dhaka University Institutional Repository

জমিনদারী সত্ত্বের আইনগত ভিত্তির প্রমাণও পাওয়া যায় । যদিও নির্বাহী আদেশের কাছে ঐ আইনগত ভিত্তি খুবই দুর্বল ছিল । তবুও জমিনদারী সুত্বকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির 'বস্তু' হিসাবে সম্মান করার জন্য আইনের ব্যবহারের নজির আছে । যেমন 'জমিনদারী অধিকার নিয়ে ঝগড়া হলে তার ফয়সালা হত আইনের আশ্রয়ে, অর্থ্যাৎ কাজীর মারফত বা তার সহায়তায় । এই ভাবে আইনের মাধ্যমে সুত্ব প্রতিষ্ঠা হলে বা অন্যের আইনগতভাবে কোন আপত্তি না তুললে " সেই সুত্ব বলবৎ করত ঐ এলাকার ফৌজদার বা সেনানায়ক ।" ১ এইভাবে আইনের মাধ্যমে এবং আইনের আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত সুত্বের এক ধরনের পবিত্রতা তৈরী হয়েছিল ।

এই পবিত্রতা ও ঐতিহ্যই জমিনদারী সুত্বের সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে । সামাজিকভাবে জমিনদার সমাজে স্বীকৃতি পেলেও রাষ্ট্রীয় নির্বাহী কর্মকাণ্ডে ঐ সুত্বকে মলিকানা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি । ভূমি রাজস্ব আদায় এবং দাখিল করার ন্যায় কার্যএন্মের মত কর্মচারীসুলভ আচরন করতে বাধ্য থাকার কারণে " সরকারী দলিল-পত্রের পোশাকী ভাষায় জমিনদারের সুত্বকে তাই বলা হয়েছে 'খিদমত' ।" ২ এই ধরনের খিদমতগারী সার্বিকভাবে সম্পন্ন না হলে অকর্মন্য জমিদারের পরিবর্তে অপর যে কেউ নিযুক্ত পেত ।

জমিনদারী পরিচালনার জন্য জমিনদারেরা সশস্ত্র বাহিনী বা অনুচর প্রতিপালন করত । এই বাহিনীর সাহায্যে সে রাজদ্রোহী হতে পারত বা রাজদ্রোহ দমনে রাষ্ট্রের পক্ষ নিতে পারত । সামরিক ভাবে সম্রাটকে সাহায্য না করার প্রতিফলে বা রাজদ্রোহের কারণে জমিনদারী হারানোর সম্ভবনা সব সময়েই বজায় থাকত । সাম্রাজ্যের একটা রীতিই এমন গড়ে উঠেছিল যে, " বাদশাহী সরকার খুশীমত জমিনদারী দিতে বা ফিরিয়ে নিতে পারবে ।" ৩ বাদশাহী আদেশে এ রকম রদবদল প্রায়ই হত । এ সময়কার জমিনদারী সুত্বের স্থায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল না এবং মৌরসী হত না ।

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১৯১

২। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৯১

৩। প্রাগুক্ত । পৃঃ ১৯২

Dhaka University Institutional Repository

ইরফান হবিব লক্ষ্য করেছেন যে, সে আমলের "কয়েকটি নথি থেকে আভাস পাওয়া যায় যে, বাদশাহী মঞ্জুরী সর্বদা মৌরসী হত না, কয়েকটি ক্ষেত্রে অন্তত যাবজ্জীবন মঞ্জুরীও দেওয়া হয়নি, কেননা সেগুলিতে জাগীরের মতো একই শর্তে জমিনদারী বদলের কথা আছে।" ১

জমিনদারী বদলের জন্য সবক্ষেত্রে একই নিয়ম ছিল না। এ ক্ষেত্রেও সুনির্দিষ্ট কোন আইন কার্যকরী ছল না। প্রথা প্রচলিত রীতিনীতি সর্বোপরি কায়েমী স্বার্থই ছিল প্রয়োগকৃত নির্ধারিত নীতির মূলভিত্তি। বাদশাহ যেমন যোগ্য নির্বাচন করতেন জমিনদারের উত্তরাধিকারীদের মধ্য থেকে তেমনি আবার কর্মচারীদের মধ্যে থেকেও যোগ্যলোক নির্বাচন করা হত। অনেক ক্ষেত্রে, স্থানীয় যে কেউ নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে জমিনদারী স্বত্ব বদল করে নিজের আয়ত্বে আনতে পারত। এভাবে স্বত্ব বদল হলেও বাদশাহী প্রশাসনের অধিকার কোন সময়েই কমত বলে মনে হয়ন না। ইরফান হবিব বলেছেন, "সাধারনতঃ জমিনদারী মঞ্জুরীয় অধিকারী ছিলেন বাদশাহী প্রশাসনেরই একযক্ষ। কিন্তু সম্ভবত পরের শতকে জমিনদার হতে হলে প্রথমে ক্ষমতা অর্জন করতে হত, পরে দরবারকে নিয়ে তার স্বীকৃতি করিয়ে নিতে হত। জমিনদার বহাল ও বরখাস্তের বাদশাহী ক্ষমতা যদিও সাধারনতঃ প্রয়োগ করা হত না, তবুও জমিনদারদের তাঁকে রাখার এই ছিল একটা বড় অস্ত্র" ২।

এই অস্ত্র প্রয়োগ করে মুঘল প্রশাসন দুই ধরনের সুবিধা পেত। যারা পরাএমশালী হয়ে উঠত তাদের চূড়ান্ত সামরিক অভিযান শুরু করার আগেই বরখাস্ত করে সম্ভাব্য বিদ্রোহের মুলোৎপাটন করা যেত। দ্বিতীয়তঃ সারা সাম্রাজ্য জুড়ে জমিদারদের মধ্যে সরকারের প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত তাবেদার জমিদার এবং সম্ভাব্য জমিদারী লোভী ধনীক শ্রেনীর তাবেদার বাহিনী থাকত-প্রকারান্তরে তারাই সম্রাটের সাম্রাজ্য রক্ষায় ব্যবহারযোগ্য বিশাল সামরিক বাহিনী। কোথাও কোথাও এই অস্ত্র

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫। পৃঃ ১৯৩

২। প্রাগুক্ত -।

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োগ করা হত জমিনদারী কওমের একচেটিয়া বা একাধিপত্য খতম করার জন্য। ইরফান হবিব উল্লেখ করেছেন যে, জমিনদারী ছিনিয়ে নিয়ে নূতন প্রাপক খুঁজে নেয়ার ক্ষেত্রে "কখনও কখনও মনে হয়, প্রাপকদের এমনভাবে বেছে নেওয়া হতো যাতে অঞ্চল বিশেষে জমিনদারীর 'কওম' গত একচেটিয়া অধিকার ভাঙা যায়।" ১ যেমন হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় মুসলিমদের বড় জমিদারী বা বাইসওয়ারায় বাইস রাজপুতদের এলাকার ভেতরেই স্থানীয় মুসলিমদের বড় জমিদারী। ২

মুঘল আমলের জমিদারী ব্যবস্থার যে রূপ খুজে পাওয়া যায় তা থেকে স্পষ্টই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে জমিনদারী স্বত্ব কোন স্থায়ী মালিকানা স্বত্বে পরিণত হতে পারেনি।

মালিকানা স্বত্বের সামাজিক মূল্য ব্যবহারিক প্রভাবকে কাজে লাগানো হতো সাম্রাজ্যের আয় বৃদ্ধি ও আদায় নিশ্চিত করার জন্য। তথাকথিত আইন গত কাঠামোতে জমিনদারী মঞ্জুরী দেয়া হতো আবার ছিনিয়ে নেয়া হতো। আইন ছিল অধিক মুনাফার জন্য এবং বশ্যতা নিশ্চিত করার জন্য। জমিনদারী আইন জমিনদারের কিংবা প্রজার স্বার্থের স্বপক্ষে ছিল না। ছিল সম্রাটের এবং স্বৈরতন্ত্রের স্বার্থের স্বপক্ষে। এই ধরনের আইন ভিত্তির উপর যে স্বল্পস্থায়ী জমিনদারী মধ্যস্বত্ব বা উপস্বত্ব ভোগের ব্যবস্থাধীনে জমিদার শ্রেণী গড়ে উঠেছিল তারা অবৈধ শোষণের মাধ্যমে ধনীক শ্রেণীতে পরিণত হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। এবং অনেক ক্ষেত্রে সফলকাম হয়েছে বলা যায়। কিন্তু জমিনদার, ইউরোপে যেমন হয়েছিল সেরকম মালিক হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে সম্রাটের একচ্ছত্র অধিপত্য বজায় থেকেছে, প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র অটুট থেকেছে। অনাদীকালপ্রবাহের মত। গোটা রাষ্ট্রীয় সমাজটাই স্থবির অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে।

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫। পৃঃ ১১৪।

২। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পরবর্তী অধ্যায়ে মুসলিম আমলে যে কেন্দ্রীয় সৈরতন্ত্র প্রবল হয়ে উঠেছিল তার বিভিন্ন আঙ্গিক ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক বিষয়ে আলোচনা করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

(ক) এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যক্তিমালিকানা :

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্বন্ধে মার্কসের চিন্তা তার মৃত্যুর পরে বিতর্কিত বিষয় হিসাবে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৩১ সালের মার্কসবাদী মহলে এই বিতর্ক বন্ধ করার জন্য ১৯৩১ সালে লেলিনগ্রাদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সমাজ বিকাশের যে ঐতিহাসিক সাধারণ ধারার কথা বলা হয়েছে - যা'তে আদি কৌম সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ত সমাজ ও বুর্জোয়া সমাজের বিবর্তন ধারার সুনির্দিষ্ট পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে তাকেই গুরুত্ব দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। ঐ সম্মেলনের পর পরই সোভিয়েত সমাজতাত্ত্বিক ও ইতিহাসবিদদের ভিন্ন মতের প্রচার-প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় (রাষ্ট্রীয়ভাবে)।

১৯৬৪ সালে উক্ত বিতর্কের পুনরুত্থান ঘটে। ১৯৩১ সালের পূর্বে যারা বিতর্কে অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে এঙ্গেলস স্বয়ং গুরুত্ব পূর্ণ নির্দেশকের ভূমিকা পালন করেছিলেন। পরে লেনিন, প্লেখানভ, ভার্সা, উইটফোগেল, রিয়াজানভ, সাদিয়ার, কোকিন, পাপিয়ান, ডালিন, কান্তোরোভিচ, পল রুফ্ প্রমুখ বিদগ্ধ মনিষীরা বিভিন্নভাবে তাদের মতামত প্রকাশের মাধ্যমে অপ্রত্যক্ষ বিতর্কে অংশ গ্রহন করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, পূর্বোক্ত ব্যক্তিরা প্রায় সবাই এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার অস্তিত্ব, ধারা ও প্রকৃতি সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন।

১৯৬৪ সালের পরে যারা বিতর্কে অংশ নিয়ে ছিলেন তারা হলেন ভার্সা, ভাসিলেভ, সেদভ, কাচানভস্কি, সটচেভস্কি, গরডী, গডেলিয়ার, সুরেট ক্যানেলা, টোকাই, হবসবম ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। এদের বিতর্কের ফলাফল সামগ্রিক বিচারে মার্কসের বক্তব্য ও মতের স্বপক্ষে গিয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার বিরুদ্ধবাদীরা দাবী করেন যে, কার্ল মার্কস যেসব পরোক্ষ ও কেরাবী তথ্যের (মাধ্যমিক উৎস) উপর ভিত্তি করে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে নিশ্চিত বক্তব্য রেখেছেন সেই সব তথ্য বিজ্ঞানমনস্ক উপায়ে সংগৃহীত ও উপস্থাপিত হয়নি বরং ব্যক্তিক মননদুষ্টতায় পংকিল । আধুনিক কালে ভারত ইতিহাসতত্ত্ববিদরা এবং প্রাচ্যবিশারদরা প্রায়ই উপরোক্ত মন্তব্য করেন । যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইতিহাস বেত্তারা মনে করেন যে, "প্রাচীন ভারতে কোন ব্যক্তি বিশেষ ভু-সম্পত্তির অধিকারী হতে পারত না, ভিওডোরাসের এই উক্তি (যা সম্ভবত মেগাস্থেনিসের বিবরনী থেকে সংগৃহীত) স্থানীয় আকর সূত্রগুলির সঙ্গে খাপ খাচ্ছেনা এবং ঐসময়কার বাস্তব পরিস্থিতিরও প্রতিফলন মেলে না এ থেকে ।" ১
এখানে স্থানীয় বলতে ভারতীয় এবং আকর গ্রন্থ বলতে মনুসংহিতা, নারদস্মৃতি বৃহস্পতিস্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থের কথা বলা হয়েছে । উক্ত স্মৃতি গ্রন্থ গুলিতে গ্রাম্য সমাজের সদস্যদের ভূমিতে সুস্পষ্ট মালিকানার কথা উল্লেখ আছে । ভূমিতে ব্যক্তি-মালিকানা সত্ত্ব সম্পর্কে ভারতীয় ইতিহাসবেত্তরা বিভিন্ন মতামত রেখেছেন । তাদের অনেকের মতে প্রাচীন যুগে ভূমিতে কৃষকদের মালিকানা বলবৎ ছিল এবং সামাজিকভাবে রাজাকে প্রজার প্রতিপালক মনে করা হতো । যেমন বলা যায় "বহু বংশে উল্লেখ আছে যে রাজা পৃথিবীকে রক্ষা করেন বলে খনিগুলিকে বেতন হিসেবে পান " ২

জমিতে ব্যক্তিমালিকানার অস্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে করাসাল মন্তব্য করেছেন যে,

".... the private ownership of the land was an established institution among the Indo-Aryans is the oldest times to which their history can be traced" 3

১। আন্নোনভা, কোকা বোনগার্দ-লেভিন, গ্রিগোরি, ও কতোভাস্কি, গ্রিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ । পৃঃ ১১৯

২। শর্মা, রামশরণ, "ভারতে সামন্ততন্ত্র", কেপি বাগচি এন্ড কোম্পানী, কলকাতা ১৯৭৭ । পৃঃ ২

3. Karim, A.K. Nazmul, "Changing Society in India and Pakistan", Oxford University Press, Pakistan, 1956. P-26

Dhaka University Institutional Repository

অনেকেই প্রাচীন ব্যক্তিমালিকানার আদি সূত্রের সন্ধান করতে গিয়ে প্রাচীন ঋগ্বেদের মতামতের উল্লেখ করেন। ঋগ্বেদে বিভিন্ন উক্তিতে ব্যক্তিমালিকানাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে এবং যুক্ত দিয়ে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উক্ত আকর গ্রন্থে বলা হয়েছে যে,

"..... the arable land was held in individual or in family ownership, while communal ownership was probably confined only to grass-lands lying on the boundaries of the fields" 1

অনেক ইতিহাসবিদই আকর গ্রন্থগুলির মতামতের ও বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে কৃষকদের ব্যক্তিমালিকানা ও গ্রামগোষ্ঠীর যৌথ মালিকানাকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। ও প্রসংগে রাধাকমল মুখার্জী বলেন,

".... extent of the communal control and ownership of land probably applied to what was no man's land, the grass land which served to separate one plot from another and was used as village common for purposes of pasture for cattle. " 2

জমিতে ব্যক্তিমালিকানা ও গোষ্ঠীর মালিকানার চরিত্র নিয়ে বিতর্কমূলক বক্তব্যের সার সংকলন করলে বলা যায় যে, যে সব ইতিহাসবিদরা ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেন তারাও তাদের বক্তব্যে খুব দৃঢ় মনোভাব দেখান না। তাছাড়া যারা গ্রামগোষ্ঠীগুলির যৌথ মালিকানার কথা বলেন তারা যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিমালিকানার দাবীদাররাও অনেক সময় গোষ্ঠী মালিকানাকে

---

1. Karim, A K Nazmul "Changing society in India and Pakistan", Oxford University Press, Pakistan, 1956. P-26
2. I bid. P-27.

Dhaka University Institutional Repository

সমর্থন করেন পরোক্ষভাবে । কেননা স্যার মেইনের সিদ্ধান্তঃ 'গ্রাম গোষ্ঠীর সদস্যরা সম্মিলিত ভাবে প্রয়োজন বোধে ঐতিহ্যগতভাবে তাদের আওতাধীন জমিজমার পুর্নবন্টন করে থাকে' - সর্বাংশে উপেক্ষা করার মত তথ্য প্রমাণ খুব কমই আছে । যা হোক ব্যক্তি মালিকানা বা গোষ্ঠী মালিকানা সম্পর্কে বিভিন্ন মতের তুলনামূলক পর্যালোচনা করে নাজমুল করিম মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় ব্যক্তি মালিকানার ধারণা এদেশের সমাজে যথাযথ প্রয়োগ করা চলেনা । তার মতে ,

".....the village community had the right of re-distribution of the village lands and this very fact implies that the private property that existed in the Indian villages should be understood in a restricted sense. " 1

নাজমুল করিমের মন্তব্য থেকে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না । কেননা আকর গ্রন্থগুলিতে যথেষ্ঠ প্রমাণ আছে যে গ্রাম ছেড়ে যাওয়া কোন পরিবারের সদস্য কয়েক পুরুষ পরে গ্রামে ফিরে এসে তাদের পূর্বপুরুষদের ভিটা ও আবাদী জমি দাবী করতো পারত এবং গ্রামগোষ্ঠী তাদের দাবী (ঐতিহ্যগতভাবে) পূরণ করত (যেন এ সম্পত্তির মালিক তারাই) । এশীয় স্বৈরাচার ও গ্রামগোষ্ঠী মালিকানা খুবই ঘনিষ্ট ভাবে সম্পর্কিত এবং অনেকেই মনে করেন স্বৈরশাসকই মূল মালিকানার ভোগদখলকারী, গোষ্ঠীমালিকানা (সেই অর্থে) প্রকৃত মালিকানা নয় । বিষয়টি বিষদ আলোচনার প্রয়োজন বিধায় পরবর্তী অনুচ্ছেদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে গোষ্ঠীমালিকানার সম্পর্ক এবং স্বৈরাচারী মালিকানার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

---

1. Karim, A K Nazmul, "Changing Society in India and Pakistan", Oxford University Press, Pakistan, 1956. P-28

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

(ক) গ্রামগোষ্ঠী মালিকানা ও সামন্তীয় মালিকানা এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার স্বৈরাচারী রূপ প্রাচ্য স্বৈরাচার :

মার্কসীয় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বক্তব্যের মুল শর্ত হল গ্রামগোষ্ঠী মালিকানা। কার্ল মার্কস তার Grundrisse গ্রন্থে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার নির্ধারক শর্ত ও তার অনুসঙ্গী সম্পর্কে সুপ্রাবন্ধ মতামত প্রকাশ করে বলেন যে, সমগ্র প্রাচ্য সভ্যতার স্বৈরতান্ত্রিক ভিত্তি ও বিকাশ উপজাতিক বা গোষ্ঠীমালিকানা ভিত্তিক সম্পত্তি।

প্রাচ্য বিশারদ টোকাই মন্তব্য করেছেন, উপজাতিক বা সাম্প্রদায়িক মালিকানাই হল প্রাচ্য স্বৈরাচারের ভিত্তি। গ্রামগোষ্ঠীমালিকানা যে অনেকক্ষেত্রে উপজাতিক মালিকানার ধরনের মত ছিলো তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। মার্কস যেমন এশীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে গোষ্ঠীমালিকানাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তেমন-ই ঠিক তার বিপরীতভাবে ভারতীয় ইতিহাসবিদরাও মনে করেন যে, প্রাচীনকালে ভূমি মালিকানায় ব্যক্তি প্রাধান্য বা গোষ্ঠী প্রাধান্য যাই থাক না কেন স্বৈরশাসক বা রাজা কখনই ভূমির মালিক ছিলো না। কিন্তু বিপরীতমতের (স্বৈরমালিকানাপন্থী) অনুসারীরা ভিন্ন মত পোষণ করেন। স্বৈরমালিকানা সম্পর্কে ইউরোপীয় পর্যবেক্ষক ও চিন্তাবিদরা প্রায় সবক্ষেত্রেই একমত যে স্বৈরশাসকই তার অধিনস্ত সকল ভূমির একমাত্র মালিক যেমন Sir Thomas Roe (যিনি ১৬১৫ সালে মুঘল রাজদরবারে ছিলেন) মনে করতেন যে, মুঘল শাসকের অধীনে সকল ভূমির একমাত্র মালিক সম্রাট নিজেই। শুধু ভূমিই নয় সমস্ত সম্পদের (ব্যবসায়িক বা শিল্পসৃষ্ট) মালিকও তিনি। এমনকি আইনও তার কেননা, মুঘল সম্রাটেরা রাজ্যের প্রজাবৃন্দেরও যেন মালিক। তিনি স্বৈরশাসকদের স্বৈরাচার সম্পর্কে বেশ খোলামেলাই বলেছেন যে, (মনে হয় তার খুবই অপছন্দ হয়েছে)

Dhaka University Institutional Repository

"..... Laws these people have none; the kings judgment binds." "In revenue he doubtless exceeds either the Turk, or Persian, or any eastern prince, the sums I dare not name; but the reason. All the land is his, no man has a foot." "The Mugal is hair to all that die, as well those that gained it by industry, as merchants & c. as those that live by him." 1

মুঘল সম্রাটদের স্বৈরাচারিতা এশিয়ার অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশী বলে মনে করেছেন জনাব টমাস রো। কিন্তু পারস্যে এমনতর উদাহরণ পাওয়া যায়। সে উদাহরণ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, এশীয়ায় মুঘলাই স্বৈরাচার অভিনব কিছু নয়। এই জাতীয় অভিজ্ঞতা পাশাপাশি অন্য জাতিসত্ত্বারও আছে। যেমন Adam Olearius পারস্য সম্পর্কে ১৬৩০ সালের দিকে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তার পর্যবেক্ষণে একই রকম স্বৈরাচারী আকার প্রকার ধরা পড়েছিল। তিনি বলেছেন যে, স্বৈরাচারী সরকার (পারস্যে)

....derived the power over property and persons from the obsolute power of the sovereignty and not the other way round...."

ঠিক একইরূপ পর্যবেক্ষণ করেছেন Jean Tavernier -2 তিনি বরং বলা চলে

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-24
2. Ibid. P-23.

Dhaka University Institutional Repository

কিছুটা তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন । কেননা ঐ সময়েই তিনি তুরস্ক, পারস্য এবং ভারত ভ্রমন করেছিলেন । তিনি পারস্যের এবং ভারতের আর্থ-রাজনীতিক অবস্থার তুলনামূলক পর্যবেক্ষণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । তার মতে ভারতের মুঘল সম্রাটদের চেয়েও পারস্যের সম্রাটেরা অধিকতর স্বৈরাচারী ছিল । হয়ত মার্কসের মন্তব্য..... 'হিন্দুভূত' হয়ে যাওয়ার কারণে বিশেষ সুবিধা করতে পারে নি । ভারতীয় সনাতনী ভূমি ও জীবন ব্যবস্থাকে কিছুটা ছাড় দিতে বাধ্য হয়েছিল ।) তিনি সুস্পষ্টভাবে তার নিম্নরূপ মত ব্যক্ত করেছেন :

> "The Government of Persia is purely despotic, and the king has the right of life and death over all his subjects ..... There is no sovereign in the World more absolute than the king of Persia. 1

পারস্যের স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে টার্ভেনীয়ার এর মতের অনেক সমর্থন পাওয়া যায় । কিন্তু Bernier - এর মুঘল স্বৈরশাসকের সার্বিক একচ্ছত্র মালিকানা সম্পর্কিত মতের সপক্ষে ভূরি ভূরি সমর্থন পাওয়া যায় না । এমন কি টাভেনীয়ার ও বার্নিয়েরের মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় স্বৈরশাসকের সম্পর্কে প্রথমোক্তের মালিকানা সম্পর্কিত মতামতের সাথে ভারতীয় আকর গ্রন্থগুলির সঙ্গে অনেকাংশে মিলে যায় । যেমন মুঘল সম্রাটের সম্পর্কে তার যে মতামত বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে খাজনারূপে সাম্রাজ্যের সকল সম্পদের ভোগদখল তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও যেন ব্যক্তিমালিকানা সম্পূর্ণরূপে তার নেই । তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন

> "The Mugal Emperor was, ... the absolute lord of all the lands; he was not their owner, but their master : maitre absolu ; he was landlord, not landowner, accordingly receiving income from them in his public, not in his private capacity. " 2

---

1. KRADER LAWRENCE , "The asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-25

2. Ibid. P-27

Dhaka University Institutional Repository

তিনি যে সুক্ষ্ম ভাবে সম্পত্তির মালিকানা ও উপসত্বভোগের অধিকার ও ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য সনাক্ত করেছিলেন তা সত্যিই প্রভূত সমাজতাত্ত্বিক গুরুত্ব প্রাপ্তির দাবী রাখে। বার্নিয়ের এই পার্থক্য (সম্ভবতঃ) ধরতে পারেন নি।

টাভের্নিয়ার মালিকানার সামন্তরূপের অনুপস্থিতিও দেখেছিলেন। তিনি প্রতীচ্যের মতো প্রাচ্য বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যে সামন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় মালিক দেখেননি। বরঞ্চ তিনি সাম্রাজ্যের পক্ষে করসংগ্রাহক (উদ্বৃও উৎপাদন সংগ্রাহক কর্মচারী) হিসেবে সম্ভ্রান্তবংশীয়দের প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মুঘল সম্রাটেরা প্রাচ্যের সকল সম্রাটের তুলনায় ধনী হওয়া সত্ত্বেও সামন্তদের বিত্তশালী হওয়া, সম্পত্তি সম্পদের মালিক হওয়াকে পছন্দ করত না। এদিক দিয়ে তাদের সাথে পারস্য সম্রাটদের তুলনা চলে।

টাভের্নিয়ার পারস্য সম্রাটকে সর্বোচ্চ স্বৈরাচারী এবং সম্পত্তির প্রকৃত মালিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি সম্ভ্রান্তবংশীয় বা অন্যকোন প্রকার সামন্তমালিকানা (পারস্যের ক্ষেত্রে) দেখেননি। (Jean Chardin অবশ্য তার সাথে একমত নন। তিনি পারস্যে সাম্রাজ্যের মালিকানা ছাড়াও গর্ভণরদের উপসত্ব ভোগী মালিকানা দেখছিলেন।) মুঘলদের সম্পর্কে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সবসময়েই পারস্যের স্বৈরতন্ত্রকে তুলনায় রেখে ছিলেন। পারস্য ও ভারতের সম্পত্তির মালিকানা এবং সত্ত্ব-উপসত্ত্ব ভোগের তুলনামূলক আলোচনা কালে তিনি বলেছেন :

> ".....The great Mogul is certainly the most powerful and most powerful and the richest monarch in Asia; all the Kingdoms which he possesses are his domain, he being absolute master of all the country of which he receives the whole revenue. In the terretories of the

Dhaka University Institutional Repository

> Prince the nobles are but Royal Receivers, who render account of the revenues to the Governors of Provinces and they to the Treasurers General and the Ministers of Finance 1

স্বৈরতান্ত্রিক সরকারের বিভিন্ন প্রকারভেদের কথা মন্টেস্কু উল্লেখ করেছিলেন এবং সুস্পষ্টই বিভাজন করেছিলেন। তিনি মনে করতেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক রূপ হচ্ছে সাম্রাজ্যের সকল সম্পত্তির মালিকানা সার্বভৌমের একার। সার্বভৌম একাই তার সাম্রাজ্যের সকল সম্পত্তির মালিকানা প্রাপ্ত হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের স্বৈরশাসনের রূপ পাওয়া যায়। তিনি মন্তব্য করেন,

> "... the sovereign was the sole proprietor of all the lands in his realm, the worst despotism of all,.."2

Krader এর মতে তিনি এই ক্ষেত্রে বার্নিয়ারের মতানুসারী।

সকল ভূ-সম্পত্তির মালিকানার প্রসঙ্গে কর ও খাজনার সম্পর্কটিও বিচারে আসে। Adam Smith এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তিনি অন্যান্য বহু বিষয়েই ধ্রুপদী লেখকদের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেও খাজনা ও করের পারস্পরিক সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে মূল্য দিয়ে সম্পত্তির রাজকীয় মালিকানাকে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন যে ইউরোপে যেমন ভূমি কর ও ভূমি খাজনা আলাদা, তেমনটি প্রাচ্যে নেই।

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-26
2. Ibid. P-31

Dhaka University Institutional Repository

".... The absence of the distinction between land - tax and land rent in Asia was important as its presence in Europe ". 1

তিনি এই দুইয়ের একীভূতির একটু ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যাও দিয়েছেন । অনেকটা সনাক্তকরণের সমস্যা মুক্ত হওয়ার জন্যই তিনি বিশ্লেষণ করে বলেছেন,

"Oriental sovereign collected rent on his land in his private capacity, tax in his public " 2

ব্যক্তিগত সম্পত্তির আয় ও রাষ্ট্রীয় সম্পদের আয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যয়ের খাত ছিল এমন প্রমাণও পাওয়া যায় যেমন Wittfogel রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের খাতে জলসেচ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিয়ে 'Hydraulic Society' নামে প্রাচ্যের সমাজকে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন । কার্ল মার্কসও জলসেচ ব্যবস্থার সাথে কেন্দ্রীয় স্বৈরতন্ত্রের সম্পর্ক এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনাকৌশলের গুরুত্ব দিয়ে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্রকে সনাক্ত করাকেই সবচেয়ে আর্থ সামাজিক ভাবে যুক্তি যুক্ত মনে করেছেন ।

K.A.Wittfogel এর মতে প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র ইউরোপের ও প্রাচীন কালের স্বৈরতন্ত্র থেকে ভিন্ন ছিল । কেননা এখানে জলসেচ সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল । যার উদাহরণ প্রাচীন সমাজে বা ইউরোপে নেই । এটি এক ধরনের বিশেষ সমাজ ব্যবস্থা এবং আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক ইত্যাদি মৌলিক সমাজ কাঠামোগত উপাদান পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত সৃষ্টি করে স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট নিয়ে দাঁড়াতে পেরেছিল । যা অন্য স্বৈরতন্ত্রে দেখা যায় না । সংক্ষেপে বলতে গেলে

---

1. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production",Van Gorcum Corp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-39 (Taxes are not paid to a private person; they are paid to the state. Rent on the otherhand, if on land, is paid to a landlord, who may be a private person or the state. .....the latter stands in a direct relation to the sovereignty the fermer in a indirect relation). Ibid.

2. Ibid. P-40.

Dhaka University Institutional Repository

"A Hydraulic society based on extensive systems of water works, evolved a widespread bureaueratic network that directed the organigation and planning of corv'ee (foreed labor) for irrigation projects..... this brought forth an absolutist managerial s ate " 1

Willfogel-এর এশীয় সমাজ যদিও জলসেচ ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়েছিল তবুও জবরদস্তি শ্রম শোষণের সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় মঙ্গলের বিষয়টিও এসে যায়। যেমন মার্কস মনে করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাধীনে না হলে এত বড় ধরনের জলসেচ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারত না এবং প্রাচ্যে কৃষি সভ্যতা ধ্বংস হতো। প্রাচ্যের বৃহৎ বৃহৎ মরুভূমি এবং বিরান জনমানবশূন্য এলাকা এর বড় প্রমাণ। এবং এই দেশব্যাপী ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবস্থাপক শ্রেণী তৈরী করেছিল তারা। সমাজে এই ব্যবস্থাপক শ্রেনী স্থায়ী সুবিধাভোগী আসন করে নিয়েছিল। এবং কালক্রমে রাষ্ট্র অধিকাঠামো থেকে বলভিত্তিতে স্থান করে নিয়েছিল। উইটফোগেলের ব্যাখ্যা Krader মেটিকে মৌলিক ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করে তার (উইটফোগেলের) অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। সেটি নিম্নরূপ :-

"Thus, the managerial and semi-managerial categories enter directly into the economic relations of the society in the Orient; hence in the Orient, the state is not a part of the superstructure, but a part of the economic basis of the Society. According to wittfogel's this is the agencies of the state play a direct part in production by the control of the water supply, or the hydraulic function in Oriental Society". 2

---

1. STAMMER, OTTO, "Dictatorship" in International Fncyclopedia of the Social Scienees, ed., David, L sills, The Macmillan company & The Free Press, New York, 1972 Vol. 3, P-164
2. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production "Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975. P-115.

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্যে স্বৈরতন্ত্র ও ভূমিমালিকানার সম্পর্কে ব্যাখ্যায় জলসেচ সমাজ একটি নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে বটে; কিন্তু সমগ্রকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কেননা ব্যবস্থাপক শ্রেণী সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার অংশ, বিশেষ ভূমিকা পালনকারী অংশ হতে পারে না। বিশেষ করে মুঘল সাম্রাজ্যে। কেননা কোন স্থায়ী ব্যবস্থাপক শ্রেণী কিংবা করসংগ্রাহক শ্রেণী গড়ে উঠেনি। নিত্য পরিবর্তনশীল ব্যবস্থায় সামাজিক উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে পারাটা প্রায় অসম্ভব। যেমনটি প্রাচীন মিশরে নীলনদের অববাহিকায় গড়ে উঠেছিল। এখানে তেমনটি গড়ে উঠেনি। বরঞ্চ গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় একটি বিশেষ ব্যবস্থাপক ও কারিগর শ্রেণী গড়ে উঠেছিল এবং তারা সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় বিশেষ ভূমিকা পালন করত।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য স্বৈরাচার ঃ - খ

জমিতে ব্যক্তিমালিকানা বা গোষ্ঠীমালিকানার চরিত্র নিয়ে বিতর্কমূলক বক্তব্যের সার সংকলন করলে বলা যায়, যে সব সমাজ ইতিহাসবিদরা ব্যক্তিমালিকানার কথা বলেন তারাও তাদের বক্তব্যে খুব দৃঢ় মনোভাব দেখান না। তাছাড়া যারা গ্রাম গোষ্ঠীগুলির যৌথ মালিকানার কথা বলেন তারা যথেষ্ট তথ্য প্রমাণাদি দিয়ে দৃঢ় মতামত ব্যক্ত করেন। ব্যক্তিমালিকানার দাবীদাররাও অনেক সময় গোষ্ঠীমালিকানাকে সমর্থন করেন পরোক্ষভাবে। কেননা স্যার হেনরী মেইনের মতামত - গ্রামগোষ্ঠীর সদস্যরা সম্মিলিতভাবে প্রয়োজনবোধে ঐতিহাগতভাবে তাদের আওতাধীন জমি জমার পুনর্বন্টন করে থাকে সর্বাংশে উপেক্ষা করার মত তথ্য প্রমাণ খুবই কম আছে। যা হোক ব্যক্তিমালিকানা ও গোষ্ঠীমালিকানা সম্পর্কে বিভিন্ন মতের তুলনামূলক পর্য্যালোচনা করে নাজমুল করিম মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় ব্যক্তিমালিকানার ধারনা এদেশের প্রাচীন সমাজে যথাযথ প্রয়োগ করা চলে না। তার মতে,

> "...the village community had the right to re-distribution of the village land and this very fact implies that the private property that existed in the Indian villages should be understood in a restricted sense " 1

মার্কসীয় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কিত বক্তব্যের মূল শর্ত গ্রামগোষ্ঠী-মালিকানা। কার্ল মার্কস তার Grundrisse গ্রন্থে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার নির্ধারক শর্ত ও তার অনুসংগ সম্পর্কে সুএবদ্ধ মতামত প্রকাশ করে বলেন যে, সমগ্র

---

1. KARIM A.K. NAZMUL, "Changing society in India and Pakistan", Oxford University Press. Pakistan, 1956. P-28

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য সভ্যতার স্বৈরতান্ত্রিক ভিত্তি ও বিকাশ উপজাতিক বা গোষ্ঠীমালিকানা ভিত্তিক সম্পত্তি ।

Tokei এর ভাষায়, "..... the entire antochthonous development of the civilizations of the "Oriental despotism" type is based on the "tribal or communal" ownership of land.."1

গ্রামগোষ্ঠীমালিকানা যে অনেক ক্ষেত্রে উপজাতিক মালিকানার ধরনের ছিলো তার বহু প্রমাণ পাওয়া যায় । মার্কস যেমন এশীয় স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি হিসেবে গোষ্ঠী-মালিকানাকে গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন তেমনি ভারতীয় ইতিহাসবিদরাও মনে করেন যে, প্রাচীন ভূমি মালিকানায় ব্যক্তি প্রাধান্য বা গোষ্ঠী প্রাধান্য যাই থাক না কেন স্বৈরশাসক বা রাজা কখনই ভূমিক মালিক ছিলো না ।, স্মৃতি গ্রন্থ গুলির ও কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে ভারতীয় ইতিহাসবেত্তারা যে সব মতামত রেখেছেন তার সার সংকলন করে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে, তারা সবাই প্রাচীন ভারতে জনসাধারন মূলত জমির উপর ব্যক্তিমালিকানা ভোগ করত । তাদের বক্তব্যের সপক্ষে ঋগ্বেদেরও অথর্ববেদের মতামতের উল্লেখ করে বলা যায় যে,

> " গোড়ার যুগের বৈদিক ভাষ্য অনুযায়ী, প্রথম প্রথম জনমন্ডলীর দ্বারা রাজা নির্বাচিত হতেন এবং এ-উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই এক বিশেষ সমাবেশে সমাবেত হতো জনসাধারন । ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে রাজা-নির্বাচন সম্মন্ধে কয়েকটি সুক্তও লিপিবদ্ধ আছে । অথর্বেদের এই ধরনের একটি সুক্তের একটি পংক্তি হল নিম্নরূপ ঃ
> 'বিশ - নির্বাচিত ভূমি শাসনের তরে' । এখানে এবং ঋগ্বেদেরও অনুরূপ শ্লোকে 'বিশ' শব্দে জনসাধারণকে বুঝানো হয়েছে । এই নির্বাচিত রাজার

1. TOKEIC FERENCE, "Some contentions Issues in the Interpretation of the Asiatic mode of Production" "Journal of contaporany Asia, Vol. 12, No.3, 1982. P-279.

Dhaka University Institutional Repository

অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল নিজ প্রজাবর্গকে রক্ষা করা। রাজাকে জনসাধারনের রক্ষক বলে গণ্য করাই ছিল রীতি " ১

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন কালে রাজা গোষ্ঠীদের উপর শাসন ক্ষমতা পেতেন বটে তবে ভূমির উপর স্বৈরতান্ত্রিক মালিকানা ছিল এমন প্রমাণ হয় না।

ভারতীয় সামন্তবাদের উন্মেষের ও বিকাশের যে বিতর্কিত কালের উল্লেখ করেছেন ভারতীয় ইতিহাসতত্ত্ববিদরা ও সমাজতাত্ত্বিকরা তাদের মতামত সাধারনভাবে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, সবাই এক বাক্যে মার্কসের কাছে এঙ্গেলসের মন্তব্য "প্রাচ্যবাসীরা ভূমি মালিকানার এমনকি সামন্তরূপেও যে পৌঁছল না" - এর সমালোচনা করেন। তারা বলেন যে ভারতে সামন্তবাদ বর্তমান ছিল। ভারতীয় সামন্তবাদের সময় কালে প্রাচ্যের বিপুলায়তন দেশ চীনের সামন্তবাদেরও তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রাচ্য স্বৈরতন্ত্র বিরোধীদের মতামত সাধারনতঃ ভারত ও চীনের সামন্তসমাজের উপর ভিত্তি করে ও নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার চেষ্টা করেছে।

চীনের সামাজিক বিকাশের ধারা আলোচনা কালে সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক যুগ পর্যায়কে সনাক্ত করতে গিয়ে চীনের বর্তমান কালের ইতিহাসবিদরা বলেন যে, চীনে পূর্ণ সামন্ততন্ত্র বিকশিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে মাওসেতুং মন্তব্য করেছেন যে, প্রায় তিন হাজার বছর ধরে চীনে দাস যুগ পেরিয়ে সামন্ত যুগের অবস্থিতি ছিল এবং এর সূচনা হয়েছিল চৌ ও চিন রাজবংশের দ্বারা। এই সময়কালের প্রধান শ্রেনীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে,

---

১। আন্তোনভা, কোকা, বোনগার্দ - লেভিন, গ্রিগোরি ও কতোভাস্কি, গ্রিগোরি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃঃ ১১৯

Dhaka University Institutional Repository

"The principal contradiction in feudal society was between the peasantry and the landlord class " 1

এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে দেখা যায় যে, চীনে অনেকগুলি কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল । মাও সেতুঙ মনে করেন যে, সেগুলি সামন্তদের প্রতি কৃষকদের সাংঘাতিক ও অমানুষিক শোষণের প্রতিবাদ ।

চীনের সামন্তসমাজের বৈশিষ্ট আলোচনা কালে মাও সেতুঙ বলেন যে, চীনা সামন্তবাদের চারটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিষ্ট ছিল ।

প্রথমতঃ চীনে স্বনির্ভর প্রকৃতিজ অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল নিয়ন্ত্রক শক্তি । গ্রাম্য উৎপাদন ব্যবস্থায় কৃষকরা তাদের নিজেদের জন্য উৎপাদন করত । গ্রাম্য কারুশিল্পরা গ্রামের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মাফিক উৎপাদন করতেন । কর হিসেবে সামন্ত প্রভুরা যে সম্পদ গ্রহণ করতেন তার সবটাই মূলতঃ ভোগে ব্যবহৃত হত এবং বিনিময়ের জন্য অবশিষ্ট থাকত না । এবং বিনিময় প্রবনতাও ছিল না ।

দ্বিতীয়ত ঃ সামন্ত শাসক শ্রেনী ভু-সম্পত্তির প্রায় সবটারই মালিক ছিলেন । এই সামন্ত শাসক শ্রেনীর মধ্যে রাজা, সামন্তপ্রভু ও সম্ভ্রান্তবংশীয়রা ছিলেন । কৃষকরা ভু-স্বামীদের জমি জমা চাষাবাদ করতেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শতকরা ৪০% শতাংশ থেকে ৮০% শতাংশ উৎপাদ মালিককে দিতে বাধ্য হতেন ।

তৃতীয়ত ঃ রাজ পরিবার, সামন্ত প্রভু ও সম্ভ্রান্তবংশীয়দেরকে তথাকথিত নির্দিষ্ট হারে কর দিয়েও রেহাই ছিল না । উপরন্তু তাদেরকে দমন ও নির্যাতন করার

---

1. TUNG, MAO, TSE, "Selected Works", Vo. 11, Foreign Language Press, Peking, 1975. P-308

Dhaka University Institutional Repository

জন্য রাজকীয় কর্মচারী ও সৈন্যবাহিনীর জন্য বিভিন্ন প্রকার কর, বেগার শ্রম ও সেলামী বা নজরানা দিতে হত ।

চতুর্থত : সামন্তরাষ্ট্রযন্ত্র সামন্তপ্রভুদের শোষণ ব্যবস্থা কায়েম রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল । সম্রাট নিজে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন । তিনি সামরিক বাহিনীর পদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করতেন । তিনি আইন প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠান, বিচার ব্যবস্থা, রাজকীয় শস্যভান্ডার ও কোষাগার রক্ষণাবেক্ষনের জন্য প্রয়োজনীয় জনশক্তি নিয়োগ করতেন ।

মাও সেতুঙ মন্তব্য করেন যে, যদিও ইউরোপের মত সামন্তব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না তবুও কৃষকরা প্রায় প্রথাসিদ্ধ ভূমিদাসের পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল । যদিও কৃষকরা নাম মাত্র মালিকানা ভোগ করত তবুও তাদের অবস্থা ভূমিদাসের অবস্থার চেয়ে উন্নত ছিল না । সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করে তিনি মন্তব্য করেন যে,

"In effect the peasants were still serfs. " 1

চীনের সমাজের উপরোক্ত বৈশিষ্টই আবার সমাজতান্ত্রিকদের ভিন্ন রকম সিদ্ধান্ত নেয়ার ভিত্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে । মার্কসীয় অর্থনীতিবিদ ও সমাজ-তান্ত্রিকরা বলেন, চীনা সভ্যতার বিকাশ হয়েছে জলসেচ অর্থনীতির দ্বারা । চীনের আর্থসামাজিক অবস্থা সম্পর্কে মার্কসীয় মতামত পর্যালোচনা করে Melotti বলেন যে,

"China can be called the most classic and significant example of a society based on the Asiatic mode of production in that it achieved the fullest social development of any society so based. " 2

---

1. TUNG, MAO, TSE, "Selected Works", Vo.-II, Foreign Language Press, Peking, 1975. P-307
2. MELOTTI, UMBERTO, "Marx and the Third World", The Mac Millan Press Ltd. London, 1977. P-105

Dhaka University Institutional Repository

চীনের ঐতিহাসিক বিকাশের ধারা আলোচনা কালে তিনি বলেন যে Hsia রাজবংশ (২২০৫-১৭৬৬ খৃষ্টপূর্বাব্দ) চীনে যে এশীয় ধরনের স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তার বহু আর্থসামাজিক প্রমাণাদি বর্তমান রয়েছে। তিনি চীনের সাধারন মানুষের দুঃখ দুর্দশা দুর করার জন্য জলসেচ প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করেছিলেন। এবং তার ফলে উন্নতমানের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়।

চীনে ভূমি মালিকানা ও ভূমি ব্যবস্থায় কৃষকের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, চীনের ইতিহাসে প্রায়ই যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেটি মূলতঃ চক্রাকার, বিবর্তনধর্মী নয়। তার ফলে গ্রাম্য স্বনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা অপরিবর্তিত থাকে। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবল ভাবেই বর্তমান ছিল কেননা জলসেচ প্রযুক্তি যা ছিল কৃষি অর্থনীতির প্রাণ - নিয়ন্ত্রণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করত স্বৈরতন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকার। এক্ষেত্রে রাজা ও প্রজার মধ্যে ভূমির মালিকানা একটি সম্পর্ক সূত্র হিসেবে কাজ করে। রাজা কেতাবী অর্থে মালিকানা ভোগ করলেও প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র শোষকশ্রেণীর ভূমিকা পালনকারী হিসাবে উৎপাদসত্ব ভোগ করত। এই চক্রাকার রাজশক্তির পরিবর্তন ও আমলাতান্ত্রিক শোষণ ও স্বনির্ভর গ্রাম গোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে মতামত রাখতে গিয়ে তিনি বলেন,

> "But the fact remains that until the last century the typical structure of Asiatic Society survived more or less unchanged, having at its base the self-sufficient production of isolated village communities and its summit a despotic power that expoloited them while performing with varying degrees of efficiency at different times, the essential functions of

Dhaka University Institutional Repository

water control. In theory all the land, or at any rate most of it, belonged to the state, and in practice the state bureaucrats were the beneficiaries and constituted the actual exploiting class " 1

চীনা সমাজ সম্পর্কে দুজন মার্কসবাদী তাত্ত্বিকের ভিন্নমতামতের বিষয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মাও সেতুঙ মার্কসের এশীয় উৎপাদন ব্যবস্হা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেননি এবং এ জাতীয় উৎপাদন ব্যবস্হার প্রত্যক্ষ উপস্হিতির বিষয়ে কোন রকম পর্য্যালোচনামূলক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণও করেননি । স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, চীনা বিপ্লবী নেতা মাও সেতুঙ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবল ক্ষমতাধারী নেতা ষ্টালিন দ্বারা দারুনভাবে প্রভাবিত ছিলেন । ষ্টালিন তার সময়ে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্হা নিয়ে বিতর্ক পছন্দ করতেন না এবং মার্কসবাদী তাত্ত্বিক ও বিপ্লবী নেতা হিসেবে দাবী করেছেন যে, ঐ জাতীয় কোন উৎপাদন ব্যবস্হার অস্তিত্ব নেই । সমাজবিকাশের ঐতিহাসিক পর্যায় সন্নিবেশন করতে গিয়ে তিনি বলেন যে,

"The privitive communal system is succeeded precisely by the slave system, the slave system by the feudal system, and the feudal system by the bourgeois system, and not by some other " 2

ষ্টালিনের এই সুনির্দিষ্ট করে দেয়া ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক পর্যায়গুলি বহুজনকেই প্রভাবিত করতে সমর্থ হয় । ষ্টালিন বা মাও সে তুঙ তাদের চিন্তার কোন রকম পরিবর্তন করেন নি । কিন্তু মার্কস তার আবিস্কার ও মুল্যায়নকে নূতন

---

1. MELOTTI, UMBERTO, "Marx and the Third World", The Mac Millan Press Ltd. London, 1977. P-107
2. STALIN, J.V. "Problems of Leninism", Foreign Language Press, Peking, 1976. P-855

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যের ভিত্তিতে পরিমার্জন ও সংস্কার করতেন । যদিও তার মূল চিন্তা কখনই পরিবর্তিত হয়নি ।

ভারতীয় ইতিহাসবিদরা যারা সামন্ত সমাজের সন্ধান করেছেন ভারতের মাটিতে মধ্যযুগে (হিন্দু ও মুসলমান আমলে) আবার তাদের অনেকেই উপনিবেশ আমলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সামন্তবাদ বলে অবহিত করতে চান ।

ভারতীয় সামন্তবাদের বৈশিষ্ট্য (যার ভিত্তিতে সামন্তবাদের অস্তিত্ব প্রমাণ হয়) নিয়ে এক তুলনামূলক আলোচনায় রাম শরণ শর্মা বলেছেন যে,

"ভারতীয় সামন্তবাদের কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের ইউরোপীয় সামন্তবাদের কথা মনে করিয়ে দেয় । পুরোহিতদের ভূমি অনুদান দেওয়ার প্রথার সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপে জায়গীরদানের প্রথার তুলনা চলে । পার্থক্য শুধু এই যে ভারতে মন্দির বা ব্রাহ্মনগণ ইউরোপের গির্জার মত কোন সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের অংগ ছিল না । কিন্তু মধ্যযুগীয় ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ জায়গীর প্রদানের প্রথা ততটা ব্যাপক ছিল না ; যতটা ছিল মধ্যযুগীয় ইউরোপে । রাজ পদাধিকারীদের ভূমি বৃত্তি দেওয়া হত বটে, কিন্তু তাদের অধীনস্থ প্রশাসনিক ক্ষেত্রের একটি ক্ষুদ্র অংশই তাদের বৃত্তিরূপে দেওয়া হত । এই বৃত্তি ইউরোপীয় জায়গীর বা 'ম্যানর' (তালুক) কোনটার সঙ্গেই তুলনীয় নয়, সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণদের প্রদত্ত গ্রামগুলির সঙ্গে তুলনা হতে পারে । তাছাড়া ভারতীয় সামন্তদের নিজ প্রভুকে শুধু সামরিক সাহায্যই প্রদান করতে হত, ইউরোপের মত তাঁরা এখানে প্রশাসনিক কার্যে কোন সাহায্য প্রদান করতেন না । তথাপি ইউরোপীয় প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এখানেও বর্তমান ছিল । এদেশও আর্থিক দিক থেকে ছোট ছোট স্বনির্ভর এককে বিভক্ত ছিল - ব্যবসায়িক

Dhaka University Institutional Repository

আদান প্রদানের অভাবই এর কারণ বলে মনে হয় । এখানেও এক শক্তিশালী ভূম্যধিকারী মধ্যবর্তীর আবির্ভাব হয়েছিল কৃষকগণ এমশ তাদের অধীনে দাসরূপে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল । " ১

উপরোক্ত তুলতামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে যে যুক্তি প্রতিষ্ঠা পায় তার উপর ভিত্তি করে রামশরণ শর্মা সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন যে, " যদি রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা বা প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণকেই সামন্তবাদ বলে গ্রহণ করি, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, ভারতে বৃটিশ শাসনের পূর্বে বহুবার সামন্তবাদের অভ্যুদয় হয়েছিল " । ২

রামশরণ শর্মা যে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উপাদানকে সামন্ততন্ত্রের লক্ষণ বলে গণ্য করেছেন সেগুলি প্রকারান্তরে অন্যদের কাছে এশীয় সমাজের লক্ষণ হয়ে দেখা দিয়েছে । যেমন তিনি মন্তব্য করেছেন যে, " দেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিষ্ঠিত স্বনির্ভর আর্থিক এককের উপরই সামন্তীয় ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল " । ৩

ঠিক এরই বিপরীত বক্তব্য পাওয়া যায় Tokei - এর উৎপাদন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রবন্ধে । তিনি মন্তব্য করেছেন যে,

> The essence of this (Asiatic) mode of production is actually production on the basis of communal ownership of land by self - sustaining village communities..."4

এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার ভিত্তি যদি স্বনির্ভর গ্রামসমাজ হয় তবে রামশরণ শর্মার সামন্তবাদী সমাজের অস্তিত্ব বিপন্ন হয় ।

১। শর্মা, রামশরণ, " ভারতের সামন্ততন্ত্র ", কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭ । পৃঃ ২২৯

২। প্রাগুক্ত । পৃঃ ২২৯

৩। প্রাগুক্ত । পৃঃ ২২৯

4. TOKEI, FERENC, "Some contentions Issues in the Interpretation of the Asiatic Mode of Production" in Journal of contemporary Asia, Vol.-12, No.3, 1982. P-297

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় গ্রামসমাজের স্বনির্ভরতা ও উৎপাদন বৈশিষ্ট্যের স্বায়ত্ব চরিত্রের ভূমিকা পালন সম্বন্ধে এক প্রকার নিশ্চিত হয়েই Charles Matcaff বলেছিলেন যে,

> The village communities are little republics having nearly every thing they want within themselves, and almost independent of any foreign relation". 1

গ্রামীণ সমাজের স্বনির্ভরতা সম্পর্কে মার্কস অন্যান্যদের সাথে একমত ছিলেন। তিনি এঙ্গেলসকে লিখিত এক পত্রে (১৫ই জুন ১৮৫৩) বলেন যে "প্রত্যেকটা গ্রামেরই ছিল একটা সম্পূর্ণ পৃথক সংগঠন এবং নিজেরাই তারা একা একটা ক্ষুদে দুনিয়া স্বরূপ।" এইসব অচলায়তন বাধিগৎ ধরনের সমাজ এবং রাষ্ট্র এর বাস্তব অনুসংগ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "এই সব শান্ত সরল গ্রাম গোষ্ঠীগুলি যতই নিরীহ মনে হোক প্রাচ্য স্বৈরচারের তারাই ভিত্তি হয়ে এসেছে চিরকাল, --"। ২ উপরোক্ত ভিন্ন মতামতের বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় যে, একই প্রকার গুণাগুণ ও উপাদান সম্বলিত হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন মূল্যায়ন হয়েছে দৃষ্টিভংগির পার্থক্যের কারণে।

কার্ল মার্কস তার সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির প্রত্যক্ষ অনুশীলনের দ্বারা ভারতের সামন্ত সম্পর্কের যে দুর্বল দিক আবিস্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন অন্যদের পক্ষে সেই আপাত ও প্রকৃতের মধ্যকার দূরত্ব আবিস্কার করা সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে মুঘল আমলের সামন্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে কথাটা খুবই প্রযোজ্য। Max Weber যে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থাকে Prebendalization বলে আখ্যায়িত করেছেন তাকেই আবার অন্যান্যরা অস্থায়ী জমিদারী বা জায়গীরদারী ইত্যাদি ব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন।

---

1. KARIM, AK NAZMUL, "Changing Society in India and Pakistan", Oxford University Press, Pakistan, 1956. P-8

২। মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডারিক, "উপনিবেশিকতা প্রসঙ্গে", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১। পৃ-৩৩২

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল আমলে মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা যে ভূসম্পত্তির উপরে মালিকানা পায়নি সেটি এখন আর অজানা বিষয় নয় । বহুবিধ প্রমাণের উপর ভিত্তি করে (পূর্বে আলোচিত হয়েছে) বলা যায় যে, মুঘল জায়গীর-জমিদারী প্রথা ভূ-সম্পত্তিতে স্বত্ত্ব দিত না । "নয়ম হিসেবেই জায়গীরদার এর জমিরস্বত্ত্ব তাঁর পরিবারে বা বংশানুক্রমে অর্শাত না বরং তার মৃত্যুর পর তা ফের রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে পরিণত হোত ।" ১

শর্মা নিজেও মনে করেন যে, মুসলমান আমলে সামন্তবাদের অবক্ষয় ঘটে এবং উপনিবেশিক আমলে পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা হয় । কিন্তু তার বক্তব্যের মধ্যে ঐতিহাসিক কাল পরম্পরায় যে পরিবর্তন হয়েছে সামন্তদের মধ্যে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই । যেমন কোন হিন্দু রাজবংশই দীর্ঘদিন রাজত্ব করতে পারেনি । ফলে কোন এক রাজবংশের আমলের অনুদান পরবর্তী রাজবংশীয় রাজাদের আমলে যথাবিহীত পূর্বেকার সম্মান ও ভোগস্বত্ত্বসহ বহাল থেকেছে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না । উপরন্তু তাকে উচ্ছেদ ও সবংশে নির্মুল করা হয়েছে অনেক ক্ষেত্রেই । কেননা পূর্ববর্তী রাজার একটি সামরিক শক্তি হিসেবে, ঐ সব অনুদান ভোগীরা দায়িত্ব পালন করেছে এবং সেইহেতু শত্রু পক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে । রামশরণ শর্মা নিজেই প্রমাণ সিদ্ধ মন্তব্য করেছেন যে, "সাধারনতঃ সম্রাটকে সামরিক সাহায্য দানই রাজা ও সামন্তদের প্রধান কর্তব্য ছিল" ২

মুঘল আমলেও সুবেদাররা প্রধানতঃ সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং সম্রাটের পক্ষে যুদ্ধ করা ইত্যাদি সেনাপতিসুলভ কাজ করতেন ।

যাহোক - সামন্ত বলে যাদের অভিহিত করা হয়েছে তারা খাজনা আদায়ের নামে অবৈধ মধ্যসত্ত্ব ভোগ করতেন বটে কিন্তু খুব বেশীদিন তাদের পক্ষে মাটি কামড়ে পড়ে থাকা সম্ভব হত না । কেননা প্রায়ই নুতন রাজার আক্রমনে অত্যাচারে স্থান ছেড়ে দিতে হত এবং নুতন করে সামন্ত নামে মধ্যসত্ত্ব ভোগীর আগমন ঘটত ।

১। আন্দ্রোনভা, কোকা, প্রভৃতি "ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ । পৃঃ ৩২১

২। শর্মা, রাম শরণ, "ভারতের সামন্তবাদ, কে, পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৭৭ । পৃঃ ২৪

Dhaka University Institutional Repository

শুধুমাত্র রাজশক্তি হিসেবে সৈন্যবাহিনীর সাথে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গের জন্যই নয় ব্রাহ্মণ ও মন্দিরকে দেয়া ভূমির অধিকারও বংশানুক্রমিক ভাবে হস্তান্তরিত হত না। কেননা, "রাষ্ট্রিক উপপ্লবের সময়ে যখন এক রাজ্যের পতন ও অপর এক রাজ্যের উৎথান ঘটত কিংবা যখন বিদেশী আগ্রাসকের অভিযানের ফলে স্থানীয় জনসাধারন পরাধীন হয়ে পড়ত তখন কেবল মাত্র সামন্ত ভূস্বামীদের তালুকই নয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ও মন্দিরে অধীন জমি জমাও রাষ্ট্র বাজেয়াপ্ত করে নিত"। ১

উপরোক্ত ঐতিহাসিক উদাহরণ থেকে দেখা যায় যে, সামন্তরা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সাথে মজবুত ভাবে মৌরসী পাট্টা গেড়ে বসার আগেই মধ্যসত্ত্ব ভোগী হিসেবে সে নিজেই বিদূরিত হতে বাধ্য হয়েছে। ফলে গ্রামীণ সমাজ গোষ্ঠীর সাথে রাজার যে আদি কর দেয়া ও জমির মালিকানা ভোগের সম্পর্ক তা পরস্পর বজায় থেকেছে। ফলে রাজা কেতাবী মতে জমির মালিকানার অধিকারী হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও প্রজাকুলই প্রকৃত অর্থে জমির মালিকানা ভোগ করেছে এবং একই সাথে এশীয় স্বৈরাচারকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে দেখা যায় যে, কোন সময়েই - কি হিন্দু আমল কি মুসলমান আমল - সামন্তরা ভূসম্পত্তিতে প্রকৃত পক্ষে স্বত্বস্বামীত্ব ভোগ করতে পারেনি।

হিন্দু আমলে প্রধাণত রাজনৈতিক ও নিয়ন্ত্রণক্রম শর্ত পদ্ধতিগত কারণে এবং মুসলমান আমলে প্রধানতঃ পদ্ধতিগত ও নিয়ন্ত্রণক্রম শর্ত রাজনৈতিক কারণে সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা হয়নি। বলা যায় হিন্দু আমলে যে সামন্তবাদের অঙ্কুরোদগম হয়েছিল তার আর বণস্পতিতে পরিণত হওয়া সম্ভব হয়নি পুষ্পিত বা ফলবতী হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

১। আন্তোনভা, কোকা, প্রভৃতি "<u>ভারতবর্ষের ইতিহাস</u>", প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮২। পৃ. ৩২১

Dhaka University Institutional Repository

এশীয় স্বৈরাচার পূর্বাপর বহাল থেকেছে । বিকাশের নিয়মে সামন্ততন্ত্র ও স্বাভাবিক ধনতন্ত্রের জন্ম হয়নি - যা এশীয় স্বৈরাচারকে সমূলে উৎঘাটন করতে পারতো । যেমন মার্কস বলেছিলেন বিপ্লব ছাড়া এই সমাজের পরিবর্তন হবে না ।

অত্যন্ত প্রাসংগিক বিধায় পরবর্তী পরিচ্ছেদে এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও ব্যাক্তিমালিকানার দ্বন্দ্ব এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামন্ত উৎপাদন ব্যবস্থার টিকে থাকার লড়াই এবং তার ফলশ্রুতিতে পাতিসামন্ত শ্রেনীর উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো ।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাম সমাজ

নতুন সামন্তশ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ।

"মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা" গ্রন্থের বাংলা সংস্করণের ভূমিকাতে প্রাচ্য বিশারদ ইরফান হবিব অকপটে স্বীকার করেছেন যে, তার সংগৃহীত দলিলপত্র তাকে 'গ্রাম সমাজের চরিত্র বুঝতে যথেষ্ট সাহায্য করেনি । পরবর্তী পর্যায়ে গ্রাম সমাজ সম্পর্কে তার মত পরিবর্তন করেছেন । তিনি বলেছেন "গ্রামাঞ্চলেও যে বাজারের মুখ চেয়ে উৎপাদন করা হত ও নগদ সম্পর্ক চালু ছিল তারও সমর্থন পাওয়া গেছে । আমার বইয়ে আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, এইসব ঘটনাই গ্রাম সমাজকে খর্ব করেছিল । তখন মনে করেছিলাম, গ্রাম সমাজ কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ কাজ কর্মের আদি সংগঠনের প্রতিনিধি । তাদের মধ্যে একটা ছোট গোষ্ঠী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলে গ্রাম সমাজ হয়ত সম্পূর্ণ ভাবেই হারিয়ে যেত ।

এই শেষ ধারনাটির প্রতি আমার সন্দেহ আছে । এখন আমার মনে হয়, গ্রাম সমাজের চেহারাটা যতদুর ধরা যায় তাতে এটি ছিল গ্রামের "বড়লোকদের ছোট ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী মারফত গ্রামকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিষ্ঠান ।" ১

ইরফান হবিব যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গ্রামসমাজ সমন্ধে তার নজির বহুবিধ আকর গ্রন্থে পাওয়া যায় । বাংলাদেশের গ্রাম সমাজ সম্পর্কে তার মন্তব্য আশ্চর্যজনকভাবে ঐ সব আকর গ্রন্থের উল্লেখ ও মতামতের সাথে মিলে যায় । যে সব আকর গ্রন্থে বাংলাদেশে সামন্তবাদের উপাদান খুঁজে পাওয়ার সুযোগ আছে সে সব গ্রন্থেই গ্রাম সমাজের ধনী কৃষক বা ক্ষুদে সামন্ত বা পাতি সামন্তের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় । খুবই বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, আজও বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পাতিসামন্ত বা ক্ষুদে সামন্তদের অস্তিত্ব বর্তমান আছে ।

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা", কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃঃ ১-১০

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচীন কাল থেকেই গ্রাম সমাজে ঐতিহাসিক কারণে ক্ষুদে সামন্তরা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। যদিও প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদী আমলে (প্রধানতঃ হিন্দু আমল) ছোট ছোট জমির অধিকারী গ্রাম সমাজের মুণ্ড সদস্যরা "রাজস্বের বড় অংশটা রাজকোষে জমা দিত তবুও এরাই গ্রাম সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করত এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। রাজনৈতিক ক্ষমতা একেবারেই ছিল না বললে যেমন ভুল হবে তেমনি ও রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দু বললেও বেশী বলা হবে। তবে স্বাধীন ধনীকৃষক হিসেবে স্বকীয় মালিকানাধীন ভূমির মালিকানা এবং তার উৎপাদ ভোগের অধিকারী ছিল বলা যায়। এমনকি তারা গ্রাম সম্প্রদায়ের সাধারণ মালিকানা বহির্ভূত সম্পত্তির মালিকানা ভোগদখল করত এবং সেই আর্থিক সামর্থ্যের কারণে সামাজিক সুবিধাজনক অবস্থান থেকে শ্রেনী অবস্থানে কেন্দ্রীভূত হওয়া শোষণ-সুবিধা ভোগের সুযোগ পেত।

মুঘল আমলে তাদের সংহত চরিত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পন্ডিতগণ ভারতে মুঘল আমলে খাজনা-কর ভোগকারী (উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে) শ্রেণীটাকে তিনটি বর্গে ভাগ করেছেন। তার ভাগের সর্বশেষে এক শ্রেণীর ক্ষুদে সামন্তের উল্লেখ আছে। যারা নিজেরা করদাতা হয়েও উপসত্ব হিসেবে উদ্বৃত্ত মূল্য ভোগ করত। এই ক্ষুদে সামন্তদের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি এমনকি রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তিও ছিল। এদের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে এবং সাম্রাজ্যবাদী শোষণে স্বার্থের প্রতিকূল না হওয়ায় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রীয় শক্তি এদের অস্তিত্ব রক্ষা করত নানাবিধ জটিল আইনগত বে-আইনী উপায়ে এবং বিশেষ ছাড় দিয়ে। এই বিশেষ ছাড়ের মধ্যে ভাবাদর্শগত কর্মযন্ত্রকে নিস্কর ভূমিদান এবং অহল্যা-ভূমিকে জবর দখলে রাখার সুবিধার কারণে দখলীস্বত্ব আরোপ ইত্যাদি আছে।

Dhaka University Institutional Repository

পাভলভ উল্লেখ করেছেন,

> "ভারতে মুঘল আমলে খাজনা-কর প্রাপ্য শ্রেণীটাকে ভাগ করা যায় প্রধান তিনটি বর্গে, মুঘল - প্রধানতঃ মুসলিম - উপর মহল, যাদের ছিল সবচেয়ে বড় বড় জায়গীর, বড় আর মাঝারি - প্রধানতঃ হিন্দু-ভূস্বামীরা, তারা নিজেদের ভূমিতে পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব বজায় রেখেছিল বহুলাংশে, আর প্রতিপত্তিশালী প্রজারা যারা তাদের বিধি সম্মত জমি বন্দগুলোর মধ্যে চুকিয়ে নিয়েছিল নানা পতিত জমি আর সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিভিন্ন অবশিষ্ট অংশ" । ১

এই কুদে সামন্তরা ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন আকারের ভূ-সম্পত্তির অধিকারী ছিল । "বাংলার বিভিন্ন বর্গের রায়তদের জোতের আয়তন ছিল বিভিন্ন, সেটা যেমন ছিল মহারাষ্ট্রে । কোন কোন রায়তের ছিল ২০০ বিঘা পর্যন্ত জমি ৫২৬ হেক্টরের বেশী) এবং তি-চার প্রস্থ সরঞ্জাম । সিনহা বলেছেন এই সব রায়তদের জমিতে চাষাবাদ চালানো হত জন খাটিয়ে, এই মজুরেরা কাজ বাবত পেত একটা জমি-বন্দ-চাকরান, যেটা বাগানের অনুরূপ, অর্থাৎ কিনা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলের মানুষের এই অংশটার উপর চলত সামন্ততান্ত্রিক শোষণ আর গ্রামাঞ্চলে উপরস্তরের মানুষের খামারে বেগার খেটে এরা নিঃশেষ হয়ে যেত । " ২ গ্রামের ধনী কৃষক বা কুদে সামন্তরা নিরবিচ্ছিন্নভাবে একই কায়দায় গ্রামের মজদুর শ্রেণীকে শোষন করত - এ শুধুমাত্র শ্রম ফসল চুরি করে নয় । এমনকি তারা গ্রামের মোট রাজস্বের বড় অংশটাকে প্রান্তিক চাষী ও গ্রামের নীচু জাতির উপর চাপিয়ে দিত অতিকৌশলে এবং এইভাবে নগদ অর্থের মানদন্ডে । গ্রামাঞ্চলের পাতিসামন্ত শ্রেণী বা উপরমহল সম্পর্কে এন,কে,সিনহার একটা বিচার বিশ্লেষনে দেখা যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হওয়ার ঠিক আগে উচু

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৪৪

২। প্রাগুক্ত পৃ - ৯৯

Dhaka University Institutional Repository

রায়তদের বিশেষ সুবিধা ভোগ (কর প্রতিস্হাননের সুবিধা নেওয়া) গ্রহণের বিষয়টি। তিনি বলেছেন, "গ্রামের প্রধান বা মন্ডল (মন্ডল শব্দটার অর্থ 'মোকাদ্দাম' -এর খুবই কাছাকাছি) তাদের মধ্যে থেকে নিযুক্ত হত বলে ভূমি করের প্রধান বোঝাটাকে 'নিচু রায়তদের' ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার সুযোগ ছিল 'উঁচু রায়তদের" ১

এই শ্রেনীর উঁচু রায়তদের অস্তিত্বের বহু প্রমাণ পাওয়া যায় বিভিন্ন আকর গ্রন্থে।" যেমন বাঙ্গালী কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কবিতায় (আঠার শতকের ষষ্ঠ দশক) আছে একজন গ্রাম্য ভূ-স্বামীর বর্ণনা, এই ভূস্বামীটি পশ্চিম ভারতের পক্ষে তেমন নমুনাসই নয়-তার জমি গুলোতে যারা চাষবাস করত তাদের কাজের উপর কড়া নজর রাখাই ছিল এর কাজ।"২

গ্রামের ধনী কৃষক শ্রেণী মূলতঃ গ্রামের অধিপতি ছিল। এরাই গ্রামের স্বায়ত্বশাসন রক্ষা করত এবং গ্রামের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মালিকানা ভোগ করত। যদিও এই ভোগ নির্বিচ্ছিন্ন ছিলনা (কেননা রাষ্ট্রীয় উপপ্লবের সময় নতুন রাজারা আগের ভূমিদান বাতিল করত) তবুও কোন না কোন ভাবে এই শ্রেনীর মালিকানা লুপ্ত হতনা। হয়তবা কোন ব্যক্তি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্হ হতেন কিন্তু সামগ্রিকভাবে শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হা গৃহীত হত না। এই সূদে সামন্তরা সাম্রাজ্যবাদী স্বৈরশাসনের আমলেও বহুবিধ বিড়ম্বনা ও স্বার্থহানীর পরও আদের গ্রামীণ সমাজ কর্তৃপক্ষের সদস্য হিসেবে বহুবিধ অধিকার বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলো। রাষ্ট্র তাদের মালিকানা ও আধিপত্যকে অস্বীকার করতে পারত না। এমন কি সামাজিক ও রাজনৈতিক বিধি বিধান প্রয়োগের ব্যাপারেও গ্রামীণ সমাজকে গুরুত্ব দিতে হোত। নতুন কোন ব্যক্তিকে ভূমিদান করতে হলে বা পুর্ণবিন্যাস করতে হলে তা "করা হত সমগ্রভাবে স্হানীয় জনসাধারনের উপস্হিতিতে এমনকি সমাজের সবচেয়ে নিচু সম্প্রদায়গুলির সমক্ষেই।" ৩

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরনের ঐতিহাসিক পুর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৯৮

২। প্রাগুক্ত। পৃ - ৯৮

৩। আন্তোনভা কোকা, বোনগার্দ লেভিন, গ্রিগোরি ওকতোভাস্কি গ্রিগোরি, ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃ - ২৫৯

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম সমাজের সামাজিক ও আর্থরাজনীতিক ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে ধনী কৃষকেরা উপসত্ব হিসেবে ভূমি খাজনার একটা অংশও গ্রহণ করত। গ্রামের সম্মানীয় সদস্য (যারা প্রধানতঃ গ্রামের মোড়ল) উৎকোচ ও উপহার আদায় করতেন শক্তি প্রয়োগে ও জবর দস্তি করে। " মধ্যযুগে লেখা সাহিত্যের পুথিগুলি থেকে এটা স্পষ্টযে গ্রামের এইসব মোড়ল উৎকোচ আদায়ের জন্যে প্রায়শই নিজেদের ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। অন্যান্য গ্রামবাসীর কাছ থেকে মান মর্যাদা ও উপহারসামগ্রী দাবী করতেন তারা। গ্রামীণ সমাজের অন্যান্য সদস্যর চেয়ে তারা ছিলেন বহুগুণে ধনী এবং তাদের প্রভাব প্রায়শই গ্রাম্য পরিবেশের সীমানা ছাড়িয়ে বাইরে ছড়িয়ে পড়ত। " ১ রাজ দরবার পর্যন্ত এদের মান মর্যাদার পরিচিতি ছিল এবং তারা রাজনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতেন। মধ্যযুগে ভারতে গ্রামী সমাজ ছিল এক শক্তিশালী সমাজ সংগঠন এবং তা যে শুধু উল্লেখ্য সামাজিক-অর্থনৈতিক ভূমিকাই পালন করত তা-ই নয়, বিশেষ এক রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল তার।" ২

এই গ্রামীণ ধনিক শ্রেনীর উৎপত্তি অতি প্রাচীন কাল থেকেই। ভারতীয় সমাজে এদের অস্তিত্ব বৈদিক যুগ থেকেই স্বীকৃত হয়েছে। বৈদিক যুগে রাজা নির্বাচনে গ্রাম প্রধানের অংশ গ্রহণের নিদর্শনাদি থেকে অস্তিত্ব, গুরুত্ব ও প্রভাব প্রতিপত্তির সূত্র পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, আলোচ্য কালে রাজা নির্বাচনের সময় জনসভা অনুষ্ঠিত হত এবং জনসভায় গ্রাম প্রধান, মোড়ল ইত্যাদি পাতিসামন্তরা মতামত পেশ করত এবং মুক্ত ভোটাভোটিতে অংশ গ্রহন করত। বৈদিক যুগের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে জানা যায় যে, " প্রথম প্রথম জনমন্ডলীর দ্বারা রাজা নির্বাচিত হতেন এবং এ উদ্দেশ্যে স্পষ্টতই এক বিশেষ সমাবেশে সমবেত হত জনসাধারন। ঋগ্বেদে এবং অথর্ববেদে রাজা নির্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটি সূক্তের একটি পংক্তি হল নিম্নরূপ : বিশ - নির্বাচিত ভূমি শাসনের তরে। " ৩

১। আন্দ্রোনভা, কোকা, প্রভৃতি, "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। প - ২৫১

২। প্রাগুক্ত।

৩। প্রাগুক্ত। পৃ - ৫২

Dhaka University Institutional Repository

এখানে এবং ঋগ্বেদেরও অনুরূপ শ্লোকে 'বিশ' শব্দে জনসাধারনকে বুঝানো হয়েছে। 'বিশ' যে অর্থে জনসাধারণ সেই অর্থে জনসাধারনের প্রতিনিধিও। রাজা নির্বাচকদের যে তালিকা এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায় সেখানে ব্যাপক জনসাধারনের নাম নেই বা সংখ্যার বর্ণনা নেই। কিন্তু যে সব ব্যক্তিদের রাজা নির্বাচক হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে গ্রাম প্রধানের অংশ গ্রহণকে গুরুত্বের সাথে এক্ষেত্রে গ্রহণ করা যেতে পারে। গ্রাম প্রধান বা গ্রামী সেই সময়কার প্রচলিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হতেন এবং গ্রামের প্রতিনিধিত্ব করতেন। রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের একটি অংশ হিসেবে রাজা নির্বাচন করার সুযোগও ছিল। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে কোন এক রাজ চক্রবর্তীর অভিষেক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী রাজা 'নির্বাচকদের তালিকায় 'গ্রামণী বা গ্রামের মোড়লেরও নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, তখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শাসন কার্যের ব্যাপারে গ্রামের স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের কিছুটা হাত ছিল।" ১

আগেই বলা হয়েছে যে, ক্ষুদে সামন্ত বা ধনীকৃষক শ্রেণী করের উপসত্ব ভোগ করত। কোন কোন এলাকায় এই উপসত্বের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট ছিল। একটি গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই উৎপাদ বন্টনের একটি নমুনা বিচার করে (উদাহরণ স্বরূপ) দেখা যেতে পারে। সাধারন সেচের আওতায় যেসব জমি ছিল তার উৎপাদ বন্টনের অনুপাত বিশ্লেষিত হয়েছে এই উদাহরণে -

---

১। আন্দ্রোনভা কোকা, "ভারতবর্ষের ইতিহাস" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২। পৃ-৫৩

Dhaka University Institutional Repository

এক খাড়ি ধান ভাগ করা হত নিম্নলিখিত রূপে (টাম হিসেবে)

সরকার	১০
গ্রামের মোড়ল	১/৪
শানবোগ	১/৪
চৌকিদার	১/৪
'গ্রামের পারিয়া'	১/৪
ক্ষৌরকার	১/৮
সূত্রধর	১/৮
মন্দির আর ব্রাহ্মণেরা	৩/৮
রায়ত	৮
মোট :-	২০ টাম ----- ১ খাড়ি - ১

সর্বক্ষেত্রেই এই নিয়ম চালু ছিল না। তবে ভারতের সব অঞ্চলেই মধ্যসত্ত্ব ভোগের প্রকৃতি প্রায় একই রকম ছিল। এবং এক এলাকার অভিজ্ঞতা অন্য এলাকায় দেবতা নির্ধারিত বিধির মতই চালু হয়ে যেত। যেমন, মৈসুরে কৃষিজাত দ্রব্যের বন্টনের প্রকৃতির মধ্যে যে উপসত্ত্ব ভোগের ধরণ দেখা যায় তা প্রায় একই রকম। পাভলভ উল্লেখ করেছেন "মৈসুরে কৃষিজাত দ্রব্যের বন্টন সম্মন্ধে নিজ পর্যবেক্ষণ-উপাও গুলির সংক্ষিপ্তসার করে হেইন বলেন, মোক্ষণ-দেওন প্রচলিত ছিল 'উচু জমিতে' আর নামাল বা ধানের জমিতে ছিল ভাগচাষ, তাতে ভাগটা, নির্ভর করত জমি-বন্টটা জলসেচের পক্ষে কতটা উপযোগী তার উপর। মৈসুরের বেশীরভাগ এলাকায় ভাগচাষী উৎপাদের অর্ধেক পেত নামেমাত্র, কিন্তু 'গ্রামে সরকারের কর্মচারীদের কাছে বাধ্যবাধকতা মেটাবার পরে তার হাতে অবশিষ্ট থাকত তৃতীয়াংশ মাত্র।" ২

১। পাভলভ, ভ,ই," ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত " প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৩৫

২। প্রাগুক্ত। পৃ - ৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের প্রায় সব এলাকাতেই এবং বাংলাদেশেও একই রূপ উপসত্ব ভোগের নিয়ম আমোঘ বিধির মতই চালু ছিল। "মৈসুরের দার্মাপুরমে যা জলসেবিত নয় এমন জমিতে উৎপন্ন এক খাঁড়ি জোয়ার বন্টিত হত নিম্নলিখিত লোকদের মধ্যে ----- (উদাহরণ স্বরূপ)।

সরকার	৭
সরকারের চৌকিদার	১
স্থানীয় চৌকিদারেরা	১
ক্ষেতে নাঈল চষা 'পারিয়া'	১$\frac{১}{৪}$
সরকারের গ্রাম-সেবকেরা (কারিগরেরসমেত)	১/২
ব্রাহ্মনরা	৩/৮
শানবোগ(হিসাব রক্ষক)	৩/৮
গাউডা (মুখ্য রায়ত) (অর্থ্যাৎ মোড়ল)	১/৮
লিঙ্গায়েত পুরোহিত	৩/১৬
মোট কেটে নেয়া হত	১২ টাম - ২

এইভাবে রায়তের হাতে থাকত অবশিষ্ট ৮ টাম, কাজেই কর (সরকারের হিসসা)হিসেবে যেত ফসলের ৩৫% শতাংশ, কর্তৃপক্ষ আর রক্ষীদের হিসসা - ১২·৫% শতাংশ, পুরোহিতের ভাগে ২·৫% শতাংশের বেশী, কর্মচারী (ক্ষেতিনা করা) আর কারিগরদের ভাগে ২·৫% শতাংশ। সব মিলিয়ে গ্রামের মেহনতী - অংশটার (রায়ত নিজে, 'পারিয়া', গ্রাম সেবক, কারিগর) ভাগে পড়ত উৎপাদের প্রায় অর্ধেকটা।" ২

১। পাভলভ, ভ,ই," ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশক, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৩৪

২। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু সবক্ষেত্রেই মেহনতী রায়ত অর্ধেক পেত না। কেননা কোন কোন স্থানে ভূমি খাজনা হিসেবে গ্রাম থেকে প্রায় অর্ধেকটাই বেরিয়ে যেত। সেক্ষেত্রে অবশিষ্ট অর্ধেকের মধ্যেই গ্রামীণ সামন্তশ্রেণী ভাগ বসাত। ফলে রায়তের অংশ অনুপাতিক হারে কমে আসত।" আই (ইরফান) হবিব মোটামোটি হিসাব কষে দেখেছেন- গ্রামীণ আর স্থানীয় কর্মকর্তা, সৈনিক এবং হরক রকমের গ্রামীণ খাজনা-প্রাপ্যদের (বুদ্ধিজীবিরা এবং কর্মকুরু লোক সমেত) জন্যে কাটান গুলোর পরে নীট উৎপাদের সিকি অংশ, তৃতীয়াংশ, এমনকি অর্ধেকটা পর্যন্ত বেরিয়ে যেত গ্রামাঞ্চল থেকে" ১

বস্তুত মুঘল আমলে ভূমি রাজস্ব কোন একটি নিয়ম মেনে চলেনি। রাজস্ব আদায়ের সবক্ষেত্রেই দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাৎসরিক আদায় সবচেয়ে বেশী হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। কিন্তু রাজস্ব আদায়ের চাপাচাপিতে যেন কৃষককুল ধ্বংশ হয়ে না যায় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হত। তবুও আদায়ের পরিমাণ মানবিক বিচারে অস্বাভাবিক শোষণ বলেই মনে হয়। "রাজস্ব বরাত সমন্ধে পেলসার্ট জানিয়েছেন চাষীদের কাছ থেকে এত বেশী নিংড়ে নেওয়া হত যে, তাদের পেট ভরানোর জন্য এমনকি শুকনো রুটিও পড়ে থাকত না"। ২ শোষণের মাত্রা বেশী হলেও রাজা ও রাজ কর্মচারীদের কাছে বেশী মনে হতনা। "আবুল ফজলকে এসব ব্যাপারে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে প্রমাণ্য ব্যাখ্যাকার বলে ধরা যায়। তিনি কিন্তু খোলাখুলি ভাবেই বলেছেন যে, শাসকের কাছে প্রজার আর্থিক দায়ের কোন নীতিগত সীমা ঠিক করা যায় না : তার জান ও মালের রক্ষক যদি তাকে সম্পত্তি ছেড়ে দিতেও বাধ্য করে, তবুও প্রজার উচিত (তার কাছে) কৃতজ্ঞ থাকা।" ৩

১। পাভলভ ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৪৫

২। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষিব্যবস্থা" কে,পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫। পৃ - ২০২

৩। প্রাগুক্ত। পৃ - ৪৫

Dhaka University Institutional Repository

প্রজার সবকিছু নিয়েও যদি রাজকোষের প্রয়োজন মেটানো যায় তাতে দোষের কিছু নেই । এই নীতিতে বিশ্বাসী ভারতীয় সম্রাট এবং রাজারা প্রচলিত রীতিনীতিকে উলটিয়ে দিতে পারতেন না । গ্রাম্য কৃষকদের সাথে তাদের বোঝাপড়া করতেই হত । এই বোঝাপড়া ও দর কষাকষির পর প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা যেত যে মোট কৃষি উৎপন্নের অর্ধেকই রাজস্ব হিসেবে দিতে হত । সমগ্র মুঘল আমলেই সম্ভবতঃ এই রকমই পরিমাণ ছিল রাজস্বের । যেমন ইরফান হবিব উল্লেখ করেছেন যে, "সর্বত্রই ভূমি রাজস্ব হবে উৎপন্নের অর্ধেক : আরঙ্গজেবের আমলে রাজস্ব সংক্রান্ত লেখা পত্রের সব জায়গায় - সাধারন নির্দেশ নামায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে জারি করা আদেশেও - ছড়িয়ে আছে এই অনুশাসন ।" ১ অন্যত্র তিনি উল্লেখ করেছেন যে "আকবর আদেশ দিয়েছিলেন যে, অর্ধেকই দাবী করতে হবে ।" ২ এই অর্ধেক ভাগাভাগির উপর বার বার জোর দেওয়ার ব্যাপারটা উদ্ভূত হয়েছে শরিয়ত (মুসলিম আইন) এর অনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা থেকে " ৩

রাজস্ব আদায়ের পদ্ধতি থেকেও 'ভাগচাষের' বিষয়টি মূর্ত হয় । এবং ভাগচাষ ব্যবস্থায় দাবী অর্ধেকই হতে পারে । আদায়ের দিক থেকে বিবেচনা করে "আইনে পরিস্কারভাবে তিন ধরনের ভাগ চাষের কথা বলা হয়েছে । প্রথমটিতে "দু' দলের লোকের উপস্থিতিতে খামারে চুক্তি (করার-দাদ) অনুযায়ী শস্য ভাগাভাগি করা হয় । মনে হয় এটাকেই 'বটাঈ' এর যথাযথ রূপ বলে গণ্য করা হতো । দ্বিতীয়টি হলো 'ক্ষেত কটাঈ' অর্থাৎ ক্ষেত ভাগ বা টাকার আগে ক্ষেতের ফসল ভাগ । তৃতীয়টি হলো 'লঙ্গৈ বটাঈ' যেখানে শস্য কাটার পর তা স্তূপাকারে রাখা হতো, তারপর ভাগ করা হতো ।" ৪

১। হবিব ইরফান, "মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা" কে,পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃ - ২০৭
২। প্রাগুক্ত । পৃ - ২০৫
৩। প্রাগুক্ত । পৃঃ- ২০৭
৪। প্রাগুক্ত । পৃ - ২০৯

Dhaka University Institutional Repository

একটি সরকারী নিথতে " রাজস্ব আদায়ের সবচেয়ে ভাল পদ্ধতি ' বলে শস্য ভাগের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে । বোধহয় সাধারনভাবে চাষীদের কাছে এটাই ছিল সবচেয়ে পছন্দসই । এর মাধ্যমে তারা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মরসুমের ঝুঁকি ভাল করে দিতে পারত । যথেষ্ট দুদর্শাগ্রস্ত গ্রাম বা চাষীদের কাছে এই পদ্ধতিই সবচেয়ে লাগসই মনে হতো । কোন গ্রামে, চলতি নির্ধারণে সন্দেহের অবকাশ ঘটলে, প্রশাসনের পক্ষে সেখানকার উৎপাদন - ক্ষমতা পরখ করার এটাই ছিল ভালো উপায় । বাজারে যখন শস্যের দাম পাওয়া যেতে তখন কর্তৃপক্ষের কাছেও এটা লাভের ব্যাপার হতো " ১

এই ধরনের ভাগাভাগিতে জমির ফসলের অর্ধেকটাই চলে যেত রাজকোষে । বাকী অর্ধেক থাকতো গ্রামের সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাগাভাগির জন্য । এই ভাগাভাগির নির্ধারক ছিল গ্রাম সমাজের অধিপতি শ্রেণী । কেননা তারা যেমন গ্রামের বা সমাজের শাসক তেমনি আবার রাজস্ব সংগ্রহকও, মোট রাজস্ব আদায়ের জামিনদার । এই রাজস্ব জামিনদারীর কারণে কর ইজারাদারী ব্যবস্থা গড়ে উঠে । কর ইজারাদাররা মূলতঃ গ্রাম্য ক্ষুদে সামন্তই । কিন্তু ব্যবস্থা চালু রাখার জন্য ইজারাদার নিজেই উৎপন্ন ফসলের একটি অংশ উপসত্ব হিসেবে ভোগ করত । ইজারাদারী প্রথাটি গড়ে উঠে মুঘল আমলেই বেশী পাকাপোক্ত ভাবে । কেননা কেননা " রাজস্ব বেঁধে দেওয়া হত টাকায়, জিনিসে নয় । যে দর বা বাজার-দরের ভিত্তিতে রাজস্ব দাবীকে টাকায় পরিণত করা হত, তা যে ফসল তোলার সময় (যখন বাজারে যোগান প্রচুর) যে দামে চাষীরা শস্য বেচত তার সমান - এমন সম্ভাবনা খুবই কম " ২ তাছাড়া রাজকোষে রাজস্ব যেত টাকায় । এই টাকা এককালীন প্রদান করত ইজারাদার । এরা কম পয়সায় ফসল কিনে পরে অভাবের সময় বেশী দামে বিক্রি করত । এভাবে তারা তাদের ইজারাদারী পুঁজি বৃদ্ধি করত ।

১। হবিব ইরফান, " মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা" কে,পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫ । পৃ-২১০

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

পাভলভ বলেছে "এটা অনস্বীকার্য যে, শেরশাহ এবং আকবরের সাধিত সংস্কারের পরে ষোল শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই রাজকোষে বিশেষত কেন্দ্রীয় রাজকোষে খাজনা কর আদান প্রদান হত প্রধানত নগদে।" ১ নগদে খাজনা প্রদান করাটা সে আমলে সরল প্রক্রিয়া ছিল না এবং উৎপাদন ও বিপণন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান ও ভূমিকা ছিল। তবে জমির মালিক এ ক্ষেত্রে প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবশ্যই রাখতো। পাভলভ বস্তু খাজনা থেকে নগদ খাজনায় রূপান্তর প্রক্রিয়ায় জমির মালিককে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যান্য মধ্যসত্ব-ভোগীকে মুনাফাখোরী ভূমিকা রাখার বিষয়টি সঠিক ভাবে উপলব্ধি করেছেন। তিনি বিষয়টি পর্য্যালোচনা করে উপলব্ধি করেছেন যে, বস্তু খাজনা থেকে ভূমিজাত উৎপাদকে নগদ খাজনায় পরিণত করার "প্রক্রিয়া প্রণালী হাসিল করতে পারে জমির মালিক নিজে। গ্রাম্য সুদখোর থেকে বড় ব্যাংকার অবধি বিভিন্ন ধাপে বণিকের এবং সুদখোর পুঁজি, খাজনা-প্রাপ্যরা এবং কর-সংগ্রহ পরিচালন কর্মযন্ত্র (একেবেও সম্প্রদায়ের প্রধান থেকে শুরু করে অঞ্চল প্রধান এবং খোদ সর্বোচ্চ শাসকেরা অবধি)। মনে হয়, বস্তু-খাজনাটাকে বাজারে নগদ টাকায় পরিণত করার কাজে কোন-না-কোন ভাবে সাধারনত অংশ গ্রহন করত জনসমষ্টির এই সমস্ত অংশই, তবে কৃষিজাত দ্রব্যর বিপণনে এইসব অংশের প্রত্যেকটার হিস্সা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন এলাকায় বদলে যেত।" ২

"প্রকৃত পক্ষে শেরশাহ এবং আকবরের চালু করা সংস্কারগুলো এসেছিল কর নগদে পাবার প্রয়োজন থেকে। তাতে সর্বোত্তম বিবেচিত হতো যখন সেটা আসত কর দাতার নিজ হাত থেকে এবং অন্তত কর যখন স্থানান্তরিত হত রাজকোষের অধঃস্তন স্তর গুলো থেকে কেন্দ্রীয় স্তরগুলিতে।

১। পাভলভ, ভ,ই, ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ -২০৪

২। প্রাগুক্ত। পৃ - ৫০-৫১

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি কর সরাসরি নগদে আদায় করা আরও বেশী কঠিন ছিল, তার কারণ গ্রাম্য করদাতার—কৃষক কিংবা ছোট আর মাঝারি সামন্ত-ধরণের ভূস্বামী-অর্থনীতি ছিল আপকে ওয়াস্তে ----।" ১

যে ভূমির মালিক নিজে সরাসরি ভূমি কর দিতে পারত তাকে রায়ত হিসবে উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারনত প্রচলিত ছিল যে, রায়ত বলতে বোঝায় 'ভূমিকরদাতা কৃষক'। কিন্তু পাভলভ প্রত্যক্ষ করেছেন যে, 'রায়ত' বর্গের অনুর্ভুক্ত হচ্ছে সেই সব ভূমিমালিক যারা প্রধানত গ্রামের নিচের স্তরগুলি থেকে চুক্তিপত্র দিয়ে আবদ্ধ মজুর দিয়ে অর্থনীতিক ক্রিয়াকলাপ চালাত সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে, কিংবা যা-ই হোক যারা ছিল সম্প্রদায়ের এবং সেটার কর্তৃপক্ষের উপর-স্তরগুলোর মানুষ।" ২

এই উপর স্তরের গ্রামের রায়ত কৃষকদের অধস্তনদের যেমন শোষণ করতো তেমনি তারা নিজেদের অধিকার বজায় রাখার জন্য উপরওয়ালাদের সাথে লড়াইও করত। ফলে মোট রাজস্ব কেন্দ্রে কখনই পরিপুর্ণ উসুল হতনা। জমিদারা সমগ্র আদায়কৃত খাজনা রাজকোষে জমা দিত না এবং গ্রাম প্রধানরা নিজেরাও রায়তী স্বত্ব ভোগ করার কারণে খাজনা থেকে মধ্যস্বত্ব উপভোগ করত।" বাংলায় ভূমি-কর কৃষক নিজেই দিত জমিদারের খিদমত করা ছাড়াই, এমনটা ধারনা করা বাস্তবিকই কঠিন। শেষে, এক্ষেত্রে রায়তদের মধ্যে পড়ত পারত শুধু প্রধানেরা, যারা কর জমা দিত গোটা গ্রামের তরফে, কেননা পৃথক পৃথক কৃষকের দেয় কর ছিল এক সোনার মহরের কম। আরও পরেকার মাল মশলার ভিত্তিতে, আমি দেখতে চাই। 'রায়ত-সংএশন্ত ধারনাটার মধ্যে পড়ত বাংলায় সম্প্রদায়ের খুবই বিভিন্ন অংশ। যা-ই হোক, ষোল শতকের শেষের দিকে বাজারে সঙ্গে এখন যথেষ্ট যোগাযোগ ছিল যার ফলে ভূমির সাধারন প্রজারা নগদান-কর দিতে পারত, এমনটা সাব্যস্ত করার মতো কোন পাকাপোক্ত প্রমাণ

১। পাভলভ, ভ,ই," ভারতে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ -৫২

২। প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

কোন দিক থেকেই পাওয়া যায় না আইন-ই-আকবরীর উল্লিখিত রচনাংশে । প্রকৃত পক্ষে, এমনকি অনেক পরেও -দুই শতাব্দী পরে-তাদের এবং কর-সংস্থার মধ্যে বহু মধ্যস্থ গ্রন্থি দেখা যায় " । ১

যদিও সুনির্দিষ্ট হারে খাজনা আদায় করার কথা তবুও অতিরিক্ত আদায় একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল । তাছাড়া পেটেল বা গ্রামের মোড়ল নিজের জমির কর সবটা দিত না । যেমন মহারাষ্ট্রে কর উদ্বৃত্ত-উৎপাদ আদায় এবং ভোগ-ব্যবহার করার বিষয়ে গ্রামের প্রধানদের বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল । এই ভূমিকা পালন করার ক্ষেত্রে সে রায়তকে শর্তাবদ্ধ করতে এবং তার জমি-বন্দ হস্তগত করতে পারত । এবং " রায়তের কাছ থেকে উপরি আদায় করার ফাঁক বের করতে পারত পেটেলরা ।" ২

গ্রাম্য মোড়লরা প্রধান হিসেবে উপরি ও গোপন আত্মসাত করা উপার্জনের মাধ্যমে নিজেদের উপর যে কেন্দ্রীয় শোষন ছিল তা বহুলাংশে উসুল করতে পারত এবং নিজেদেরকে কর ইজারাদারী, বেগার ও সুলভ মজুরীতে গ্রাম্য ভূমিহীনদের উৎপাদন কাজে ব্যবহার করে যে মুনাফা করত তার মাধ্যমে সমৃদ্ধতর করত এবং এমনিভাবে গ্রামের মধ্যে স্থায়ী অবস্থাপন্ন কৃষক হিসেবে জেকে বসার সুযোগ নিতে পারত । তাদের এমোন্নতির বিষয়ে বিস্তারিত কোথাও বলা হয়নি মূলতঃ দৃষ্টিভঙ্গি গত অবস্থান এবং তৎপ্রেক্ষিতে বাস্তবতার সাথে ব্যবধানের কারণে । পাভলভ বিষয়টি উপলব্ধি করেছেন । তিনি বলেছেন, " পেটেলের সমৃদ্ধির বিভিন্ন দফা হল - কর থেকে কাটান, নিজ খামার থেকে আয়, আর চোটার সুদ । পেটেল কখনও ছিল প্রধানত কর-সংস্থার এজেন্ট, ভূমি-মালিক, কিংবা সুদ-খোর, সেটা স্থির করা ঐ কারণে কঠিন । তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, যার ছিল মোটামুটি বৃহদায়তনের জোত জমা এমন ভূমি-মালিক হিসেবে, আর বীজ এবং গবাদি পশুর জন্যে ঋণ দিয়ে সাধারন কৃষকদের আর্থনীতিক

১। পাভলভ, ভ, ই, " ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত " প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ ৫৪

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ৫৪-৫৫

Dhaka University Institutional Repository

জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ । তাই সম্প্রদায়ের কারিগরদের অবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করত পেটেন্টের উপর - সেটা সরাসরি (যখন তারা কাজ করত তার জন্যে) কিংবা পরোক্ষে (যখন তারা কাজ করত সাধারন কৃষকদের জন্যে) ।" ১ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয়তই গ্রাম্য পাতিসামন্ত শ্রেণীর সুবিধা আদায় ও ভোগের (সম্পদ ও সেবা) সুযোগ ছিল ।

গ্রাম প্রধানদের কর ইজারাদারী ব্যবস্থা পাকা পোক্ত হয়ে উঠে মুঘল আমলেই এবং বৃটিশ আমলে পরিণত অবস্থা প্রাপ্ত হয় । কর ইজারাদারী এক ধরণের সামন্ত শোষণের রূপ পরিগ্রহ করে । শহরে ইজারাদারী সুদখোরী মহাজনের ভূমিকা পালন করলেও গ্রামে তার সামাজিক ভূমিকা ভিন্ন রূপ নেয় । সেখানে নিছক সুদখোর হিসেবে প্রতিপন্ন না হয়ে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার গুরুত্বপুর্ণ অঙ্গ হয়ে দাড়ায় । " যেখানেই কর-ইজারাদার এবং তার গোমস্তা ভূমি-কর আদায় করত সেখানে মহাজনকে খামারীর দেওয়া সুদটা যেন না হয়ে দাড়াত খাজনা করের মতো, এবং একদিক থেকে সেটা ছিল যেন রূপান্তরিত খাজনা - কর (সেটা একটা স্বতন্ত্র উপাদান হয়ে দাঁড়াত যা শেষে প্রতিপন্ন হয় বৃটিশ আমলে) । " ২

এইভাবে কর ইজারাদার ও খাজনা প্রাপ্তারা উৎপাদকে বাজারে চড়ামূল্যে বিক্রি করার সুযোগ দ্বিত পণ্যে পরিণত করে । কেননা মূল উৎপাদক পণ্যে পরিণত করার সুযোগ পেত না উদ্বৃত্তকে তাদের নিজেদের কাছে রাখতে পারার ও বাজারজাত করার অসামর্থের কারণে । কেননা সম্প্রদায়গত বিনিময়ের পরে খাজনা ও কর ইজারাদার সুদখোর মহাজনের পাওনা বিটিয়ে কৃষক তার কাছে অবশিষ্ট কিছুই রাখতে পারত না । ফলে পণ্য বেচাকেনার অংশগ্রহণ থেকে তারা বঞ্চিত হত এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের চড়া দাম তাদের জন্য কোন সৌভাগ্য বহন করত না । সম্প্রসারিত

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৫৫

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ৫৭

Dhaka University Institutional Repository

পুণরুৎপাদন থেকে সে বঞ্চিত হত ।

গ্রাম সম্প্রদায়ের মধ্যে পাতিসামন্ত শ্রেণী দানা বেধে উঠার কয়েকটি ঐতিহাসিক শর্ত মুঘল আমলে সৃষ্ট ও অনুশীলিত হয়েছিল । সামগ্রিক গ্রামীণ উৎপাদের একাংশ পণ্যে পরিণত হওয়ার সময়েই মধ্যসুত্বভোগী হিসেবে পাতিসামন্ত শ্রেণীর সদস্যরা সুবিধা ভোগ করত । কর ইজারাদার হিসেবে ভূমিকা পালন করত নগদ টাকায় রাজকোষে কর প্রদানে সমর্থ ভূ-সম্পত্তির স্বাধীন মালিক শ্রেণী বা গ্রাম্য মন্ডল গোষ্ঠী । মুঘল আমলে এমনকি "আঠার শতকে এবং উনিশ শতকের গোড়ার দিকেও জমির প্রজারা সাধারনতঃ সরাসরি করইজারাদারকে কর দিত বস্তুতে কিংবা মহাজনের কাছ থেকে ধার করা নগদ টাকায়, সেই মহাজনকে তারা পরে দিত তাদের ফসলের একাংশ-।''১

এই মধ্য সুত্বভোগীরা কর ইজারাদারী এবং সুদখোর মহাজনী বা বেগার খাটিয়ে নিস্কর ভূমিতে উৎপাদন করে অতিরিক্ত সুবিধা ভোগের মাধ্যমে সম্পদশালী হতে থাকে এবং নিজেদের মালিকানা সত্ব পাকাপোক্ত করতে থাকে । একই সাথে লংঘিত হতে থাকে সম্প্রদায়গত মালিকানা এবং এখতিয়ার । কিন্তু পণ্যে পরিণত হওয়ার জন্য সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয় নি । কেননা এই উৎপাদন প্রণালীর বিশেষত্ব ছিল জীবনীয় ভিত্তিক অর্থনীতি । এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, উদ্বৃত্ত উৎপাদের পরিণতি কি হত ? প্রাভলভ বিষয়টির সহজ জবাব দিয়েছেন, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় মালিকানা, উপসত্ব ভোগের প্রকৃতি এবং গ্রাম সম্প্রদায়গত শোষণ বঞ্চনার ফলশ্রুতিতে জীবনীয়ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো দরিদ্রসীমার নীচে বন্টনের হারের বিশ্লেষণ করে । তিনি বলেছেন, "ভূমিতে রাষ্ট্রিক মালিকানা এবং সম্প্রদায়গত সংগঠনের প্রাধান্যের আমলে উদ্বৃত্ত-উৎপাদ পণ্যে পরিণত হত প্রধানত

১। প্রাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

রাষ্ট্রের খাজনা-করের মাধ্যমে, কিন্তু ভূমিতে মালিকানা সত্ব মজবুত হয়ে ওঠার সঙ্গে কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদের একাংশ নজরানা কিংবা ভূমি-খাজনা হিসেবে পেয়ে সেটাকে বস্তু আকারেই সরাসরি ভোগ-ব্যবহার করত বড়-বড় সামন্ত ভূ-স্বামীরা, আর-একটা অংশকে বিনাসদ্রব্যে এবং অন্যান্য ভোগ্য উপকরণে পরিণত করা হত তাদের জন্যে, বাদ বাকিটা হতো কারিগরদের পারিশ্রমিক। এইভাবে ভূমি খাজনার যে-অংশটা স্থানীয় ভূমি-মালিকেরা পেত সেটা বেড়ে চলার ফলে শুধু তাতেই অর্থনীতির জীবনীয় ভিত্তি অপসারিত হয়নি। সেটাই বোঝাই যায়, কেননা উন্নয়ন তখনকার মত সামন্ত-তান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর চৌহদ্দি ছাড়িয়ে যায়নি, এই প্রণালীর বিশেষক ছিল জীবনীয় ভিত্তিক অর্থনীতি। তার সঙ্গে সঙ্গে, খাজনায় স্থানীয় ভূমি-মালিকদের হিস্সা বেড়ে চলার ফলে সেটার বন্টন আর ভোগ-ব্যবহার গণ্ডিবদ্ধ হয়ে যেত কৃষির উদ্বৃত্ত-উৎপাদ যেখানে পয়দা হতো সেই এলাকায়, আর সেটা হতো চার পাশের হস্তশিল্পের সঙ্গে বিনিময়ের তহবিল।" ১

গ্রাম সম্প্রদায়ের মোট উৎপাদকে, উদ্বৃত্ত অংশ ছিনিয়ে নেওয়ার পরে, যেভাবে বন্টন করা হতো তাতে কারিগর ও অন্যান্য কৃষি উৎপাদনে অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি ও সরবরাহকারী ব্যক্তিদের হিস্যা প্রাপ্তির হিসেবেও গ্রাম্য ধনীক শ্রেণীর কৌশলগত উপায়ে অবৈধ উপসত্বভোগের নিয়ম চালু হয়ে যায়। সম্প্রদায়ের সম্পত্তির উৎপাদ কয়েকজন ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হতে থাকে। এবং ফলে চূড়ান্তভাবে বঞ্চিত হয় জীবনব্যাপী গ্রামসম্প্রদায়ের জন্য সেবাদানকারী সরাসরি কৃষিপণ্য উৎপাদনে জড়িত সাধারন শ্রমজীবি ও কারিগর শ্রেণী। গ্রাম্য কারিগর শ্রেণীকে কোনভাবেই উঠতে দেওয়া হয়নি 'গ্রামসম্প্রদায়' আমলে। তাদের দাবিয়ে রাখার জন্য সর্বপ্রকার পন্থা অবলম্বন করা হয়েছিল। যেমন 'পাইসিটা' ও 'ভায়িসা' ভূমির উৎপাদ বন্টনের

১। পাভলভ, ভ,ই, ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত' প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৫৮-৫৯

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবহারিক অনুশীলনগতরূপে দেখা যায় যে, কারিগর শ্রেণী নীতিগতভাবে উৎপাদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বন্টনের প্রকৃত অংশ পাচ্ছে না এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একেবারেই বঞ্চিত হচ্ছে। জেমস্ ফর্বেস - এর একটা বিবরন থেকে জানা যায়, ভূমি মালিকানা মজবুত হয়ে ওঠার প্রিক্রয়াফলে কারিগর শ্রেণী তথা গ্রামসম্প্রদায়ের শ্রমজীবি অংশ বঞ্চিত হচ্ছে নিস্কর জমির উৎপাদ থেকে। তিনি উল্লেখ করেছেন, (জেমস্ ফর্বেসের প্রাচ্য স্মৃতি থেকে ১" পাইসিটা আর ভায়িসা ভূমি নামের বিশেষ কোন-কোন মাঠ প্রত্যেকটা গ্রামে পৃথক করে রাখা হয় বারোয়ারী প্রয়োজনে ----- , এই সব জমির উৎপাদের বেশীর ভাগ আলাদা করে রাখা হয় ব্রাহ্মণ, কাজী, রজক, কর্মকার, ক্ষৌরকার এবং খোঁড়া, অন্ধ আর নাচারদের ভরণ পোষনের জন্যে, তাছাড়া অল্প কিছু জেটুন্নি বা অস্ত্রধারীদের প্রতিপালনের জন্যেও, এদের রাখা গ্রাম রক্ষার জন্যে। ফর্বেস মনে করতেন, পাইসিটা জমির যে ফসল পাবার কথা ছিল ব্রাহ্মণ আর কারিগরদের সেটা জমিদারেরা হস্তগত করল বলে কৃষকদের মস্ত ক্ষতি হল ঐ কারণে" । ১

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন,, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারের হাতে যাবার আগেই এইসব সামন্ততান্ত্রিক ভূ-সম্পত্তির উৎপাদ গ্রাম্য পাতিসামন্তরা ভোগ করত মূলতঃ বহুলাংশে এবং স্বল্প পরিমাণে বারোয়ারী প্রয়োজনে কাজে লাগতো এবং খুবই নগণ্য অংশের আপাততঃ মালিকানা ভোগ করত গ্রাম্য কারিগর শ্রেণী। নিষ্কর ভূ-সম্পত্তির উৎপাদ পাতিসামন্তের কুক্ষিগত হওয়ায় প্রধান শর্ত পালন করতো উৎপাদনের উপায়ের মালিকানা। এই মালিকানা ছিল গ্রাম্য ধনীক শ্রেণীর এবং তারা উৎপাদন কাজে ব্যবস্থাপক হিসেবে অংশ নিত। ফলে উৎপাদ দখলের চলতি নিয়মে ফসলের বেশীর ভাগ তারাই পেত। যেমন কর্বেসের এক বিবরণ থেকে জানা যায় এই সমস্ত বারোয়ারী জমি চাষ করা ও ফসল ফলানোর জন্য যে সব উপাদান প্রয়োজন হত সেগুলির অধিকাংশ ক্ষেত্রে মালিকানা ছিল, সম্প্রদায়গত মালিকানা ছিল খুবই সামান্য। যেমন "তিনি বলেন: লাঙল চষার এবং কৃষির অন্যান্য কাজের গবাদিপশু কখনও কখনও গ্রামের বারোয়ারী সম্পত্তি, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তির সম্পত্তি। পেটেল যোগায় বীজ আর কৃষি কাজের সরঞ্জাম ---" ১ পাভলভ আরও বিভিন্ন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, পাইসিটা জমি (বা নিষ্কর ভূমি) যদিও গ্রাম সম্প্রদায়ের হিসেবে নীতিগতভাবে স্বীকার করে দেওয়া হতো তবুও সিংহভাগ উৎপাদ ভোগ করতো গ্রাম্য পাতি সামন্ত শ্রেণী। পাভলভ একটি আকর তথ্য গ্রন্থ 'Selections of papers from the house' records at the East India/ থেকে একটি কর সংক্রান্ত বিবরনের মর্মসার উদ্ধৃত করেছেন যেখানে পাইসিটা ভূমির ব্যবহারিক উপসত্বভোগের বিষয়টি সুন্দরভাবে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, "------পাইসিটা জমি সম্বন্ধে আরও স্পষ্ট বর্ণনায় সেটাকে বলা হয়েছে প্রত্যেকটা গ্রামে, "বিভিন্ন রকমের কারিগরদের ভরণ পোষণের জন্যে পৃথক করে রাখা জমি। যাজক, সম্প্রদায়ের চাকরবাকর আর জেলার

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৬২

Dhaka University Institutional Repository

কর্মচারীদের জন্যেও ব্যবহৃত হত সেই জমি । কোন জেলায় এমন জমির মোট পরিমাণ ছিল ৩৬,৫৬৩ বিঘা অবধি । 'সুএধর, কর্মকার, কুম্ভকার, দরজি,রজক, ক্ষৌরকার, মুচি, চর্মকার, গ্রামের এইসব কারিগরের দখলে থাকত তার থেকে ৫,১৯০ বিঘা মাত্র । সম্প্রদায়ের চাকর বাকরের (ভিল,জেইর, ইত্যাদি) দখলে থাকত ঢের বেশী জমি - ১৪,৩৮০ বিঘা, আর এই রকমের জমির বাদবাকিটা থাকত সরকারী কর্মী-কর্মচারী এবং যাজক আর মসজিদের দখলে, অর্থাৎ বস্তুত সেটা ছিল নিস্কর সামন্ততান্ত্রিক ভূমি সম্পত্তি । কাজেই দেখা যাচ্ছে, ঐ রকমের জোত জমাগুলেরও নগণ্য অংশমাত্র ছিল কারিগরদের । " ১

সামাজিক শ্রমবিভাগের ফলে কারিগর শ্রেণীকে অস্বীকার করার উপায় ছিল না গ্রামসম্প্রদায়ের অধিকর্তাদের, তেমনি আবার তাদেরকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে দেয়া হত না । পারিশ্রমিক হিসেবে উৎপাদের যে অংশটা দেয়া হত তাতে তারা তাদের দক্ষতা বজায় রেখে শুধুমাত্র খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারত । কখনই সঞ্চয় করতে পারত না । বুকানন উল্লেখ করেছেন, (তন্তুবায়ী কারিগর সম্বন্ধে) "এই শ্রেনীর তন্তুবায়রা গরীব, তারা বলে স্বাধীনভাবে কাপড় তৈরী করার সাধ্য তাদের নেই । তারা সাধারনতঃ সুতো পায় কাছাকাছি এলাকায় মেয়েদের কাছ থেকে, আর মজুরী নিয়ে সুতো দিয়ে কাপড় বুনে দেয় , -----" ২

বুকাননের উল্লিখিত অংশটি একটি উদাহরণ হিসেবে নেয়া যায় । গ্রামসম্প্রদায় উৎপাদন অব্যাহত রাখার জন্য কারিগর শ্রেণীকে যেমন বাঁচিয়ে রাখত তেমনি তাদের সমৃদ্ধির পথও বন্ধ করে রাখতো । কারিগত শ্রেণীর সারা বছরের কাজের মজুরী বাবদ প্রাপ্তির একটা হিসাব উদাহরণ স্বরূপ আলোচনা করা যেতে পারে । এতে দেখা যাবে কারিগর শ্রে ী শুধু মাত্র বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় পরিমাণটাই পেয়েছে ।

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৬৩

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ৬৬

Dhaka University Institutional Repository

তারা অতিরিক্ত কিছুই পায় নি । ফলে সঞ্চয় ও পুনরুৎপাদনে নিয়োগ বা উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ও উন্নয়ন সম্ভব হয় নি । যদিও মালিকানা নীতিগতভাবে সমাজে চালু ছিল । কিন্তু ব্যবহারিক দিক দিয়ে যেন সমগ্র গ্রাম সমাজ বা গ্রাম্যঅধিপতিরা গ্রামের কারিগরদের সকল প্রকার উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা ভোগ করতেন । নিম্নোক্ত উদাহরণে উপসত্বভোগীদের অংশও দেখানো হয়েছে ।

গ্রাম সম্প্রদায়ের মোড়ল, চাকর আর কারিগরদের বার্ষিক পারিশ্রমিকের পরিমাণ :- ১

		বার্ষিক পারিশ্রমিক	
	হকদারদের নাম	সের হিসাবে	কিলোগ্রাম হিসাবে
১।	পেটেল (মোড়ল)	১০০	৬৮০
২।	কুলকার্নি (কর্মচারী)	২৮৪০	২১৬০
৩।	ছুতার (সুএধর)	২০০০	১৫২০
৪।	লোহার (কর্মকার)	১৮০০	১৩৬০
৫।	কুম্ভকার (কুমোর)	১৩৪০	১০২০
৬।	নাউয়ি (ক্ষৌরকার)	১৩৪০	১০২০
৭।	পুরীত (ধাপা)	১৫০০	১১৪০
৮।	ভাট (চাকর)	১০০	৬৮০
৯।	গুরু (মন্দিরের চাকর)	১০৪০	৭৮০
১০।	মৌলানা (শিক্ষক)	১০০	৬৮০
১১।	সোনার (সেকরা)	৭৪০	৫৬০
১২।	ভীল (চৌকিদার)	১০০	৫৮০
১৩।	কুলি (ভিশতিওয়ালা)	১০৪০	৭৮০
১৪।	মাং (চাকর)	৭৪০	৫৬০
১৫।	মুহার (চাকর)	৪৭০০	৩৬০০

১। পাভলভ, ভ, ই, "ভারতের পুঞ্জিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৭১

Dhaka University Institutional Repository

সাধারনভাবে হকদারদের জন্যে এবং বিশেষভাবে কারিগরদের জন্যে রায়তরা তাদের ফসলের যে-অংশটা কাটান দিত সেটার হিসাব করে দেখা যায় মোটামোটি ৫·২৫ টন পড়ত চার রকমের কারিগরদের (লোহার, সুএধর, চাম্ভার আর কুম্ভকার) ভাগে । পরিমাণটা খুব কম মনে হলেও পারিশ্রমিকের এই ব্যবস্হার গ্রাম্য কারিগরদের কোনমতে বেচে থাকার জন্য জীবিকা নির্বাহ চলত । (এই আর্থ-সামাজিক অবস্হা অনেকে মনে করেন, শহরে কারিগরদের চেয়ে কিছুটা নিশ্চিত-নিরাপদ অবস্হায় ছিল । সেই অর্থে ভাল । " ---১

"Manorial কর্মী সমষ্টির মধ্যে যেসব কারিগর ছিল তাদের অবস্হা সমন্ধে আরও বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে । অপেক্ষাকৃত অধঃস্তন প্রশাসনিক কর সংস্হা মৌজাকে বুকানন Manor নাম দিয়েছেন, মৌজার প্রধান ছিল মুকাদ্দাম । (বিহারে ঐ মুকাদ্দামকেই জমিদার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে বলে বুকানন মনে করতেন ।) মৌজা শব্দটির প্রচলিত অর্থ গ্রাম , কিন্তু উনিশ শতকের গোড়ার দিককার সরকারী পরিভাষায় মৌজার অর্থ ছিল গ্রাম সম্প্রদায়, যেটার কাজ ছিল একটা অধস্তন রাজস্ব-সংগ্রহ সংস্হা (বিভিন্ন খামারের সমষ্টি, অর্থাৎ রায়তদের জোতজমাগুলোর সমষ্টি, যা হলো একটা জমিদারী), সেটার প্রধান ছিল মন্ডল (মোড়ল) ।

বাংলায় আর পূর্ববিহারে (পূর্নিয়ায় আর আগলকোর্টে) গ্রাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মচারীদের কিভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হত সে বিষয়টাকে বুকানন বার বার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কর্মকার, সুএধর কিংবা চর্মকারদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি কখনও ।" ২

কম সম্পদের অধিকারী এবং এমনিতেই দরিদ্রতর হওয়ার ফলে কারিগর শ্রেণীর একাংশ সামাজিকভাবে পতিত হতে শুরু করে । গ্রাম্য পাতিসামন্ত শ্রেণী শোষণের পরিমাণ বাড়ানোর সাথে সাথে কর্মবন্দেজে কারিগর শ্রেণীকে জন্মসূত্রে বেঁধে ফেলে এবং

১। পাভলভ, ভ,ই, ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৭০-৭১

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়গত মানবিক ঐক্য বিনষ্ট হয় । যদিও গ্রাম সম্প্রদায়ের আর্থনীতিক যোগসূত্র বজায় থাকে । কোন কোন এলাকাতে অধঃপতনের হার খুব বেশি বেশী না হলেও বাংলায় খুবই প্রকট হয়ে দেখা দেয় । বুকাননের উদ্ধৃতি দিয়ে পাভলভ বলেছেন, " বাংলায় সম্প্রদায় সম্বাস্থ যোগ সূত্রগুলি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়, আর কৃষিক্ষেত্রে মেহনতি জনসমষ্টির অধিকাংশের ঘটে সামাজিক আর্থনীতিক অবনতি, এই সব প্রকাশ পায় স্থানীয় কারিগরদের অবস্থার মাঝে - এরা কাজকর্ম করত ঐ জন সমষ্টির জন্যে । ঠিক বটে বুকানন নিশ্চয় করে বলেছেন বাংলায় কর্মকার, সূত্রধর, তন্তুবায় আর ক্ষৌরকারেরা ' বিশুদ্ধ জাতের মানুষে যা বর্তায় সেই মর্যাদা পেয়েছিল' কিন্তু পরে পৃথক পৃথক জাতের কারিগরদের প্রতিষ্ঠা সম্মন্ধে আরও বিস্তারিত খাঁচ-বিচার করার সময়ে তিনিই বলেছেন, কোন-কোন শাখা-জাতের সূত্রধর আর তন্তুবায়দের এবং কলুদেরও ' অশুচি' বলে গণ্য করা হত " ১

বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য কারিগর শ্রেণীর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী পর্যায়ে থাকলে বুকানন দেখেছিলেন, পশ্চিম ভারতীয়দের সামাজিক শ্রেণী বিন্যাসের যে পর্যায়ে কারিগর শ্রেণীর অবস্থান ছিল বাংলাদেশে তার চেয়ে নীচের স্তরের ঐ একই জাতীয় কারিগর শ্রেণীর অবস্থান ছিল ।

কারিগর শ্রেনীর সামাজিক অবস্থান নীচে নামিয়ে দেয়ার কারণে সমাজের উপরের শ্রেণীর মর্জির উপর এদের পারিশ্রমিক পাওয়ার পরিমাণ নির্ভর করত । ন্যায্য পাওনা আদায় কখনও সম্ভব হতনা । কারিগর শ্রেনী তাদের অংশ সাধারন কোন এক নিয়মে নিতে পারত না । সামাজিক মর্যাদা অনুসারে তাদের হিস্যা যেমন ভিন্ন হত তেমনি কৃষিজ উৎপাদনে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদির (বিনিময় ক্ষেত্রে পণ্য)

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুসারে হিস্যার পরিমাণে পার্থক্য থাকতো। তাছাড়া আদায়ের নিয়ম সব জায়গায় একই রকম ছিল না এবং একই স্থানে ব্যক্তি বিশেষে ঋতু বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিত। তবে যতদূর মনে হয় মোট বাৎসরিক দেয় ভোগ্য পণ্যের ও অর্থের পরিমাণ জীবনীয় ভিত্তিক পরিমালের সমান ছিল। ভূমি সত্ত্বাধিকারী এবং বিভিন্ন বর্ণের কারিগরদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে পণ্য আদান প্রদানের একটা সহজ বিবরণ পাওয়া যায় জেমস গ্রান্টের এক প্রতিবেদনে। তিনি বলেন, "কৃষিকাজের সরঞ্জামের সমস্ত কেঠো অংশ মেরামত করা তার (ছুতার বা কার্পেন্টার) কাজ, তাতে কৃষকদের কোন খরচ নেই, সে জন্যে সে পায় ইনাম-জমি আর বস্তু-বুল্লুটি তোলে, এই আদায় একেবারে অনির্দিষ্ট, নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট গ্রামের রেওয়াজের উপর, এই রেওয়াজ খুবই বিভিন্ন। এই আদায় করা হয় প্রত্যেকটা ফসলের বেলায় দু'বার-শস্য কাটা আর গাদা করার সময়ে, আবার সেটা মাড়াইয়ের সময়ে, তেমনি আবার, যে কোন কাজ শেষ হলে সুএধর সাধারণত বকশিস পায় অল্প পরিমাণ শস্য, আরও কৃষিকাজের সরঞ্জামের সঙ্গে যা সংশ্লিষ্ট নয় এমন কাজে লাগানো হলে সুএধর পায় প্রচলিত মজুরী। ----- লোহার বা কর্মকার লোহা দিয়ে গড়া অংশ তৈরী এবং মেরামত করে, তার বাবত সে পায় সুএধরের মতোই। ---- চামার বা চর্মকার আর মুচি দাম নিয়ে গ্রামবাসীদের জুতো এবং জল বইবার মশ্ক বা চামড়ার থলি (ভিশতি) দেয়, কিন্তু সেগুলো মেরামত করে নিঃখরচা। ষাড়ের জন্যে চাবুকের চামড়ার ফালিও সে যোগায় এবং গ্রামের মুশালের কাজ করে, এই সব বাবত সে ইনাম জমি ভোগ করে এবং বুল্লুটি পাওনা তোলে।" ১

কারিগর শ্রেণীর সামাজিক মর্জাদা নির্ধারণের সাথে পাওনা ও পারিশ্রমিক আদায়ের সম্পর্ক ছিল। সামাজিক মর্যাদা উৎপাদিত পণ্যের গুণ-মান ও পরিমানের সাথও সম্পর্কযুক্ত ছিল। মর্জাদা অনুসারে প্রাপ্তির পরিমান বিভিন্ন ছিল। আর,এন, গুজ্জনের এক প্রতিবেদনে দেখা যায়, "গ্রাম্য কারিগরেরা আর কর্মচারীরা পারিতোষিকের

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৬৬-৬৮

Dhaka University Institutional Repository

পরিমান অনুসারে তিন বর্গে (মুসলমানি নাম - 'ওলি' বা খাস') বিভক্ত ছিল। প্রথম বর্গে ছিল ছুতার, লোহার, চাম্বার আর মুহার, দ্বিতীয় বর্গে - কুম্ভকার, নারী পুরিত আর নুহার, তৃতীয় বর্গে - ভাট, গুরু, মৌলানা আর মুহার। আবাদ-করা জমির প্রতি ইউনিট বাবত বিভিন্ন বর্গের লোকে উৎপাদের কত ইউনিট পেত সেটা এই রকম,। প্রথম বর্গ - ৩০, দ্বিতীয় বর্গ - ২৫ আর তৃতীয় বর্গ - ২০। এই উৎপাদ পেটেল দিত খামারীর গাদা থেকে - যে কোন এক পক্ষের (অর্থাৎ কারিগর কিংবা চাকর) আবেদন অনুসারে।" ১

সাধারনভাবে খামারীর মোট কৃষি উৎপাদের উপর আনুপাতিক হারে দাবী অনুসারে গ্রাম্য কারিগর ও অন্যান্য দাবীদাররা যে পরিমান ফসলের দাবী করতে পারত তার একটা সাধারন হিসাব পূর্বোক্ত সারণির বিবরন থেকে পাওয়া যেতে পারে।

যদি ধরে দেওয়া যায় যে, ৩০০ হেকটর জমিতে তুলো, তৈলবীজ এবং তরকারীর ক্ষেত বাদ দিয়ে ২৫০ টন ফসল ফলত এবং বীজের জন্য কাটানের পর ১৯০-২০০ টন মজুত থাকত তবে ৫·২৫ টন পড়ত চার রকমের কারিগরদের (লোহার, সুএধর, চামার এবং কুম্ভকারদের) ভাগে। অর্থাৎ কৃষি কাজের উৎপাদী প্রয়োজন মিটিয়ে কারিগরেরা পেত তিন শতাংশ মাত্র। এই তিন শতাংশই প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় খামারীরা তাদের কাজের সরঞ্জাম পুনরুৎপাদনের জন্য ব্যবহার করত। এই তিন শতাংশ বাদ দিলে ৭-৮ শতাংশ পেত অন্যান্য হকদার যার মধ্যে গ্রামের মোড়ল বা পেটেল সব সময়ই বড় একটা হিস্যা নিয়ে থাকত। যেটাকে উদ্বৃত্ত আত্মসাৎ হিসেবে উল্লেখ করা চলে। ২

অনেক ক্ষেত্রে কারিগর শ্রেণী এই তিন শতাংশও পেত না। কোন কোন ক্ষেত্রে এতই কম পেত যে, মৌলিক হিস্যাদারদের সাথে তুলনা অর্থহীন হতে পারত।

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৬৯

২। প্রাগুক্ত। পৃ - ৭০-৭১

Dhaka University Institutional Repository

যেমন বাংলায় এবং বিহারে জমির উর্বরতা শক্তি অত্যন্ত বেশী ছিল বলে কৃষি সরঞ্জাম বাবত খরচ খরচা কম পড়ত, ফলে খাজনা ভোগীরাই শুধু নয়, কৃষকদের হাতেও কৃষিজাত দ্রব্য সামগ্রীর পরিমান যেত বেশী। অর্থাৎ কারিগর শ্রেণীর হিসসা কমত। ফলে চারটে কারিগর শ্রেণীর জন্যে সম্প্রদায় মধ্যে যে পারিশ্রমিক ব্যবস্থা ছিল সেটা অর্থহীন হয়ে পড়ত। অর্থাৎ কোন রকমে গ্রাম্য কারিগর শ্রেণী পরিমিত আয়ের মানে জীবিকা নির্বাহ করত। এমনকি মানবেতর পর্যায়েও তারা জীবন ধারন করত। তবে সব এলাকায় কারিগর শ্রেণীর অবস্থা এমন খারাপ ছিলনা - যেমনটি ছিল বাংলায়। তৎসত্ত্বেও এই উৎপাদন ব্যবস্থা বহুকাল যাবত টিকে ছিল এশীয় কর্মবন্দোজের কাঠামোতে, যা ছিল অনড়, অচল। " এ প্রসঙ্গে কার্ল মার্কস লিখেছেন : গোটা কর্মবন্দোজে প্রকাশ পায় প্রণালীবদ্ধ শ্রম বিভাগ, কিন্তু সেই রকমের শ্রম বিভাগ ম্যানুফ্যাকচারে অসম্ভব, কেননা কর্মকার, সূত্রধর ইত্যাদি যে - বাজার পায় সেটা বদলায় না, আর গ্রামের আয়তন অনুসারে প্রত্যেকটাতে থাকে একজনের বদলে দুই কিংবা তিনজন। সম্প্রদায় মধ্যে শ্রম বিভাগ নিয়ন্ত্রণের নিয়মটা প্রাকৃতিক নিয়মের মতো কর্তৃত্বসহকারে ক্রিয়াশীল থাকে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক কারিগর যেমন কর্মকার, সূত্রধর, ইত্যাদি নিজ কর্মশালায় তার হস্তশিল্পের সমস্ত ক্রিয়াপ্রণালী চালায় চিরাগত ধরনে কিন্তু স্বাধীনভাবে, তাতে সে নিজের উপর কোন কর্তৃত্ব মানে না।" ১

এই অভূতপূর্ব বিচ্ছিন্নতা তাদেরকে যেমন গ্রামীণ উৎপাদ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তেমনি চিরাগত ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের শিকল পরিয়ে দিয়েছিল তাদের গায়ে। ফলে উৎপাদন পদ্ধতির উপর কোন প্রকার অসন্তোষই পরিবর্তনশীল প্রভাব ফেলতে পারতো না। এই পরিবর্তহীনতার সুযোগ নিয়ে মোড়লশ্রেণী তার হিস্যা একনাগাড়ে বাড়িয়ে চলে। একটা পর্যায়ে পাতিসামন্ত শ্রেণী এই কারিগরদের পারিশ্রমিক পুরোপুরি কৃষকদের

১। পাভলভ, ভ,ই,"ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৭৩

Dhaka University Institutional Repository

উপরই ন্যস্ত করে । যেমন বুকানন লক্ষ্য করেছেন যে, গ্রাম্য কারিগরশ্রেণী পারিতোষিক পাওয়ার ব্যাপারে ধর্তব্যের মধ্যেই পড়েনা ।

" বাংলায় আর পূর্ব বিহারে গ্রাম সম্প্রদায়ের বিভিন্ন কর্মচারীদের কিভাবে পারিশ্রমিক দেওয়া হত সে বিষয়টাকে বুকানন বারবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কর্মকার, সুধর, কিংবা চর্মকারদের কথা তিনি উল্লেখ করেননি কখনও । গ্রাম সম্প্রদায়ের সরকারী কর্মীদের পরিতোষিক দেবার ধরন ছিল বিভিন্ন : ভূমি রাজস্বের একটা অংশ (বস্তু কিংবা নগদ), বাধা মাসিক মাইনে আর চাকরান জমি ।" ১ পাভলভ লক্ষ্য করেছেন যে কর আদায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছোট বড় কর্মীদের মধ্যে যেমন, গোমস্তা, কেরানী (পাটোয়ারী) বেনিয়া, পরিদর্শক, দেওয়ান, কোতোয়াল পাহারাদার (পেয়াদা) ইত্যাদিদের নামের সাথে বুকানন কুরুকারের নাম উল্লেখ করেননি । যদিও এই কুরুকার রাজস্বের $\frac{১}{৩২০}$-- অংশ কিংবা তারও কম পেত ।

এভাবে কান পর্যায়ে কর আদায়ের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়ার ফলে গ্রাম সম্প্রদায়ের কতৃত্বকারী শ্রেণী, গোষ্ঠী রাজস্ব সংস্থায় পরিণত হয়েছিল । পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অপেক্ষাকৃত অধঃস্তন প্রশাসনিক কর-সংস্থা ছিল মৌজা। মৌজার প্রধান ছিল মুকাদ্দাম (বিহারে জমিদার) মৌজা শব্দটির প্রচলিত অর্থ গ্রাম । উনিশ শতকের সরকারী পরিভাষায় মৌজার অর্থ ছিল গ্রামসম্প্রদায় । এটি ছিল তৃণমূল পর্যায়ে রাজস্ব আদায়কারী সংস্থা । প্রায় ক্ষেত্রেই এই জাতীয় মৌজা বা গ্রামের প্রধান ছিল মোড়ল ।

এই রাজস্ব সংগ্রহ সংস্থা কারিগর শ্রেণীর ভরণ পোষনের দায় দায়িত্ব কৃষকদের উপর অলক্ষ্যে চাপিয়ে দেয় । পাভলভ বিষয়টা সুস্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন ।

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেছেন, "তবে মোটের উপর উনিশ শতকের আরম্ভ নাগাদ হয়ত আরও অনেক আগেই বাংলায় - এবং অনেকাংশে বিহারেও কৃষি আর হস্ত শিল্পের মধ্যে উৎপাদ বিনিময় নিয়ন্ত্রণের কাজটা গ্রামসম্প্রদায়ে আর ছিলনা। তখন সম্প্রদায় মূলত রাজস্ব-সংগ্রহের সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। সে সব জায়গায় এমন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (ফসলের একটা অংশ দিয়ে কর্মকারের পারিতোষিক) সেখানে সেটা ছিল কৃষক এবং তার সরঞ্জাম প্রস্তুত কারক নির্মায়কের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং গ্রামীণ পরিচালন সংস্থা থেকে স্বাধীনভাবে।" ফলে কারিগর শ্রেণী কোথাও কোথাও নীচে পড়ে সম্পদ ও সামাজিক মর্যাদায়। যেমন বাংলায়, বুকানন বলেছেন, কোন কোন শাখা জাতের সুএধর তার তন্তুবায়দের এবং কলুদেরও 'অশুচি' বলে গণ্য করা হত।" ১

কারিগর শ্রেনীর নিম্নগমন এবং কর আদায়ী পেশাজীবিদের সামাজিক মর্যাদায় উর্ধ্বগমন ঘটেছিল সেই কাল পর্যায়ে। গ্রাম্য পাতিসামন্ত শ্রেণী তাদের আদায় করা করের সবটাই রাজবংশের হাতে তুলে না দিয়ে নানান কৌশলে আত্মসাৎ করতো এবং এভাবে তারা নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। আত্মসাতের সহযুতাকারী হিসেবে কর আদায়ী পেশাজীবিদেরকে অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা দিতে হত। অতিরিক্ত সামাজিক মর্যাদা ছিল উপরি পাওনা। এই প্রক্রিয়া দীর্ঘকাল ব্যাপী চলার ফলে গ্রাম্য কারিগর শ্রেণীর সামাজিক মর্যাদার পতনের সাথে সাথেই করআদায়ী পেশাজীবি শ্রেণী উচ্চতর সামাজিক মর্যাদায় উঠে আসে।

কর আদায়ের প্রতিটা ধাপেই চুরি ও আত্মসাতের ঘটনা ঘটতো। ইরফান হবিব বলেছেন যে, ১৬৪৭ সালে মুঘল সম্রাজ্যের করে ৬১·৫ শতাংশ

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ৭৮

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসাৎ করেছিল ৮ হাজার মনসবদারের মধ্যে মাত্র ৪৪৫ জন - ঐ অংশটা রাজবংশের ভূমি রাজস্বের মধ্যে যায়নি ।" ১

যেখানেই থাক বা যে পর্যায়েই আত্মসাৎ হোক না কেন, গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে মোট কৃষি উৎপাদের ১/৪ থেকে ১/৬ অংশ বেরিয়ে যেত । বাকী ৩/৪ বা ১/২ অংশ গ্রাম্য পাতিসামন্তের নিয়ন্ত্রণে থাকত । যার উপর উৎপাদক হওয়া সত্ত্বেও কৃষক শ্রেণীর মূলতঃ কোন কর্তৃত্ব ছিল না । নিষ্কর ভূমির উৎপাদ আত্মসাৎ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল কারিগর শ্রেণীর সাম্ববাৎসরিক পারিশ্রমিকের বিনিময় হিসেবে নির্দিষ্ট ভূমির বাৎসরিক উৎপাদ আত্মসাৎতের মধ্যে দিয়ে এবং গৃহস্থ কৃষকের উপর করভারের একাংশ প্রকারান্তরে চাপিয়ে বা অধিহারে কর চাপিয়ে ।

কারিগর শ্রেণীর নামে খাস জমি কৃষকদের দিয়ে চাষ করিয়ে উৎপাদিত ফসলের প্রায় সর্বাংশ আত্মসাৎ করে এবং তাদের জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবনীয় সম্পদাদি কৃষকদের ভূমির উৎপাদের মধ্যে চাপিয়ে । যেমন একজন স্বাধীন কৃষক অবশ্যই তার জমিতে কারিগরদের জন্য একাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকত । কারিগর শ্রেণী প্রত্যেকটা জমিতে একফালি পরিমাণ জমির উৎপন্ন ফসল ভোগ করতে পারত । একফালি পরিমাণ জমিতে চারটি সীতা থাকত । এই চার সীতার একফালি, "জমিটা চাষ করে খামারী, আর এই কারিগরেরা প্রত্যেকে আনে শুধু এক - ডালা বীজ, সেটা বোনে খামারী, আর ফসল পাকলে প্রাপ্ত সেটা কেটে নিয়ে যায় " । ২

শুধু বীজ সরবরাহ করা এবং ফসল কেটে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে কারিগর শ্রেণী কোন শ্রম দিতনা । চার সীতার এই স্বল্প পরিমা জমির উৎপাদ ভোগ করে এবং পাতিসামন্ত শ্রেনীর দয়ায় গ্রামসম্প্রদায়ের হাতে যে নিষ্কর ভূমি থাকত তার উৎপাদের একাংশ নিয়ে সমুবৎসরের খোরাকী ও অন্যান্য জীবনীয় দ্রব্য সামগ্রীর

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত, প্রগতি প্রকাশন, ১৯৮৪। পৃ - ৮১

২। প্রাগুক্ত । পৃ - ৭০

Dhaka University Institutional Repository

সংস্থান করত । এতে করে তাদের মধ্যে কেউ বা সঞ্চয় করার সুযোগ পেত । যেমন স্বর্ণকার বা ঐ ধরনের কেউ, যে সম্পন্ন গৃহস্থের কাজ করে দেবার বিনিময়ে মজুরী দিতে পারত । "কৃষি ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রভেদনের অবস্থার এই সম্পর্কের নিছক ব্যক্তিগত প্রকৃতির ফলে কারিগরের পারিতোষিকের সমতা সাধনের ব্যবস্থাটা বদলে গিয়েছিল, এটা ছিল অবশ্যম্ভাবী, সেটা বিভিন্ন নির্দিষ্ট ক্রিয়া প্রণালীর ভিত্তিতে পৃথক-পৃথক ফরমাসের ব্যবস্থা চালু হবার সহায়ক হয়েছিল, তাতে পারিশ্রমিক দেয়া হত কাজের পরিমাণ আর জটিলতা অনুসারে ।" ১ ফলে উৎকৃষ্ট কারিগর জীবনীয় আয়ের অধিক উপার্জন করতে পারত । ফলে তার সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হতে পারত । কিন্তু পাতিসামন্তশ্রেণী সুকৌশলে সঞ্চয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাদেরকে শ্রেণী হিসেবে সামাজিকভাবে দুর্বল করে রাখত ।

ওর্ম - এর লেখা Historical Fragments of the Mughal Empire -থেকে বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যায় কারিগর শ্রেণীর পরাধীন অবস্থা এবং সঞ্চয়হীনতা সম্পর্কে । তিনি উল্লেখ করেছেন, কারিগর ব্যক্তি হিসেবে স্বাধীন ছিল বা বলে তার পুঁজি সঞ্চয়ন আর উৎপাদন সম্প্রসারনের সুযোগ ছিল খুবই সীমাবদ্ধ । তিনি নিশ্চয় করে বলেন : মিস্ত্রি বা কারিগর কাজ করবে জীবন যাত্রার জন্যে যা অত্যাবশ্যক শুধু সেই পরিমাণে । বিশিষ্ট হয়ে ওঠায় তার মহা আতংক । সে নিজ বৃত্তিতে অন্যান্যের চেয়ে একটু বেশী টাকা করছে বলে বেশি নাম হলে ঐ টাকা কেড়ে নেওয়া হবে । কারিগরিতে উৎকর্ষের জন্যে সে বিশিষ্ট হলে কর্তৃপক্ষের কেউ তাকে ধরে নিয়ে দিন-রাত কাজ করতে বাধ্য করবে, তাতে কাজের শর্তগুলো সে স্বাধীনভাবে কাজ করলে সাধারণত যা তার চেয়ে অনেক বেশী কঠোর । এইভাবে নষ্ট হয় পাল্টা দেবার সমস্ত আগ্রহ, সর্বত্র বিদ্যমান যে ভয়, সেটা ছাড়া স্বৈরশক্তির শাসন আর বজায় থাকেনা,

---

১। পাভলভ, ভ, ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ৭৭

Dhaka University Institutional Repository

সেটার মনোবল - ভাঙা ক্রিয়াকলটাকে এশীয় সম্রাজ্যেটার যাবতীয় বিলাস ব্যসন নিবারন করতে পারে নি জাকজমক আর আড়ম্বরের প্রতি সেটার আসক্তি দিয়ে । অল্প কয়েক বছরের কিছুটা অনুগ্র শাসনের ফলে কোন উন্নতি হলে তারপর প্রচলিত শাসন-প্রণালী এসে সবকিছু একেবারে লোপ করে দেয় " ১

কারিগর শ্রেণীর বিকাশ প্রাপ্তি রুদ্ধ হওয়ার কারণে শহরে কারিগর শ্রেনীও কর্মশালাগত উৎপাদনে গুণগতমানে উন্নীত হয় নি । এসময়কালে উন্নত আকারের শহুরে সুশাসন গড়ে ওঠেনি । শহরগুলির স্বাধীনতা ছিল না রাজনীতি ছিল না । ব্যাপারী, মহাজন আর কারিগর এরা সামন্তশ্রেণীর উমেদার মধ্যসত্ত্বভোগী ও দালাল বা ফরমাস খাটা সুবিধাভোগী হিসেবে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা ছাড়া বড় কিছু করতে পারেনি । অবশ্য এ বিষয়ে সিনহা ও পাভলভের মধ্যে দূরত্ব আছে ।

"এন,কে,সিনহা বলেন, বাংলায় বৃটিশ শাসন আরম্ভ হবার আগে শহরগুলিতে সার্বজনীন নাগরিক জীবন ছিল না । খুব বড় - বড় শহরগুলিতেও ছিল খুবই বেড়ে - যাওয়া গ্রামের চেয়ে বড় একটা বেশী কিছু নয় । এসব শহরে যারা থাকত তাদের মধ্যে খুবই কম লোকই সেখানে স্থায়ী বাসিন্দা হবার কথা ভাবত । তারা ছিল স্বল্পকালের শহরবাসী । শহুরে অভিজাত সম্প্রদায় বলে কিছু ছিল না - স্থায়ী বাসিন্দা ধনী বণিক শ্রেণী ছিল না এই সব শহরে । নিগমবদ্ধ শহর ছিল না, শিল্প ক্ষেত্রের লালনাগার ছিল না। শহরে মধ্যশ্রেণীও ছিল না ।" ২

সিনহার উল্লেখিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারাই যারা শিল্পের উপর ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । আধুনিক সমাজে যা তার ঠিক বিপরীতে । এই ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণী শহরগুলিতে গড়ে ওঠেনি । এই কালপর্যায়ে শহরগুলিতে

১। পাভলভ, ভ,ই, "ভারতে পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ১৬২

2. SINHA, N.K. "The Economic History of Bengal. From Plassey to the permanent settlement". Vol.Calcatta 1962 P-149 (অনুবাদ) প্রাগুক্ত । পৃ - ২০৬-২০৭

Dhaka University Institutional Repository

উন্নত ধরনের পুঁজিতান্ত্রিক কর্মশালা গড়ে উঠেনি । ফলে শ্রম বিভাগ অনুপস্থিত ছিল । শহর আর গ্রামাঞ্চলের মধ্যে স্বাধীন পণ্য - বিনিময় ছিল খুবই স্বল্প সংখ্যক প্রধানত ভোগ্য জিনিস (পণ্য)। ফলে পুঁজিতান্ত্রিক সম্পর্ক উদ্ভবের বিস্তৃত ভিত্তি যোগাবার মতো পরিসরে পরিণত হয়নি ভারতের ক্ষুদ্রায়তনের পণ্য উৎপাদন ।

তৎসত্ত্বেও পাভলভ সিনহার সাথে একমত হতে করেননি কোন কোন ক্ষেত্রে ও বিশেষত্বে । তিনি সিনহার সমালোচনা করে বলেছেন, " বাংলার শহরগুলিতে নিশ্চয়ই ছিল স্থায়ী মেহনতী জনসমষ্টি প্রথমত কারিগরেরা । ছিল বিভিন্ন ধনী বণিক পরিবার আর ব্যাংকার পরিবারও যেমন, শেঠেরা - তারা দীর্ঘকাল ধরে ছিল মুর্শিদাবাদের স্থায়ী বাসিন্দা। শহুরে মানুষের স্থানবদল সম্পর্কে সিনহার মন্তব্য প্রযোজ্য হয়ত অভিজাতদের সম্বন্ধে-বিশেষত সামরিক লোক - লস্কর, তাদের পোষ্যবর্গ আর কর্মচারীদের সম্বন্ধে । আর একেবারেই অন্য ব্যাপার হলো এটা ঃ যেমন সারা ভারতে তেমনি বাংলায় বহু শহরে জন সমষ্টির মঙ্গল আর তাই আকার নির্ভর করত বিভিন্ন সামরিক অভিযানের ভাগ্য-পরিবর্তন এবং স্থানীয় শাসক আর হোমরা-চোমরাদের বাড়-বাড়ন্তের উপর " । ১

আমরা মনে হয় পাভলভের মন্তব্যর সাথে সর্বাংশে একমত হতে পারিনে । কেননা উৎপাদন কর্মশালার বিস্তৃতি ও স্থায়ী সংগঠন শহরের প্রাণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণে । এই প্রাণ শক্তির অভাব ছিল বাংলায় ও ভারতেও । ফলে সামন্তবাদের পুষ্টি হয়নি । বড়সামন্ত গড়ে না ওঠার ফলে ক্ষুদেসামন্তরা স্থায়িত্ব পেয়েছিল । কিন্তু সামন্ত সম্পর্ক বিশেষত্ব পেয়েছিল ।

১। পাভলভ, ভ,ই, " ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ । পৃ - ২০৬

Dhaka University Institutional Repository

পাভলভ যেমন বলেছেন, "আঠার শতক নাগাদ ভারতে ভূমি-মালিকানা আর রায়তিস্বত্বের আকার আর উন্নত এলাকাগুলিতে হস্তশিল্পে সামাজিক শ্রমবিভাগ এবং উৎপাদন - সম্পর্ক পৌঁছেছিল উন্নত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বিশেষক মাত্রায়।" ১

সামন্তসম্পর্ক বিশেষক মাত্রায় পৌঁছার পরও সামন্তবাদ দানা বেধে না ওঠার কারণেই পাতি সামন্তবাদ অনুকূল পরিবেশে চিরাগত সম্পর্ককে অবলম্বন করে নিয়ত অস্থির রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে উৎপাদন কর্মশালার বিকাশকে কারিগর শ্রেণীর উপর অমানুষিক শোষণ ও নির্যাতন চালিয়ে রুদ্ধ করে কালব্যাপী পাতিসামন্তবাদের প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। ফলে বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাই ক্ষুদে ভূ-স্বামী তথা পাতিসামন্তদের একচেটিয়া সামাজিক ও রাজনৈতিক দাপট, শোষণ নির্যাতনের অবাধ সুযোগ ও মৌলিক সম্পদের মালিকানা। এই ত্রি-সামাজিক শক্তির একাধিকারে রাখতে সক্ষম হওয়ার কারণে এবং অন্যবিধ সামাজিক শক্তি ক্রিয়াশীল না হওয়ায় এই ক্ষুদে সামন্ত বা পাতিসামন্তদের পতন হয়নি, কাল ব্যাপী স্থায়িত্বে কোন গুণগত পরিবর্তন আসেনি।

১। পাভলভ, ভ.ই, "ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ঐতিহাসিক পূর্বশর্ত" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪। পৃ - ২০৭

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

কার্ল মার্কস সমাজ বিকাশের যে বিবর্তন ধারা আবিস্কার করেছিলেন সেখানে দেখা যায় যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যবস্থার পর শ্রেণী সমাজের আর্বিভাব হয়েছে এবং সেই শ্রেণীসমাজের অর্ন্তদ্বন্দ্বের ফলে একটি সরল একরৈখিক (কিন্তু বহুমাত্রিক) ধারাবাহিক পরস্পর সন্নিহিত সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার বিকাশ হয়েছে। তিনি ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে শ্রেণী দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ করেছেন, তার চরিত্র সন্ধান করে সেই সমাজের শ্রেণী সম্পর্ক সনাক্ত করেছেন এবং উক্ত সমাজের ভিত্তিমাত্রিক নামকরণ করেছেন। সরল সুএবদ্ধ আকারে সেগুলি ধারাবাহিকভাবে সাজালে আমরা পাই এশীয়, প্রাচীন, সামন্ততান্ত্রিক ও আধুনিক বুর্জোয়া উৎপাদন প্রণালী। তিনি উল্লেখ করেছেন, এগুলি অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে প্রগতির সূচক এক একটি যুগ। ১

কিন্তু পরিণত মার্কস তার এই ঐতিহাসিক কালপর্যায়ের সরল ধারা শেষ পর্যন্ত বহাল রাখেন নি। তিনি বিভিন্ন সময়ে আবিস্কৃত নব নব তথ্যের ভিত্তিতে তার চিন্তা ভাবনাকে পরিবর্তিত ও পরিশিলিত করেছিলেন। মার্কস তার পরবর্তী কালের গ্রন্থ Grundrisse -তে যে মতামত রেখেছেন তাতে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর সকলদেশ সমূহের সমাজবিকাশের বিভিন্ন কালপর্যায়ের উৎপাদন সম্পর্কে নিয়ে তারা (মার্কস-এঙ্গেলস) এতদসম্পর্কীয় উন্নততর আবিস্কারকে পূর্ণবিন্যস্ত করেছেন। নূতন বিন্যাসে দেখা যায় ইউরোপের ভূ-মধ্যসাগর এলাকায় কৌম সমাজের পর দাস সমাজের বিকাশ হয় এবং তার পর ঐ সমাজটি আর অগ্রসর হয়নি। এশীয় অঞ্চলে দেখা যায় - কৌম সমাজের পর এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা একবার পাকাপোক্ত ভাবে কায়েম হয়ে বসার পর স্থবির হয়ে যায়। রাশিয়া ও অন্যান্য স্লাভ দেশগুলিতে কৌম সমাজের পর আধা এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা-সমাজটাকে ধীরে ধীরে সামন্ততন্ত্রের দিকে নিয়ে যায়। এখানে সামন্ততন্ত্র পূর্ণ বিকশিত হয়েছিল। ইউরোপে যে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় তার গতি ছিল কৌম সমাজ থেকে সামন্ততন্ত্রের দিকে এবং অতঃপর ধণতন্ত্রে উত্তরণ ঘটেছিল। দাসসমাজ থেকেই সরাসরি সামন্ত সমাজের জন্ম হয়েছে।

১। মার্কস, কার্ল, "অর্থশাস্ত্রের বিচার প্রসংগে" প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩। পৃঃ ১৪

Dhaka University Institutional Repository

তারা উভয়েই মনে করতেন যে, বিকাশের এই বিভিন্ন ধারা ভৌগলিক পার্থক্য ও অন্যান্য বিশেষ কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণে সংঘটিত হয়েছিল । যেমন ইউরোপের সামন্তবাদ যা পরিণামে ধণতন্ত্রী সমাজের জন্ম দিয়েছে । তার জন্ম হয়েছিল যে বিশেষ নির্ধারক ও নিয়ন্ত্রনকারী সামাজিক শর্তের কারণে সেটি হচ্ছে জার্মান ব্যক্তি মালিকানার বিশেষ ধরন ।

এ প্রসঙ্গে Grundrisse -তে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন,

"....the feudal mode of production developed from and is based on the Germanic form of the ownership of Land, therefore, its basis and essence is not the ownership of land by landlords becoming "private property" but private property in land by peasants." 1

মার্কস মনে করতেন ইউরোপে সামন্তবিকাশের প্রধান শর্ত হিসেবে কাজ করেছেন যে ভূমিমালিকানা তা এশীয় সমাজে ছিল না । বাংলাদেশে এবং ভারতেও মুসলমান আমলে পূর্বেকার গোষ্ঠী মালিকানা ছাড়া কোন ব্যক্তিমালিকানা বহাল ছিল না । শুধুমাত্র প্রাচীন প্রথা অনুসারে গ্রামগোষ্ঠীর মতামতের উপর ভিত্তি করে এবং পূর্ণ স্বীকৃতি নিয়ে ব্যক্তি বিশেষ চাষাবাদ করতে পারতেন । এই প্রসঙ্গে এঙ্গেলস তার Anti-Duhring গ্রন্থে বলেছেন যে,

"In the whole of the Orient, where the village community or state owns the land, the very term landed proprietor is not to be found..."2

---

1. TOKEI, FERENC, "Some contentious Issues in the Interpretation of the Asiatic Mode of Production", in Journal of contemporary Asia, Vol-12 No.3 1982.P-301

2. ENGELS, FREDERICK "Anti-Duhring", foreign languages press, eking, 1976. P-225

Dhaka University Institutional Repository

ভারতের ইতিহাস এবং প্রাচ্যের ভূমিতে মালিকানাহীনতা প্রতিষ্ঠা করার কর্মকান্ডে মুসলমানদের অবদানের কথা কার্ল মার্কস খুবই গুরুত্ব দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার পর্যবেক্ষণের ফলাফলে তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছেন যে, মধ্যপ্রাচ্য, ভারত ও এশীয়ার প্রত্যন্ত অঞ্চল যেখানে মুসলমানদের শাসন কায়েম হয়েছে সেখানে ভূমিতে মালিকানার শেষ অবশেষটুকুও উচ্ছেদ হয়েছে। এবং স্বৈরতান্ত্রিক সরকার জমির উপর সর্বময় ক্ষমতায় উপনীত হয়েছে। তিনি বলেছেন,

> "...in the whole of Asia Moslem seem to have first established in principle, property - lessness in land"

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মোঘল বাদশাহগণ ভারতে যে ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন, তা (ইসলামী জগতে) নতুন কিছু ছিল না। যে খেলাফত আমলের প্রথম দিকে বিজিত দেশ ইরাক, সিরিয়া ও মিশরে যে ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় পরবর্তী কালে ভারতেও সেই ব্যবস্থা চালু করা হয়।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) এর আমলে আরবের বাইরে কোনো দেশ জয় করা হলে সেখানকার জমির কর ভূমিব্যবস্থা ও জমিতে জনসাধারনের স্বত্ব এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা হত। এ সম্পর্কে তখন এই মূলনীতি গ্রহণ করা হয় যে, জমির মালিকানা স্থানীয় জনসাধারনের থাকবে, তবে খলিফা "সিরাজ" ধার্য করার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য তিনি মাথাপ্রতি হারে 'জিজিয়া' ধার্য করতে পারবেন। সওয়াদের জমিতে যারা বাস করে, তার স্বত্ব + স্বামীত্ব তাদেরই, তারা ইচ্ছেমত তা বিক্রী করতে বা দখলে রাখতে পারে।" ১

১। হক, এম, আজিজুল "বাংলার কৃষক", বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২। পৃঃ ২০২

Dhaka University Institutional Repository

সম্পত্তিতে ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ বাংলাদেশের সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল । মুসলমান শাসকরা সরাসরি কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতে পারলে সামন্তদের উপর কখনই নির্ভর করা প্রয়োজন মনে করেনি । প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে যারা সামরিক সামন্ত হিসেবে মধ্যস্বত্ব ভোগ করছেন তারা অধিকাংশ সময়েই প্রশাসনিক নিয়মে বদলী হয়ে যাচ্ছেন । ফলে তার ভূমিকা সব সময়ই রাজস্ব আদায় করাই থাকছে । উপনিবেশ শাসন আমলে ইংরেজরা দিল্লীর এই কৌশল ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন । এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে বাংলাদেশের কৃষককুল প্রথমবারের মত সর্বহারা পর্যায়ে উপনীত হয় । এবং এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে বাংলার প্রকৃত অর্থে সর্ব প্রথম পাশ্চত্য অর্থে ভূমি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় । কিন্তু এই জমিদারী ব্যবস্থাও স্থায়ী ছিল না । বাকী খাজনার দায়ে পুরো-জমিদার বা অংশবিশেষ নিলাম হয়ে যেত । ফলে শুধু পুরানো জমিদাররা জমিদারী হারাতে থাকে এবং একধরনের অনুপস্থিত জমিদার সৃষ্টি হয় যারা কলকাতায় বসে ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে সেই নগদ অর্থ দ্বারা নিলামকৃত জমিদারী কিনে নিতে থাকে ।এই ভাবে কেনা বেচার ফলে জমি বাজারী পণ্যে পরিণত হয় । বাংলার জমিদার ও বৃটিশ জমিদার এর মধ্যে তুলনামূলক পার্থক্য চিহ্নিত করে স্যার কোর্টনি ইলবার্ট বলেছেন ------" না, বৃটিশ জমিদার এক জিনিষ আর বাংলার জমিদার অন্য জিনিষ । আমরা তাকে রাজস্ব-দাতা হিসেবে পেয়েছি, এবং তাকে খাজনা-প্রাপক - বানিয়েছি । কিন্তু তার নিজের বা আমাদের চেষ্টায় তাকে বৃটিশ জমিদারের সমকক্ষ করা সম্ভব হয়নি । " ১

কার্ল মার্কস এশীয় সমাজের ব্যাখ্যায় ও বর্ণনায় সামন্তপতিদের অস্তিত্ব স্বীকার না করে যেমন একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ আর্থসামাজিক সম্পর্ক আবিস্কার

১। হক, এম, আজিজুল "বাংলার কৃষক", বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৯২ । পৃঃ ২১৯

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন তেমনি গ্রাম সমাজের মধ্যেই যে এক ধরনের ক্ষুদে সামন্ত আদিকাল থেকেই বর্তমান ছিল তাকে লক্ষ্য করেননি বা গুরুত্ব দেন নি । এই ক্ষুদে সামন্তরা গ্রাম বাংলায় হাজার xxxx বছর ধরে তাদের মালিকানা বজায় রেখেছে এবং গ্রামবাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোকে শ্রেণীস্বার্থগত কারণে অটুট রেখেছে । উপনিবেশ আমলেও এই ক্ষুদে বা পাতি সামন্তরা অনুপস্থিত জমিদারের হয়ে খাজনাপাতি আদায় করা এবং তাদের স্বৈরশাসকের পরিবর্তে ক্ষুদে প্রভুর জমিদারী রক্ষা করেছে । এই পাতি সামন্তরা আজও গ্রামবাংলায় জোতদার বর্গাদার সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে । অবশ্য এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে এই পাতিসামন্তবাদের বৈরীদ্বন্দ্ব সম্পর্ক কখনোই সৃষ্টি হয়নি । বাংলাদেশের বিতর্কিত সামন্তসমাজকে সঠিকভাবে অনুধাবনের জন্য সম্ভবত Max Weber এর prebendalization প্রত্যয়টি খুবই তাৎপর্যবহ ভূমিকা রাখতে পারে । নাজমুল করিম যেমন মনে করেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সামন্তবাদের বিকাশের ভিন্ন ধরণ বোঝার জন্য Weber এর উক্ত প্রত্যয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলনামূলক বিশ্লেষণে ব্যবহার করার সুফল পাওয়া যেতে পারে ।

Max Weber এর উক্ত প্রত্যয়টি ব্যবহার করার কারণ হিসেবে নাজমুল করিম ধরে নিয়েছেন যে, প্রাচ্য, প্রতিচ্যের ভূমিতে মালিকানার পার্থক্য ও সামন্ত প্রভুদের মালিকানা এবং কর সংগ্রাহক হিসেবে ভূমিকা পালনের মধ্যকার সুক্ষ্ম পার্থক্য অনুধাবনের জন্য দুই ভিন্ন সমাজের জন্য দুই ধরনের প্রত্যয় ব্যবহার করা দরকার হয়ে পড়েছে । কেননা দুই সমাজের বিকাশের ধারা ভিন্ন ।

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপে যে প্রিবেন্ডপ্রথা গড়ে উঠেছিল চার্চকেন্দ্রিক, তারই আদলে Max weber ভারতীয় সামন্তবাদকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি ভারতীয় সামন্তবাদ ও ইউরোপের সামন্তবাদের তুলনাকরে সম্পূর্ণ ভিন্ন দটি প্রত্যয় ব্যবহার করেছেন দুই ভিন্ন জাতের সামন্তবাদের জন্য। বলা যায় তিনি ভারতীয় সামন্তবাদকে ইউরোপীয় আদলে সামন্তবাদ বলে স্বীকার করতে চান নি। তিনি পিতৃতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সামন্তীয় মডেলের উৎপাদন ব্যবস্থাকে Prebendalization বলে প্রত্যায়িত করেছেন। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন ভারতীয় ক্ষেত্রে ---

" it was not feudalization, but prebendalization of the patrimonial state". 1

রাষ্ট্র ও ভূমির অধিকর্তা ও মালিকানার পারস্পরিক আন্তসম্পর্ক ও ভিন্নরূপ সম্পর্কে নাজমুল করিম বলেন যে, রাজা বা সম্রাট বা জমিদার নিজে ভূমির মালিক ছিলেন না। যেমন ইউরোপে রাজা ভূমির মালিক ছিলেন। তিনি নিজে মালিকানা হস্তান্তর করতে পারতেন সামন্তপ্রভুদের মধ্যে এবং তারা তাদের অধস্তনদের প্রতি মালিকানা হস্তান্তর করতে পারতেন। ঐতিহাসিক ভাবে দেখা যায় এই জাতীয় হস্তান্তরের সময় উক্ত ভূমিতে আবদ্ধ ভূমিদাসরাও হস্তান্তরিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচ্যে বিশেষ করে ভারতে রাজা এই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। নাজমুল করিম সংক্ষেপে এই পার্থক্যকে নিম্নোক্ত ভাবে বর্ণনা করেছেন :

the "In the Occident according to the theory of jurispr dence the King 'in person' was the owner of land and therefore, he could transfer the right of such an ownership to his subordinates i.e.

---

1. KARIM, A K NAZMUL, " Max Webers Theory of Prebendalization and Bengal Society" in Bangladesh Journal of Socielogy, Vol-1, No. 1, 1983. P-2

Dhaka University Institutional Repository

feudal lords. The feudal lords in their tern could transfer such an ownership of land to their subordinates. In the Orient for exemple in the Indian phenomeon the King, in theory, was not the owner of land, althought the king representing the state i.e. as an official or a trustee or as the Crown was the owner of the land. The question of transer of ownership of land to Zaminders, revenue collectors or other subordinates did not arise in the Indian situation." 1

ভূমিতে মালিকানা স্বত্ব না থাকার কারণে রাজ্যে অধিকতাদের সম্পত্তি হস্তান্তর করার ক্ষমতাও ভারতীয় শাসনতন্ত্রের বিশেষতঃ বাংলায় ছিল না। নাজমুল করিম মনে করতেন বাংলার ধরনটা ছিল খুবই স্বতন্ত্র, প্রতীচ্যের থেকে এমনকি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের থেকেও ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের। ভারতের সকল অঞ্চলের জন্য প্রিবেন্ড ব্যবস্থা সাধারনভাবে ধরেনেয়া গেলেও বাংলাদেশের জন্য সেটি বিশেষভাবে প্রয়োগ করা চলে না। তিনি বাংলাদেশের জন্য 'Waddaderization' প্রত্যয় দিয়ে এই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অবস্থাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন।

'ওয়াদা' অর্থ প্রতিশ্রুতি বা প্রতিজ্ঞা এবং 'দারে' অর্থ ধারী। প্রতিজ্ঞাধারী বা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় এবং রাজকোষে জমা দেবেন তিনি 'ওয়াদ্দাদার'।

---

1. KARIM, A.K. NAZMUL "Max Weber's Theory of Prebendalization and Bengal Society" in Bangladesh Journal of Sociology. Vol.-1, No.1, 1983. P-1

Dhaka University Institutional Repository

এই ওয়াদ্দাদাররা কোনকালেই স্থায়ী জমিদারী হননি । তারা ১০% শতাংশ মালিকানা ভোগ করতেন । এই মালিকানা শুধুমাত্র খাজনা আদায়ের । ভূমিতে মৌরসী-পাট্টার মালিকানা নয় । এইভাবে চুক্তিবদ্ধ আদায়কারীরা বাংলায় সবচেয়ে বেশী পরিমাণ ছিল । এরা নগদ অর্থের বিনিময়ে বাৎসরিক, দ্বিবাৎসরিক বা তারচেয়েও বেশী সময়ের জন্য খাজনা আদায়ের লিজ গ্রহণ করত । দিল্লীর দরবারে নগদ অর্থ দিয়ে তারা এই অধিকার পেত । এই ওয়াদ্দাদার শ্রেণী অভূতপূর্ব সম্মান, মমতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করে । এবং যেহেতু তাদের সামন্ত শিকড় নেই তাই তাদের মধ্যে থেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ হওয়ার সম্ভবনা দেখা দেয় । এই ওয়াদ্দারদের সাথে বেনিয়া ও মুৎসুদ্দি এবং মহাজনরাও অর্থ আদান প্রদান, লভ্যাংশ বাটোয়ারা এবং কৃষকদের কাছ থেকে খাজনা উশুল বা জবরদস্তি আদায় কাজে জড়িত ছিল । বলা যায় সনাতন জমিদারদের বাদ দিয়ে ওয়াদ্দাদার, বেনিয়া, মুৎসুদ্দি এবং মহাজনরা গড়ে উঠেছিল যাদের সামাজিক মর্যাদা শাহী দরবারে বা নবাবী দরবারে না থাকলেও সমাজে প্রভুত প্রতাপ প্রতিপত্তি ছিল । নাজমুল করিম মনে করেন এই গোষ্ঠীর মধ্য থেকেই বাঙালী বুর্জোয়া শ্রেণীর জন্ম হয়েছে । এবং তারা ইংরেজ ব্যবসায়ীদের সাথে হাত মিলিয়ে পিতৃতান্ত্রিক নবাবী ব্যবস্থা উচ্ছেদে অংশগ্রহণ করেছে ।

ভারতীয় সামন্ত করসংগ্রহ ব্যবস্থার সাথে বাংলাদেশের করসংগ্রহ ব্যবস্থার পার্থক্য বর্তমান ছিল । বাংলাদেশের হিন্দু আমল ও মুঘল আমলের কর সংগ্রহ ব্যবস্থায় কিছু ঐতিহাসিক পরিবর্তন আসে । যার সাথে আর্যধারণ বা দাক্ষিণাত্যধরণের বেশ পার্থক্য আছে । নাজমুল করিম মনে করেন বাংলাদেশের ধরণটি একাই একটি অনন্যসাধারণ সামন্তরূপের করসংগ্রহ ব্যবস্থা । এটির কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য সমগ্র ভারত থেকে একে পৃথক করেছে । বিশেষ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত ওয়াদ্দাদারী

– Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা তার অন্যতম । ওয়াদ্দাদারী প্রথা কিভাবে গড়ে উঠেছিল ? সংক্ষেপে বলতে গেলে, জমিদার - যিনি সনাতন খাজনা আদায়ের মালিক, তিনি যদি সময় মত ও পরিমাণমত খাজনা আদায়ে ব্যর্থ হন তবে, তার জমিদারীতে খাজনা আদায়ের জন্য ওয়াদ্দাদার নিয়োগ করা হত । ওয়াদ্দাদার কর্তৃক আদায়কৃত খাজনার ১০% ভাগ জমিদার পেতেন । ওয়াদ্দাদার বা ঠিকাদার নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা আদায় করতে ব্যর্থ হলে কর্তৃপক্ষ 'সাজাওয়াল' নামে বিশেষ ব্যক্তিকে সামরিক সহযোগিতা সহযোগে খাজনা আদায়ে নিয়োগ করতেন । সাজাওয়াল অত্যাচার করে খাজনা আদায় করতেন । তবে প্রায়ই ক্ষেত্রে ওয়াদ্দাদাররাই খাজনা আদায়ে পারঙ্গম ছিলেন । এবং চুক্তির অর্থ তারা আদায় করার আগেই রাজকোষে জমা দিতেন । এর জন্য অনেক সময় মহাজন বা ব্যবসায়ী শ্রেণীর কাছ থেকে এরা ঋণ গ্রহণ করতেন । কখনো মহাজন বা ব্যবসায়ীরা নিজেরাই ওয়াদ্দাদার হতেন । খাজনা আদায় কর্মে চুক্তিবদ্ধ হবার সুযোগ এবং অতিরিক্ত আদায়ের সুযোগ কাজে লাগানোর জন্য একটি ফটকাবাজারী শ্রেণীগড়ে উঠে । যারা সম্ভবনাময় ভাল (লাভকরী অর্থে) তালুকের ওয়াদ্দাদার হওয়ার সুযোগ নিত এবং ভাল আদায় করে লাভবান হত । মহাজন, ঠিকাদার (ওয়াদ্দাদার) ব্যবসায়ী মিলিতভাবে বাংলায় একটি বিশেষ শ্রেনী গড়ে উঠে । এরাই সামাজিক উৎপাদন ও উদ্বৃত্ত আত্মসাতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে । এই ফটকাবাজারী চক্র বাংলাদেশের কুদে সামন্তশ্রেনী হিসেবে (চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণে) প্রতিষ্ঠালাভ করে । প্রকৃত অর্থে জমির মালিকানা তারা না পেলেও কার্যক্ষেত্রে খাজনা আদায়ের মালিকানাভোগের সাথে সামান্য অংশ মাত্র হলেও ভূমিমালিকানা ভোগ করতে সক্ষম হয় । এই ভিন্নধর্মী সামন্তব্যবস্থাকে নাজমুল করিম ম্যাক্স ওয়েবারের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেন, "It was neither feudalization nor prebendalization but waddaderization of the patrimonial state." 1

---

1. KARIM, A K NAZMUL "Max Weber's theory of Prebendalization and Bengal Society" in Bangladesh Journal of Sociology, Vol-1, No.1, 1983. P-3

Dhaka University Institutional Repository

নাজমুল করিম যে ঠিকাদার-জমিদার-মহাজন চক্রকে বাংলার কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার মূল নির্ধারকশ্রেণী তথা প্রতিষ্ঠিত শোষকশ্রেণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন অনেক প্রাচ্য বিশারদ তাদের অস্তিত্ব মুঘল আমলের বহু যুগ পূর্ব থেকেই, এমনকি হিন্দু আমলেরও পূর্ব থেকে অনুভব করেছেন এবং সন্ধানও পেয়েছেন ।

পাভলভ মনে করেন যে, বাংলার সুনির্ভর গ্রামগুলিতে যে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা চালু ছিলো তারাই অর্থাৎ এই পঞ্চায়েতের সদস্যরাই গ্রামের উদ্বৃত্ত শোষণ, খাজনা আদায়ের ঠিকাদার, উদ্বৃত্ত ফসলের বহির্বানিজ্যের বণিক এবং সুদখোর মহাজনের ভূমিকা পালন করে । ১ আন্দ্রোভা কোকা, প্রভৃতিও প্রায় একই মত পোষণ করেন । উইলিয়াম হেন্ডার এই গ্রাম্যক্ষুদে সামন্তদের দ্বৈত চরিত্র সম্পর্কে প্রায় কাছাকাছি মন্তব্য করেছেন । ২

কার্ল মার্কস এশীয় সমাজের ব্যাখ্যায় ও বর্ণনায় সামন্তপতিদের অস্তিত্ব স্বীকার না করে যেমন একটি গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ আর্থসামাজিক সম্পর্ক আবিস্কার করেছেন, তেমনি গ্রাম সমাজের মধ্যেই যে এক ধরণের ক্ষুদে সামন্ত আদিকাল থেকেই বর্তমান ছিল তাকে লক্ষ্য করেন নি বা গুরুত্ব দেন নি । এই ক্ষুদে সামন্তরা গ্রামবাংলায় হাজার বছর ধরে তাদের মালিকানা বজায় রেখেছে এবং গ্রামবাংলার আর্থসামাজিক কাঠামোকে শ্রেণীস্বার্থগত কারণে অটুট রেখেছে । উপনিবেশ আমলেও এই ক্ষুদে বা পাতিসামন্তরা অনুপস্থিত জমিদারের হয়ে খাজনাপাতি আদায় করা এবং তাদের স্বৈরশাসকের পরিবর্তে ক্ষুদে প্রভুর জমিদারী রক্ষা করেছে । এই পাতিসামন্তরা আজও গ্রামবাংলায় জোতদার বর্গাদার সম্পর্ক টিকিয়ে রেখেছে । অবশ্য এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে এই পাতিসামন্তবাদের বৈরীদ্বন্দ্ব সম্পর্ক কখনোই সৃষ্টি হয়নি । বাংলাদেশের ঐতিহাসিক সমাজবিকাশের ধারা ও প্রকৃতি অনুধাবনে এই পাতিসামন্তদের

১। পাভলভ,ভ,ই, প্রভৃতি, "ভারতের সামাজিক অর্থনীতির বিকাশ" র,আ,উলিয়ানভস্কি সম্পাদিত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬ । পৃঃ ১৫৩-১৬৬

2. KRADER, LAWRENCE, "The Asiatic Mode of Production", Van Gorcum & Comp. B.V. Assen, The Netherlands, 1975, P-143

Dhaka University Institutional Repository

সাথে সর্বহারা কৃষকদের দ্বন্দ্ব সম্পর্কের গতি প্রকৃতি ও বুঝতে হবে। হয়তবা এমনও হতে পারে যে, সমাজ ইতিহাসের বিজ্ঞানীদের মতামতের বিভিন্নতা ও দূরত্ব যা তাদেরকে সম্পূর্ণ দুই মেরুতে উপনীত হতে বাধ্য করেছে তার মূল কারণটি এই পাতি বা ক্ষুদে সামন্তসম্পর্কের বৈরীদ্বন্দ্বকে প্রকৃত গুরুত্ব না দেয়ার প্রতিফল। আমার মনে হয় এশীয় উৎপাদন ব্যবস্থার প্রয়োগের যে সীমাবদ্ধতা ও সামন্তবাদের যে দুর্বলতা তা থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো বুঝতে গেলে এই পাতিসামন্তবাদকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

অপর পৃঃ দ্রঃ ২১৩/

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশে বর্তমানে যে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা যে জটিল সম্পর্ক তৈরী করেছে সেখানেও তিনটি শ্রেণীর সুস্পষ্ট অবস্থান আছে। (১) ভূমিহীন সর্বহারা শ্রেণী - যারা গ্রামে প্রত্যক্ষ ভূমিদাস, কৃষি উপকরণের মালিকানাহীন, (২) মধ্যবিত্ত কৃষক - যার মধ্যে স্বাধীন চাষী, বর্গাচাষী ও প্রান্তিক চাষী অবস্থান করে এবং (৩) ধনীকৃষক ও মহাজন - যারা চিরায়ত উৎপাদন ব্যবস্থায় ভাগচাষের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত আত্মসাতের উৎপাদন কৌশল হিসেবে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধান ও পৃষ্টপোষতায় অপ্রত্যক্ষ ভূমিদাস শ্রমেরবুর্জোয়া-প্রবণতার উপাদান বৈশিষ্টমন্ডিত বিনিয়োগের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে। ১

এই ধনী কৃষকশ্রেণী যারা গ্রামের বাজার ও অর্থব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক, তারা গ্রামীণ উদ্বৃত্ত সম্পদ পাচারেরও অধিনায়ক এরা আন্তর্জাতিক আর্থসাম্রাজ্যবাদের মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ার দালালদের গ্রামীন তৃণমূল পর্যায়ের সম্পদ পাচারের বৈপারী। ২ আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, বাংলাদেশ থেকে ঐতিহাসিককাল হতে বর্তমান পর্যন্ত সম্পদ পাচারের এক ধারা চলে আসছে। সাম্প্রতিককালে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়ারা সেই সম্পদ পাচারে প্রধান ভূমিকা পালন করছে। সম্প্রতি বেসরকারী সংস্থাসমূহও এই পাচার কাজে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করেছে। বাঙালী সমাজ বিবর্তনের ধারায় বর্তমান কালে এসে আমরা দেখতে পাই যে, জনসংখ্যার মধ্যে তীব্রতর মেরুকরণ সংঘঠিত হয়েছে, ধনীকৃষক অধিক ধনী হয়েছে, গরীব আরো অধিকতর গরীব হয়েছে, ভূমিহীন মজদুরের সংখ্যা বেড়েছে। ৩ এর ফলে কৃষি উদ্বৃওউৎপাদ শোষণ তীব্রতর হবার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই উদ্বৃত্ত কৃষি উৎপাদ শহরের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্বারা শোষিত হয়েছে।

---

1. CHOWDHURY, ANWARULLAH "Agrarian Social Relations and Development in Bangladesh" Oxford & Publishing Co. New Delhi, 1982. P-22-23
2. MAHMOOD, A. "A Plea for a fresh Approach to Socis-Economic Development, Centre of Social Studies, Dhaka 1977. P-55
3. Opcit. PP-14-25

Dhaka University Institutional Repository

আমরা দেখিছি গ্রামের কৃষকশ্রেণীর জীবনব্যবস্হার উন্নয়নসাধনের জন্য যে সমস্ত ভূমি সংস্কার আইন ও গ্রামউন্নয়নমূলক কর্মকান্ড রাষ্ট্রীয়ভাবে হাতে নেওয়া হয়েছে তাতে সাধারণ ভূমিহীন কৃষকদের জীবনব্যবস্হার উন্নতি সাধন হয়নি বরঞ্চ ধনী কৃষক, মহাজন শ্রেণী, সম্পন্ন গৃহস্হরা, সুযোগসন্ধানীরা লাভবান হয়েছে (ফায়দা লুটেছে)। ১ আমরা দেখিছি গ্রামউন্নয়নের জন্যে যখন এদেশে সমবায় ব্যবস্হা চালু হয়েছিল তখন সেই শ্রেনীর ভদ্রলোকেরা এগিয়ে এসেছিলেন, তারা আর্থিক ও বিষয়গত সকল সুবিধাই নিয়েছিলেন। ২ প্রান্তিক চাষী, অপ্রত্যক্ষ ভূমিদাস, বর্গা-চাষীরা কোনভাবেই প্রকৃতার্থে উপকৃত হয়নি। জমিদারী ব্যবস্হা চালু হয়েছিল এই ঘোষণা দিয়ে যে, জমিদাররা কৃষি উপাদান ব্যবস্হার উন্নতি ও কৃষকের আর্থিক অবস্হার উন্নতিসাধন করবে, কিন্তু ঠিক তার উল্টো ফল ফলেছিল। কৃষির অবনতি হয়েছিল, কৃষকরা অধিকতর দরিদ্র হয়েছিল এবং কয়েকটি মহাদুঃর্ভিক্ষ সংগঠিত হয়েছিল। ৩

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর যে সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে এবং বর্তমানে যে সমস্ত কার্যক্রম এখনও চালু আছে তাতে আলোচ্য মেরুকরণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে। পাকিস্তান আমলে এবং বর্তমান বাংলাদেশ আমলেও সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড ও পাঁচশালা পরিকল্পনাগুলিতে দারিদ্র দূরীকরণ একটি প্রধান উদ্দেশ্য হিসেবে পূর্বাপর একই অবস্হায় আছে অর্থাৎ দারিদ্র দূরিভুত হয়নি। দেখা যায় যে, এ সব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম থেকে গ্রামের বহুল আলোচিত পাতিসামন্ত শ্রেণী আর্থিক এবং বৈষয়িকভাবে লাভবান হয়েছে, ব্যাংক ঋণের সুবিধাগ্রহণ করে নগদ অর্থ পুনর্জীভবন করেছে এবং ঋণগ্রস্তরা এবং দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে অধিকতর ভূসম্পত্তি আত্মসাৎ করেছে। ৪ মহিউদ্দিন খান আলমগীর বলেছেন, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে বৈষম্য তীব্রতর হচ্ছে প্রতিনিয়ত এবং সাম্রাজ্যবাদ বাংলাদেশের

---

1. CHOWDHURY, ANWARULLAH "Agrarian Social Relations and Development in Bangladesh, Oxford & Publishing Co. New Delhic 1982. PP-71-88,
২। সেন, ডঃ সুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ-১৪৭
৩। মুখোপাধ্যায়, সুবোধ কুমার, "বাংলার আর্থিক ইতিহাস(উনবিংশ শতাব্দী)", কে, পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৭। পৃ- ১-১৯
সেন, ডঃ সুনীল, "ভারতে কৃষি সম্পর্ক", পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫। পৃ-১৫৬-১৭১
4. Opcit. PP-71-88

Dhaka University Institutional Repository

মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের সাহায্যে এদেশের ধনীকৃষকদের সাথে নিয়ে গ্রাম্য সাধারণ কৃষকদেরকে শোষণ করছে । শহুরে মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের, সাম্রাজ্যবাদের দালালদের প্রাকপুঁজিবাদী সম্পর্ক ধ্বংশ করার কোন প্রবণতা দেখা যায় না । সম্ভবতঃ এই কারণে যে, রতন খাসনবিস যেমন বলেছেন, " সংস্কারের মধ্যদিয়ে প্রাক-পুঁজিবাদ নির্মুল হয় না " ১

সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামে বুর্জোয়া শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা থাকে । পুঁজিবাদী দেশগুলিতেও প্রাক-পুঁজিবাদ টিকে আছে এবং সংস্কারের মধ্যদিয়ে তাকে তারও মজবুত করা হয়েছে বলে লেনিন উল্লেখ করেছেন । ২ ভূমি-সংস্কারের পরেও আধা-সামন্তবাদী শোষণ থেকে যেতে পারে (লেনিন) । সামন্ততন্ত্র ধ্বংশ হবার পর বুর্জোয়াদের শিল্প-বাণিজ্য ও যোগাযোগ মাধ্যমগুলির বিকাশ হবার পর দেখা যায় সর্বহারা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে । এক পর্যায়ে এই সর্বহারারা বুর্জোয়াদেরকে ছড়িয়ে এগিয়ে যায় । বুর্জোয়ারা তখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য প্রতিক্রিয়াশীলদের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে । এই প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে আমলা, সামরিক বাহিনী, অভিজাতকুল, গেয় জমিদারের অপভ্রংশ, ধর্মব্যবসায়ী প্রভৃতিরা থাকতে পারে । ৩ বুর্জোয়ারা যারা মূলতঃ সাম্রাজ্যবাদের দালাল তারা সামন্তবিরোধী নয় - এরা সামন্তশক্তির সংগে রাজনৈতিক ক্ষমতার ভাগীদার ।

যেহেতু এই বাংলাদেশের লুম্পেন বুর্জোয়ারা সর্বহারা শ্রেণীর ভয়ে ভীত হয়ে বুর্জোয়া বিপ্লব সম্পন্ন করতে ভয় পায় এবং যে পুঁজিবাদী বিকাশ বুর্জোয়া -সেটি বুর্জোয়া নেতৃত্বে সম্ভব নয় - সেটি সম্পন্ন করতে এসে সর্বহারা শ্রেণী দেখতে পায় তাদের বিপরীতে বেরুতে অবস্থান করেছে লুম্পেন বুর্জোয়, দালাল বুর্জোয়া এবং পাতি-সামন্ত শ্রেণীর সকল ভাগীদাররা । তাই শ্রমিক-কৃষক জোটের, সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক

১। খাসনবিশ, রতন," আধাসামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি" পিপল্‌স্ বুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৮৬ । পৃ-১৮

২। প্রাগুক্ত । পৃ- ১৪

৩। প্রাগুক্ত । পৃ-২

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যের দায়িত্ব এসে পড়ে বুর্জোয়া বিপ্লবের অসমাপ্ত দায়, অসমাপ্ত সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রাম। ১ কিন্তু যে সমস্ত কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে তেমনটি নয়, এটি অনেক উৎকৃষ্ট গুণগত মাত্রার সার্বিক শ্রেণী সংগ্রাম। বড় জোত বজায় রেখে যে উন্নয়নমূলক সংস্কার করা হয় বা উপর থেকে যে সব ভূমি-সংস্কার চাপিয়ে দেওয়া হয় তা মূলতঃ বড় বড় ভূস্বামীর মৌলিক স্বার্থ রক্ষা করে, পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, সে সংস্কার ক্ষয়িষ্ণু প্রাক-পুঁজিবাদকে নতুন করে বাঁচার রসদ জোগায়। এই জাতীয় সংস্কার সম্পর্কে লেনিন বলেছিলেন, "সংস্কার নিশ্চিত ভাবেই মুমূর্ষ সামন্ততন্ত্রকে বেঁচে থাকার নতুন মেয়াদ দিয়েছে, ঠিক যেভাবে ১৮৬১ সালের তথাকথিত কৃষক (বাস্তবে ভূস্বামী) সংস্কার, নারদনিক এবং উদারপন্থীরা যেটিকে স্বাগত জানিয়েছিল, সেই দুরভিসন্ধিমূলক সংস্কারটি, কর্তি ব্যবস্থার জীবনে একটি নতুন মেয়াদ এনেছিলো, ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যা নানা ধরণের মোড়কে টিকে ছিলো।" ২ বড় জোত টিকিয়ে রেখে যেমন সামন্ততন্ত্রের উচ্ছেদ সম্ভব নয়, তেমনি সম্পদ পাচারকারী মুৎসুদ্দী বুর্জোয়াদের বাঁচিয়ে রেখেও বুর্জোয়া বিপ্লবের সুবিধা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সম্ভব নয়।

হামজা আলাভী বলেছেন, সামন্তদের সাথে পুঁজিবাদীদের শোষণ স্বার্থগত শ্রেণীঐক্য হতে পারে যা উপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সম্ভব। ৩ আমরা হামজা আলাভীর সব মতের সাথে একমত না হলেও একটি বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, বিশ্ব পুঁজিবাদ কেন্দ্রীয় পুঁজিবাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রান্তিক আর্থসাম্রাজ্যবাদী পুঁজির দালাল মুৎসুদ্দীদের সামন্তীয় রাজনৈতিক অংশীদারদের স্বার্থ বাঁচিয়ে রেখে বিশ্ব-পুঁজির বাজার ও পুঁজি পাচার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে।

১। খাসনবিশ, রতন "আধা সামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি" পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৮৬। পৃ- ৫

২। প্রাগুক্ত। পৃ-১৪

Dhaka University Institutional Repository

নিপীড়িত জনতার জীবনমান উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্নের প্রধান দায়িত্ব এসে পড়ে এই মুৎসুদ্দী বুর্জোয়া ও পাতি সামন্তশ্রেণীর বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত আমজনতার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংশ সর্বহারা ও গ্রামীণ মজদুর এবং প্রান্তিক চাষীর রাজনৈতিক ঐক্যবদ্ধ শক্তির উপর । শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধেই নয়, কিম্বা এককভাবে গ্রামীণ পাতি-সামন্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার উৎখাতেই নয়, সাধারণ মানুষের মুক্তি, অবশ্যই তাদের বিপরীত মেরুতে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উল্লেখিত শোষক শ্রেণীর সম্মিলিত জোটের একত্রে সমূলে উৎখাতের মাধ্যমেই প্রকৃত মুক্তি আসতে পারে । এবং এটি সার্বিক (রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক) শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সম্ভব ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ক

প্রাচীন কাল থেকে মুঘল অবধি শাসনরূপে যাদের নাম ইতিহাসে বিধৃত রয়েছে তাঁদের 'পীঠিকা' দেয়া হল :

বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে সন তারিখের পার্থক্য লক্ষণীয় ।

বাংলাদেশে তাম্রযুগ - ২০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

(কৌম সমাজ)

পুরাণে বর্ণিত বঙ্গদেশ - ১০০০ - ৩৫০ খৃষ্টপূর্বাব্দ

(পুন্ড্রকোম, রাঢ়কোম, সুহ্মকোম ইত্যাদি)

বিম্বিসার - (৫৪৫ - ৪৯৩ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

অজাতশত্রু

উদয়ন - (৪৬৯ - ৪৪৫ খৃষ্টপূর্বাব্দ) রাজগৃহ থেকে পাটলীপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরণ

গ্রীসের পন্ডিতদের বর্ণনায় বঙ্গদেশ - খৃষ্টপূর্বাব্দ ৩৫০ - ৩০০ অব্দ

নন্দ বংশ (৩৪৫ - ৩১৭/৩১৪ খৃষ্টপূর্বাব্দ)

মহাপদ্ম নন্দ (উগ্রসেন)

উগ্রসৈন্য - এর আগে বাংলাদেশের বিভিন্ন কোম প্রায় স্বাধীন ছিল ।

মৌর্য বংশ :

চন্দ্রগুপ্ত - (৩১৭ - ২৯৩ খৃঃ পূঃ)
বিন্দুসার - (২৯৩ - ২৬৮ খৃঃ পূঃ)
অশোক - (২৬৮ - ২৩২ খৃঃ পূঃ)
বিম্বিসার
অজাতশত্রু

ভারতে শুঙ্গ রাজবংশ (১৮০ - ৬৮ খৃঃপূঃ) এবং কাহ্ন রাজবংশ (৬৮ - ২২ খৃঃ পূঃ) রাজত্বকালে এবং কুশান সাম্রাজ্য (খৃষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতক পল্লব সাম্রাজ্য ও ভকতর্ক সাম্রাজ্য তৃতীয় থেকে চতুর্থ শতকের প্রথম পাদ, সুপ্ত সাম্রাজ্যের পূর্ব পর্যন্ত) মহাপ্রতাপশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় নি এবং এই সময়ে বাংলায় স্বাধীন সামন্ত বা নৃপতি বিভিন্ন এলাকায় শাসন করেছিলেন ।

গুপ্ত বংশ : আনু : ৩২০ - ৬০০ খৃঃ (৩০০ - ৫৫০ খৃঃ)

শ্রীগুপ্ত
চন্দ্রগুপ্ত
সমুদ্রগুপ্ত
চন্দ্রগুপ্ত (২য়)

Dhaka University Institutional Repository

কুমারগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত

দামোদরগুপ্ত

কুমারগুপ্ত (২য়)

মহাসেনগুপ্ত

বাংলার স্বাধীন সামন্ত (৬ষ্ঠ শতক)

১। গোপচন্দ্র : আনুঃ ৫০০-৩৩ খ্রীঃ

২। ধর্মাদিত্য : আনুঃ ৫৩৩-৩৬ খ্রীঃ

৩। সমাচার দেব (দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের) রাজা আনুঃ ৫৩৬-৫০ খ্রীঃ

৪। বন্যগুপ্ত (সমতট, রাজধানী-শ্রীপুর) - ৫০৭ খ্রীঃ

৫। সুধন্যাদিত্য

৬। পৃথুবীর

বাঙালী রাজা : শশাঙ্ক (নরেন্দ্রগুপ্ত) আনুঃ ৬০৫-৩৫ খ্রীঃ)

গৌড় - ব্রগধ-দক্ষভুক্তি-উৎকল অধিপতি

গৌড় :

ভাস্কর বর্ধণ (ষষ্ঠ শতক) সামান্য কুমিলার সামন্ত রাজবংশ (৭ম শতক)

জয়নাগ (৫৫০-৬৫০) - শ্রী জীবধারণ রাজ

যশোবর্ধণ (৭২০-৩৫) - শ্রী ধরণ রাজ

- ত্রিপুরায় সামন্ত লোকনাথ
(৬৩৬-৪৪ খ্রীঃ - তাম্রশাসন)

Dhaka University Institutional Repository

সমতট : আনুমানিক ৬৫০ - ৭০০ খ্রীঃ

খড়োগদ্যম

জাতখড়্গ

দেব খড়্গ

রাজরাজ ভট্ট (৭ম শতকের শেষের দিকে)

সমতটের দেববংশীয় রাজা : আনুঃ ৭৫০-৮০০ খ্রীঃ

১। শান্তিদেব

২। বীরদেব

৩। আনন্দদেব

৪। ভবদেব

৫। কান্তিদেব

	পালবংশ	সিংহাসনারোহন	আনুমানিক রাজত্বকাল
১।	গোপাল	(৭৫৬) ৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দ	৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত
২।	ধর্মপাল (বিরুদ বিক্রমশীল)	৭৮১ ''	৮২১ '' ''
৩।	দেবপাল	৮২১ ''	৮৬১ '' ''
৪।	বিগ্রহ পাল ওর্ফে শূরপাল (ধর্মপালের ভ্রাতা বাকপালের পৌত্র, জয়পালের পুত্র)	৮৬১ '' (৮৬৬)	৮৭৬ '' ''
৫।	নারায়ন পাল	(৮৬৬) ৮৭৬ ''	৯২০ '' ''
৬।	রাজ্যপাল (মগধ, বরেন্দ্র ত্রিপুরা ধিপতি)	৯২০ ''	৯৫২ '' ''
৭।	গোপাল (দ্বিতীয়) মগধ, বরেন্দ্র ত্রিপুরাধিপতি	৯৫২ ''	৯৬৯ '' ''

Dhaka University Institutional Repository

৮। বিগ্রহ পাল (২য়) হৃতরাজ্য	৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ	৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত	
৯। মহীপাল (পালরাজত্বের নব প্রতিষ্ঠাতা)	৯৯৫ ''	১০৪৩ ''	''
১০। ন্যায় পাল	১০৪৩ ''	১০৫৮ ''	''
১১। বিগ্রহ পাল (৩য়)	১০৫৮ ''	১০৭৫ ''	''
১২। মহীপাল (২য়)	১০৭৫ ''	১০৮০ ''	''
১৩। শুরপাল (২য়)	১০৮০ ''	১০৮২ ''	''
১৪। রামপাল	১০৮২ ''	১১২৪ ''	''
১৫। কুমার পাল	১১২৪ ''	১১২৯ ''	''
১৬। গোপাল (৩য়)	১১২৯ ''	১১৪৩ ''	''
১৭। মদন পাল	১১৪৩ ''	১১৬১ ''	'' ৭১১৬২)
১৮। গোবিন্দ পাল	১১৫২ ''	?	

বরেন্দ্র কৈবর্ত : আনুঃ ১১০০-২০০ খ্রীঃ রাঢ়ে : ১১ শতকের শেষ ভাগ ইশ্বর ঘোষ, রাজধানী - ঢেক্কারী

ক) দিব্য

খ) রুদ্রক

গ) ভীম

হরিকেল রাজা : আনুঃ ৮০১-৯০০ - পার্বত্য চট্টগ্রাম ও চট্টগ্রাম

১। ভদ্রদত্ত

২। ধনদত্ত

৩। কান্তিদেব (১ম শতকের ১ম পাদ সম্ভবত ভবদেবের দৌহিত্র ।

Dhaka University Institutional Repository

আরাকানী সূত্রে দেখা যায় বৈশালী নগরে চন্দ্র রাজারা ৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন এবং উত্তর আরাকান তখনো সম্ভবতঃ মহাবীর ও তার পরবর্তী রাজাদের দখলে থাকে। সমতট অঞ্চলে হয় ঐ বিতাড়িত চন্দ্ররা কিংবা তাঁদের জ্ঞাতি সামন্তশাসক বংশীয়রা রাজত্ব করেন।

বাঙলায় প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণাদির সাহায্যে তাঁদের রাজপরম্পরা পীঠিকা দেয়া হল ঃ

চন্দ্রবংশ : ৮০০-১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ

রাজা	রাজত্বকাল
১। পূর্ণচন্দ্র	৮০০-৮৪০ খ্রষ্টাব্দ সামন্ত (?) রাজ
২। সুবর্ণচন্দ্র	৮৪০-৯০০ ''
৩। ত্রৈলোক্যচন্দ্র	৯০০-৩০ ''
৪। শ্রীচন্দ্র	৯৩০-৯৭৫ ''
৫। কল্যাণচন্দ্র	৯৭৫-১০০০ ''
৬। লড়হ চন্দ্র	১০০০-১০২০ ''
৭। গোবিন্দচন্দ্র	১০২০-১০৪৫ ''
৮। ললিতচন্দ্র	১০৪৫-১০৭০ ''

ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্মনরাজত্ব ঃ ১০৮০ - ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দ (?)

১। বজ্র বর্মন
২। জাত বর্মন
৩। হরি বর্মন
৪। শ্যামল বর্মন (১০৭৯ খ্রীঃ ?)
৫। ভোজ বর্মন

Dhaka University Institutional Repository

সেন বংশ ঃ ১০৭০ - ১২০৭ খ্রীষ্টাব্দ

১। সামন্ত সেন

২। হেমন্তসেন (১০৭০-৯৭)

৩। বিজয় সেন (১০৯৭-১১৬০)

৪। বল্লাল সেন (১১৬০-৭৮)

৫। লক্ষণ সেন (১১৭৮-১২০২/৬) (তুর্কী বিজয়-অংশবিশেষ)

পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের শাসক ঃ

৬। বিশ্বরূপসেন (১২০৬-১২২০) লক্ষণসেনের পুত্র।

৭। কেশব সেন (১২২০-২৩)

৮। অন্যান্য রাজারা (১২২৩-৪৬)

পূর্ববঙ্গের দেব বংশ ঃ আনুঃ ১১৬০-১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ

১। পুরুষোত্তম দেব

২। মধুমথম (সূদন) দেব (১১৬০-৮০)

৩। বাসুদেব (১১৮০-১২০৪)

৪। রণবঙ্কমল্ল হরিকাল দেব (১২০৪-৩০)

৫। দামোদর দেব (১২৩০-৫৪)

৬ঃ অরিরাজ দনুজ মাধব দশরথদেব (১২৫৪-৯০ রাজধানী - বিক্রমপুর)

শ্রীহট্টে দেববংশীয় রাজাগণ (১২৯০-১৩২০)

১। ঘরবাণ দেব

২। গোপাল দেব

৩। নারায়ন দেব

৪। কেশব দেব

৫। ঈশান দেব

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যযুগ ঃ তুর্কী বিজয়

তুর্কী বিজয়ের ফলে দেশে যুগান্তর ঘটে, যেমন ঘটেছিল ব্রিটিশ বিজয়ের ফলে ।

ক। খলজী শাসন - ১২০২-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ (বাংলাদেশের অংশ বিশেষে হিন্দু শাসন বলবৎ ছিল)

১। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বখতিয়ার খালজী ১২০২-০৬ খ্রীঃ

২। মালিক ইজ্জুদ্দীন মুহম্মদ শিরান খালজী ১২০৬-০৮ খ্রীঃ

৩। মালিক হুসামুদ্দীন গিয়াসুদ্দীন ইওয়াজ (দুইবার) ১২০৮-১০/১২১৩-২৭ খ্রীঃ)

৪। মালিক আলা মর্দান ১২১০-১৩ খ্রীঃ

খ। মামলুক শাসন - ১২২৭-৮২

১। শাহজাদা নাসিরুদ্দীন মাহমুদ ১২২৭-২৯

২। মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন বলখ খালজী ১২২৯-৩০

৩। মালিক আলাউদ্দীন জানি ১২৩১-৩২

৪। মালিক সাইফুদ্দীন আইবক ১২৩২-৩৫

৫। মালিক ইজ্জুদ্দীন তুঘরল তুঘান খান ১২৩৬-৪৫

৬। মালিক তৈমুর খান-ই-কিরান ১২৪৫-৪৭

৭। মালিক জালাল উদ্দীন মাসুদ জানি ১২৪৭-৫১

৮। মালিক ইখতিয়ার উদ্দীন মুঘিসুদ্দীন ১২৫২-৫৭

৯। মালিক ইজ্জুদ্দীন বলবন উজবেকী ১২৫৭-৫৯

১০। মালিক তাজুদ্দীন আরসালান খান ১২৫৯-৬৫

১১। তাতার খান (আরসালানের পুত্র) ১২৬৫-৬৮

১২। শের খান ১২৬৮-৭২

১৩। আমীর খান ১২৭২-৭৩

১৪। মুঘিস উদ্দীন তুঘরল তুঘান খান ১২৭২-৮১

Dhaka University Institutional Repository

গ। বলবন বংশীয়ের শাসনে ১২৮২-১৩০১

১। নাসির উদ্দীন বঘরু খান ১২৮২-১২৯১

২। রুকন উদ্দীন কায়কাউস ১২৯১-১৩০১

ঘ। অজ্ঞাত মামলুক শাসনে - ১৩০১-১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ (হিন্দু রাজার শাসনের বিলুপ্তি কিন্তু হিন্দু সামন্ত জমিদার বর্তমান)

১। শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৩০১-১৩২২ খ্রীঃ

২। লাখনৌতি সপ্তগ্রাম সোনারগাও এই তিন ইওলয়

ক) গিয়াস উদ্দীন বাহাদুর শাহ

খ) নাসিরুদ্দীন ইব্রাহিম শাহ

গ) বাহরাম খান ওরফে তাতার খান ১৩২২-২৮ খ্রীঃ

৩। ক) কদর খান - লাখনৌতি ১৩২৮ খ্রীঃ

খ) মালিক এজুদ্দীন এহিয়া-সাতগাও ১৩২৮ খ্রীঃ

গ) বাহরাম খান-সোনার গাও ১৩২৮ খ্রীঃ

৪। স্বাধীন সুলতানী আমল

ক) ফকর উদ্দীন মুবারক শাহসসোনার গাও ১৩৩৮-৫০ খ্রীঃ

খ) আলাউদ্দীন আলী শাহ-লোখনৌতি ১৩২৮-৪২ খ্রীঃ

গ) শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ-লাখনৌতি-সাতগাও ১৩৪২-৫৭ খ্রীঃ

ঘ) ইখতিয়ার উদ্দীন গাজী শাহ-সোনারগাও ১৩৫০-৫৩ খ্রীঃ

ঙ) ইলিয়াসশাহী বংশ - ১৩৪২-১৪১২

১) লাখনৌতি সাতগাও ইজারদার শামছুদ্দীন ইলিয়াস শাহ ১৩৫৩খ্রীঃ থেকে বাংলার ও বিহারের কতকাংশের স্বাধীন সুলতান হন (১৩৪২-৫৩/ ১৩৫০-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ)

Dhaka University Institutional Repository

২) সিকান্দর শাহ ১৩৫৭-৮৯ খ্রীষ্টাব্দ

৩) গিয়াস উদ্দীন আযম শাহ ১৩৮৯-১৪০৯ ''

৪) সাইফুদ্দীন হামজা শাহ ১৪০৯-১০ ''

৫) শামছুদ্দীন ১৪১০-১২ ''

চ) বায়াজীদ শাহী বংশ ১৪১২-১৪

১) শিহাবুদ্দীন বায়াজিদ শাহ ১৪১২-১৪ খ্রীষ্টাব্দ

২) আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ

ছ) গনেশ বংশীয় সুলতানগণ ১৪১৫-১৪৩৩

১) রাজা গনেশ ওর্ফে দনুজমর্দন দেব ১৪১৫,১৪১৭-১৮ খ্রীষ্টাব্দ

২) জালাল উদ্দীন মুহাম্মদ শাহ বা যদু ১৪১৫-১৬,১৪১৮-৩১ খ্রীঃ

৩) মহেন্দ্র দেব (গনেশের পুত্র) ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ

৪। শামছুদ্দীন আহমদ শাহ ১৪৩২-৩৩ খ্রীঃ

জ) মাহমুদ শাহী বা পরবর্তী ইলিয়াস শাহী বংশ ১৪৩৩-৮৬ খ্রীঃ

১) নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (১ম) ১৩৩৩-৫৮ খ্রীঃ

২) রুকন উদ্দীন বরবক শাহ ১৪৫৯-৭৬ খ্রীঃ

৩) শামছুদ্দীন ইউসুফ শাহ ১৪৭৬-৮০ খ্রীঃ

৪) সিকান্দর শাহ ১৪৮০-৮১ খ্রীঃ

৫) জালাল উদ্দীন ফতেশ শাহ (মাহমুদ শাহের অন্য পুত্র) ১৪৮১-৮৭ খ্রীঃ

Dhaka University Institutional Repository

ঝ) সুলতান শাহাজাদা ও হাবসী আমল ১৪৮৭ - ১৩ খ্রীঃ

১) করবক বা সুলতান শাহাজাদা ১৪৮৭ খ্রীষ্টাব্দ

২) সইফ উদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৪৮৮-৯০ খ্রীঃ

৩) নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহ (২য়) ১৪৯০-৯১

৪) শামছুদ্দীন মুজাফর ওর্ফে সিদিবদর ওর্ফে দিওয়ানা ১৪৯১-৯৩ খ্রীঃ

ঞ) হোসেন শাহী বংশ - ১৪৯৩ - ১৫৩৮

১) সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ ১৪৯৩-১৫১৯

২) নাসির উদ্দীন নুসরৎ শাহ ১৫১৯-৩২ খ্রীঃ

৩) আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহ ১৫৩২-৩৩ খ্রীঃ

৪) গিয়াস উদ্দীন মাহমুদ শাহ ওর্ফে আবদুল বদর ১৫৩৩-৩৮ খ্রীঃ

ট) সুর বংশ ১৪৩৯ - ৫১ = (১৫৩৮ - ১৫৬৩)

১) শের শাহ

২) ইসলাম শাহ

৩) মুহাম্মদ শাহ সুর

৪) বাহাদুর শাহ সুর

৫) জালাল শাহ সুর

ঠ) করবানী বংশ ১৫৫৯ - ৭৫ = (১৫৬৪ - ১৫৭৬)

তাজখান করবাণী

১) সোলায়মান করবাণী

২) দাউদ খান করবাণী

ড) মুঘল আমল ১৫৭৫ - ১৭৫৭ (হিন্দু ও মুসলিম প্রায় স্বাধীন ভুঁইয়ার শাসনও ছিল)

১) আকবর (১৫৭৫-১৬০৫)

সুবাদার (মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার সাথে ভুঁইয়াদের রাজস্ব ব্যবস্থার সংমিশ্রন)

Dhaka University Institutional Repository

ক) মুনিম খান ১৫৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ

খ) হোসেন কুলী বেগ ১৫৭৫-৭৯ ''

গ) মুজাফ্ফর খান তুরবতী ১৫৭৯-৮২ ''

ঘ) যানে আজম মির্জা আজিজ ১৫৮২-৮৩ ''

ঙ) সাহবাজ খান ১৫৮৩-৮৪ ''

চ) সাদিক খান ১৫৮৫-৮৬ ''

ছ) ওয়াজির খান ১৫৮৬-৮৭ ''

জ) সাইদ খান ১৫৮৭-৯৫ ''

ঝ) রাজা মানসিংহ ১৫৯৫-১৬০৬ ''

২) জাহাঙ্গীর ১৬০৫-২৭

ক) কুতুব উদ্দীন খান কোকা ১৬০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দ

খ) জাহাঙ্গীর কুলী খান ১৬০৭-০৮ ''

গ) ইসলাম খান ১৬০৮-১৩ ''

ঘ) কাসিম খান চিস্তি
(স্বল্পকালের জন্য শেখ হুসান) ১৬১৩-১৭ ''

ঙ) ইব্রহিম খান ১৬১৭-২৪ ''

চ) দারাব খান
(শাহজাহান অধিকৃত ঢাকায়) ১৬২৪-২৫ ''

ছ) মহব্বত খান ১৬২৫-২৬ ''

জ) মুকররম খান
(স্বল্পকালের জন্য আজাদখান) ১৬২৬-২৭ ''

৩) শাহজাহান ১৬২৮-৫৮

ক) ফিদাই খান ১৬২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

খ) কাসিম খান জুইনী ১৬২৮-৩২ খ্রীষ্টাব্দ

গ) খানে আজম মীর মুহম্মদ কবর ১৬৩৩-৩৫ ''

ঘ) ইসলাম খান মাশদাহী ১৬৩৫-৩৯ ''

ঙ) (মুহম্মদ) শাহ সুজা ১৬৩৯-৬০ ''
(স্বল্প কালের জন্য সইফখান)

৪। আওরঙজীব ১৬৫৮-১৭০৭

ক) মুয়াজজম খান ওর্ফে মীর জুমলা ১৬৬০-৬৩ খ্রীষ্টাব্দ

খ) শায়েস্তা খান ১৬৬৪-৭৮ ''

গ) মুহাম্মদ আযম ১৬৭৮-৮৮ ''
(স্বল্পকালের জন্য ফিদইখান)

ঘ) খান-ই-জাহান ১৬৮৮-৮৯ ''

ঙ) ইব্রাহিম খান ১৬৮৯-৯৭ ''

চ) আজিম উদ্দীন ওর্ফে আজিমুশান ১৬৯৭-১৭০৭ ''

৫। বাহদুর শাহ (১ম) ১৭০৭-১২

ক) আজিমশশান ১৭০৭-১২ খ্রীষ্টাব্দ

৬। জাহান্দর শাহ ১৭১২-১৭

ক) খান-ই-জাহান ১৭১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ

৭। ফখরুয শিয়ার ১৭১৩-১৯ ''

৮। রাফিদ্ দরাজ ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ

৯। রফিউদ্দৌলা ওর্ফে শাহজাহান (২) ১৭১৯ খ্রীষ্টাব্দ

ক) মীর জুমলা ১৭১৯-১৫ ''

খ) মুরশিদ কুলী খান ১৭১৭-১৯ খ্রীষ্টাব্দ

Dhaka University Institutional Repository

১০। মুহম্মদ শাহ

দিল্লীর সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ এসময় থেকে বাংলার সুবাদারী পুরুষানুক্রমিক নওয়াবীতে পরিণত হয়। মসনদ দখল করে ওয়াবেরা সম্রাট থেকে নিয়োগ পত্র বা সনদ আদায় করতেন।

ক) মুরশিদ কুলী খান ১৭১৯-২৭ খ্রীষ্টাব্দ
খ) শুজাউদ্দীন মুহম্মদ খান ১৭২৭-৩৯ ''
গ) সরফরাজ খান ১৭৩৯-৪০ ''
ঘ) আলীবর্দী খান ১৭৪০-৪৮ ''

১১। আহমদ শাহ ১৭৪৮-৫৪

ক) আলীবর্দী খান ১৭৪৮-৫৪ খ্রীঃ

১২। শাহ আলম (২য়) ১৭৫৪-১৮০৬

ক) আলীবর্দী খান ১৭৪৮-৫৬ খ্রীষ্টাব্দ
খ) সিরাজুদ্দৌলা ১৭৫৬-৫৭ ''
গ) মীর জাফর আলী খান ১৭৫৭-৬০ ''
ঘ) মীর কাসিম আলী খান ১৭৬০-৬৩ ''
ঙ) মীর জাফর আলী খান (পুনঃ) ১৭৬৩-৬৫ ''
চ) নাজিমুদ্দৌলা ১৭৬৫-৬৬ ''
ছ) সইফুদ্দৌলা ১৭৬৬-৭০ ''

সূত্রঃ-১। শরীফ, আহমদ, "বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খন্ড) বর্ণমিছিল, ঢাকা ১৯৭৮।
২। রায়, নীহাররঞ্জন, বাঙলার ইতিহাস, দে' জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪৪০
৩। সরকার ডঃ দীনেশচন্দ্র, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গ সাহিত্যালোক, কলিকাতা, ১৩৮৯
4. Chowdhury, A.B., Dynastic History of Bengal, Asiatic Sociaty of Pakistan, Dacca, 1967.
৫। কোকা, আন্দ্রোনভা, বোগার্দ-লেভিন, ও গ্রিগোরি কতোভাস্কি, ভারতবর্ষের ইতিহাস", প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২
৬। রহিম, মু,আ,চৌধুরী, আ,ম, মাহমুদ, এ,বি,ম,ইসলাম, সি, "বাংলাদেশের ইতিহাস," নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

১। আরেস, ইয়েনেকা, বুরদেন, ই,কা, ঝগড়াপুর, গণপ্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৯২ ।

২। আহম্মদ, মুজফ্ফর, কৃষক সমস্যা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৫৪ ।

৩। আন্দ্রোনভা কোকা, বোনগার্দ - লেভিন, ও কতোভস্কি গ্রিগোরি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮২ ।

৪। আলী, কাসেদ, জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব, চলন্তিকা বই ঘর, ঢাকা ১৯৮০ ।

৫। উমর, বদরউদ্দীন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা । ১৩৭৯

৬। উমর, বদরউদ্দীন, বাংলাদেশের উৎপাদন পদ্ধতি, বাংলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা । ১৯৮৫

৭। উলিয়ানভস্কি , র,আ, (সম্পাঃ) ভারতের সামাজিক অর্থনীতিক বিকাশ, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৬ ।

৮। কবিরাজ, নরহরি, স্বাধীনতার সংগ্রামে বাংলা, বাণী প্রকাশ, ঢাকা । ১৯৮২

কানুনগো, হেমচন্দ্র, বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা, কমলা বুক ডিপো লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯২৮ ।

৯। খাসনবিশ, রতন, আধাসামন্ততন্ত্র ও ভারতের কৃষি অর্থনীতি, পিপলস্ বুক সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৮৬ ।

১০। গুহ, রজনীকান্ত, মেঘাস্থেনীসের ভারত বিবরণ, বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৩৯৫ ।

১১। ঘোষ, বিনয়, বাদশাহী আমল, অরুণা প্রকাশনী, কলিকাতাশ ১৩৯২ ।

১২। ঘোষ, বিনয়, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ১-৫ খন্ড প্যাপিয়াস, কলিকাতা, ১৯৬৮-৮০ ।

১৩। চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৯৭৪ ।

১৪। পাভলভ, ও,ই, ভারতের পুঁজিতন্ত্রে উত্তরণের ইতিহাসিক পূর্বশর্ত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। বল, সুব্রত, উপমহাদেশের সমাজ ও প্রধান দ্বন্দ্ব, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা, ১৯৭৯ ।

১৬। ভট্টাচার্য, নৃপেন্দ্র, বাংলার ভূমি ব্যবস্থা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৬৩ ।

১৭। মার্কস, কার্ল, অর্থশাস্ত্র বিচার প্রসংগে, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৩ ।

১৮। মার্কস ও এংগেলস, নির্বাচিত রচণাবলী, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৯ ।

১৯। মার্কস কার্ল ও এংগেলস, ফ্রেডারিক, উপনিবেশিকতা প্রসংগে, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭১ ।

২০। মুখোপাধ্যায়, সুবোধকুমার, বাংলার আর্থিক ইতিহাস, (উনবিংশ শতাব্দী) কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৭ ।

২১। শরীফ, আহমদ, বাংগালী ও বাংলা সাহিত্য, ১ম খন্ড, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।

২২। শর্মা, রামশরণ, ভারতের সামন্তবাদ, কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৭৭ ।

২৩। সেন, সত্যেন, গ্রামবাংলার পথে পথে, কালিকমল প্রকাশনী; ঢাকা ১৯৭০ ।

২৪। সেনগুপ্ত, সুখময়, বংগদেশে ইংরেজী শিক্ষাঃ বাংগালীর শিক্ষা চিন্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ ।

২৫। সরকার ডঃ দীনেশ চন্দ্র, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসংগ, সাহিত্যলোক, কলিকাতা, ১৩৮৯ ।

২৬। সেন, ডঃ সুনীল, ভারতে কৃষি সম্পর্ক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৫ ।

২৭। সিদ্দিকী, কামাল, বাংলাদেশের ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, বাংলাদেশ উন্নয়ণ গবেষণা সংস্হা, ঢাকা ১৯৮১ ।

২৮। রহমান, আখলাকুর, বাংলাদেশের কৃষিতে ধণতন্ত্রের বিকাশ, সমীক্ষা পুস্তিকা, ঢাকা, ১৯৭৪ ।

২৯। রহিম ডঃ মুহম্মদ আব্দুর, চৌধুরী ডঃ আব্দুল মমিন, মাহমুদ ডঃ এ,বি,এম, ইসলাম ডঃ সিরাজুল "বাংলাদেশের ইতিহাস" নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ১৯৭৭

Dhaka University Institutional Repository

৩০। রুদ্র, অশোক, পশ্চিমবঙ্গের মেএমণ্ডল, কথাশিল্প, কলিকাতা, ১৯৮১ ।

৩১। রুদ্র, অশোক, ভারতবর্ষের কৃষি অর্থনীতি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৮৫ ।

৩২। রায় সুপ্রকাশ, বিদ্রোহী ভারত, বুক ওয়ার্ল্ড, কলিকাতা, ১৯৮৩ ।

৩৩। রায় সুপ্রকাশ, ভারতের কৃষক বিপ্লব ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, কলিকাতা, ১৯৫৪ ।

৩৪। রায় নীহার রঞ্জন, বাংগালীর ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, ১৪০০ ।

৩৫। হক, এম, আজিজুল, বাংলার কৃষক, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯২ ।

৩৬। হবিব, ইরফান, মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা, কে,পি, বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৫ ।

37. ALAMGIR, M.K. : Bangladesh, A case of Below poverty level equilibrium Trap (Dhaka Institute of Development Studies, 1978)

38. AFSARUDDIN,M(ed.) : Bangladesh Journal of Sociology Vol.I No.I. DHAKA University, Dhaka 1983.

39. ALAVI, HAMZA : The state in post - colonial societies : Pakistan and Bangladesh, in K. Gough and H.P. Sharma(eds). Imperialism and Revelution in South Asia (New York : Monthly Review P Press, 1973).

40. ALAVI, HAMZA : India and the colonial mode of production in R.Miliband and J. Saville (eds). The Socialist Register (New York: Monthly Review Press,1975)

Dhaka University Institutional Repository

41. BHATIA, B.M. : Famiues in India 1960-1965 (Delhi : Asia Pablishing House, 1967).

42. BERNIER FRANCOIS : Travels in the Moghul Empire (New Delhi: 3. Chand & Co. 1941 reprinted 1972).

43. BHATTACHARYYA, DHIRES : A concise History of Indian Economy (Calcutta : Progressive Publishers, 1972)

44. BHARGAVA, BRIJKRISHNA: Indigenous Banking in Ancient and Medieval India (Bombay:Taraporevola, n.d.).

45. BLYN, GEORGE : Agricultural Trends in India,1891-1947 (Philadelphia:University of Pennsylvania Press 1966).

46. BLOCH, MARC : Feudal Societyc Vols I and II (Chicago: University of Chicago Press, 1974).

47. CHOWDHURY, S. : Trade and Commercial Organisation in Bengal, 1650-1720, with special Re-ference to English East India Company (Calcutta: K.L.Mukhopodhyay, 1975).

48. CHOWDHURY, AM. : Dynastic History of Bengal (Dacca: Asiatic Society, 1967)

49. CHOWDHURY, A. : A Bangladesh Village : A study of Social stratification (Dacca: Centre for Social Studies, 1978).

Dhaka University Institutional Repository

50. CHOWDHURY, A., : Agrarian Social Relations and Development in Bangladesh (New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co. 1982).

51. CHANDRA,BIPAN, : "Reinterpretation of Nineteenth Century Indian Economic History" The Indian Economic and Social history Review, Vol. V No.1 March, 1968.

52. CHANDRA. B., : "The Indian Capitalist class and Imperialism before 1947" Journal of contemporary Asia. Vo.. 5 No.3,1975

53. DANGE,S.A., : India from Primitive Communism to slavery (New Delhi:People's Publishing House, 1972).

54. Desai, A.R. : Social Background of Indian Nationalism (Bombay : Popular Book Depot. 1959).

55. DUTT, RAJANI PALME : India Today (Calcutta : Thecker, 1925).

56. DUMONT, LOUIS. : The Village Community from Munro to Maine, Contributions to Indian Sociology Vol. 9, (December, 1966).

57. DUTT, RAMESH.C., : The Economic History of India, 2 Vols. (London: Routledge and Kegan Paul,1956).

58. DUTT, B.B., : Town Planning in Ancient India, (Calcutta : Thecker, 1925).

59. GHOSAL, U.N. : The Agrarian System of Ancient India. (Calcutta : University of Calcutta Press 1930).

Dhaka University Institutional Repository

60. DADGIL, D.R. : The Industrial Evolution of India in Recent Times, 1860-1939 (Bombay : Oxford University Press, 1971).

61. GANGULI, B.N. : Readings in Indian Economic History (London : Asia Publishing House, 1964).

62. GHOSAL, U.K. : The Agrarian System of Ancient India (Calcutta : University of Calcutta Press, 1930).

63. GOUGH, K. AND SHARMA, H.P.(EDS) : Imperialism and Revolution in South Asia (New York : Monthly Review Press, 1973).

64. HUSSAIN, S., : Everyday life in the Pala Empire, (Dacca : Asiatic Society, 1968).

65. HILTON, RODNEY(ED): The Transition from Feudalism to Capitalism (London : New left Books,1976)

66. HABIB IRFAN : The Agrarian System of Mughal India (London : Asia Publishing House, 1963)

67. HINDESS, BARRYA AND HIRST PAUL Q. : Pre-capitalist Modes of Production (London/Boston: Routledge & Kegan Paul, 1975).

68. HOBSBAWM, E.J. : Industry and Empires (Harmondsworth : Penguin Books, 1969).

69. HUQ, M. : The East India Company's Land Policy and commerce in Bengal 1698-1784 (Dacca : Asiatic Society, 1964).

Dhaka University Institutional Repository

70. HAQUE, AZIZUL, : The Man Behind the Plough (Aalcutta : Book Company, 1939).

71. KARIM, N. : The Changing Society of India and Pakistan (Dacca : Ideal Publications, 1961).

72. KARIM, ABDUL. : DACCA The Mughal Capital (Dacca : Asiatic Society, 1964).

73. KAY, GEOFFREY. : Development and Under Development A Marxist Analysis (New York : St. Martin's Press, 1975)

74. KNOWLES, L.C.A. : The Economic Development of the British Overseas Empire, Vol.1 (London : George Routledge, 1928).

75. KOSAMBI, D.D. : An Introduction to the study of Indian History (Bombay : Popular Prakashan, 1975).

76. KRADER, L. : The Asiatic Mode of Production (Netherlands : Van Gorcum, 1976).

77. LENIN, V.I. : Collected Works, Vol. 1 to 45 (Moscow : Progress Publishers, 1964).

78. MAINE, SIR HENRY : Village Communities in the East and West (London : John Murray, 1972)

79. MAMDANI, MAHMOOD.: The Myth of Population control, Family caste and class in an Indian Village (New York : Monthly Review Press, 1972).

Dhaka University Institutional Repository

80. MARX, KARL, AND ENGELS, FREDERICK. : Collected works, Vol. 1-45 (Moscow : Progress Publishers, 1975-1983)

81. MAJUMDER, R.C. AND PUSAL KAR, A.D. : The classical Age (Bombay : Bharatiya Vidya Bhaban, 1955).

82. MILL, James, : The History of British India, Vol.1 (London : James Masdden, 1858).

83. MISRA, B.B. : The Indian Middle Classes (London : Oxford University Press, 1961).

84. MORELAND, W.H. : The Agrarian System of Moslem India (Combridge : Heffer, 1929).

85. MUKERJEE, Radhakamal. : The Economic History of India, 1600-1800 (London : Longmans Green, n.d.)

86. MUKHERJEE, Ramkrishna : The Rise and fall of the East India Company (Berlin : Deutscher Verlag der wissenschaften, 1958)

87. MAHMOOD, A., : A Plea for a Fresh Approach to Soco Economic Development (Dacca : Centre for Social Studies, 1977).

88. MELOTTI, UMBERTO : Marx and the Third World (London : The MacMillan Press Ltd. 1977).

89. MYRDAL, GUNNAR : Asian Drama, 3 Vols (New York, Random House, 1968)

Dhaka University Institutional Repository

90. PRAKASH, Om. : The Dutch East India Company in Bengal : Trade Privileges and Problems, 1933-1712, Indian Economic and Social History Review (1972).

91. RAY, Indrani. : The French Company and the peasants of Bengal (1680-1730) Indian Economic and Social History Review (March, 1962).

92. RAYCHOWDHURY, TAPAN : Bengal Under Akbar and Jahangir (Delhi : Munshiram Monoharlal, 1969).

93. ROY, Atul Chandra: History of Bengal, Mughal Period (Calcutta : Nababharat Publishers 1968).

94. ROY, M.M. : India in Transition (Bombay : Nachiketa Publications, 1971).

95. RUDRA. A, : Class Relations in Indian Agriculture (in three parts) Economic and Political Weekly (June, 1978).

96. SARKAR, Jadunath,: Economics of British India (Calcutta : M.C. Sarkar, 1917).

97. SEN, Bhowani, : Evolution of Agrarian Relations in India (New Delhi : People's Publishing House, 1962).

98. SHARMA,Rama Sharan, : Indian Fendalism. C. 300-1200 (Calcutta : University of Calcutta, 1965)

99. SHAH, S.M. 'Bondedlabour' : The Economic Times(November,8,1984)

Dhaka University Institutional Repository

100. SHELVANKAR,K.S. : The Problems of India (Harmonds worth : Penguin Books, 1943).

101. SINGH, V.B. : Indian Economy, Yesterday and today (Delhi : People's Publishing House,1970).

102. SINGH, V.B.(ED) : The Economic History of India, 1857-1956 Bombay : Allied Publishers, 1965)

103. SINHA, N.K., : The Economic History of Bengal : From Plassey to the Permanent Settlement. Vol. 1 & II (Calcutta : Firma K.L. Mukherjee 1962 & 1965).

104. SINHA, N.C. : Studies in Indo=British Economic Hundud Years ago (Calcutta : A. Mukherjee,nd)

105. SOBHAN, Rehman : Basic Democracies, Works Programme and Rural Development in East Pakistan (Dacca : Bureau of Economic Research Dacca University 1968)

106. SMITH, Vincent A : The Early History of India (Oxford : Clarendon Press, 1957).

107. STEVENS, R.D. ALAVI, H., and Bertocci, P.J. : Rural Development in Bangladesh and Pakistan (Honolulu : University Press of Hawail, 1976).

108. TARACHAND. : History of the Freedom Movement in India, Vol. 1 (New Delhi : Government of India Publication Division, 1961)

Dhaka University Institutional Repository

109. TAWANEY, R.H. : The Agrarian Problem in the Sixteenth Century (New York : Longman, 1912).

110. THORNER, Daniel. : Marx on India and the Asiatic Mode of Production; Contributions to Indian Sociology, Vol. IX (1966).

111. TUNG, MAOTSE : Selected works Vol. II (Peking, Foreign Language Press, 1975).

112. TRIPATHI, A.R., : Trade and Finance in the Bengal Presidenc (Calcutta : Crient Langmans, 1956)

113. WARD, B : Barbara, India and the West (London : Hamish Hamilton, 1961).

114. WEBER, MAX : The City (Glenncoe, III : Fress Press 1958).

115. WEBER, MAX : General Economic History (Toronto : Collier-MacMillan Canada,1966).

116. WEBER, MAX : The Religion of India (New York : Free Press, 1967)

117. WEBER, MAX : The Agrarian Sociology of Ancient Civilizations (London : New left Books, 1976).

118. WITT FOGEL, K.A.,: Oriental Despotism : A comparative study of total power, (New York : Yale University Press 1968)

119. WESTERGAARD, K. : 'Mode of Production in Bangladesh'The Journal of Social Studies No.2 Centre foe Social Studies (Dacca:August, 1978).

Dhaka University Institutional Repository

HISTORICAL SCHEMA OF CLASS ANALYSIS

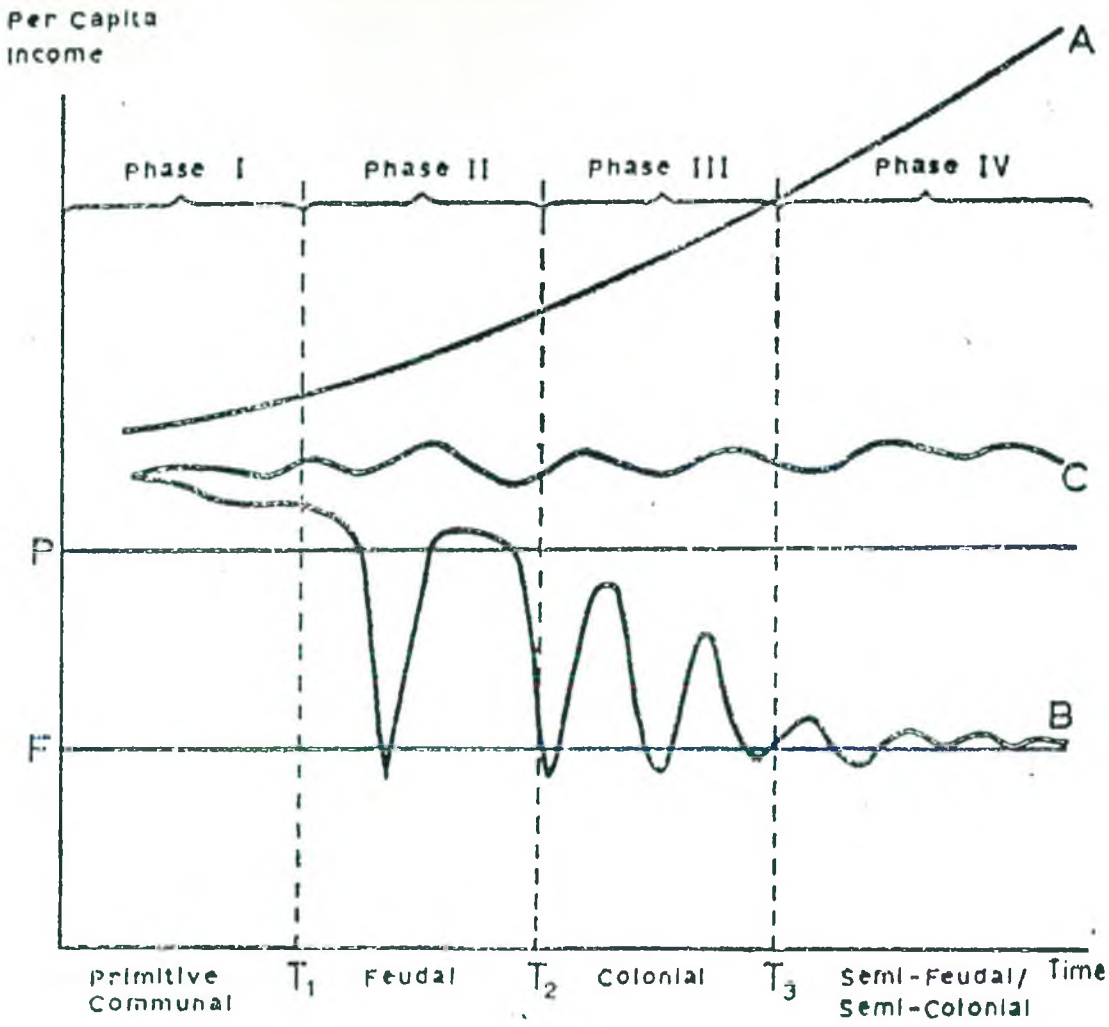

সূত্র: মহিউদ্দীন আলম চৌধুরী

ঐতিহাসিক শ্রেণী বিশ্লেষণের রেখাচিত্র

Dhaka University Institutional Repository

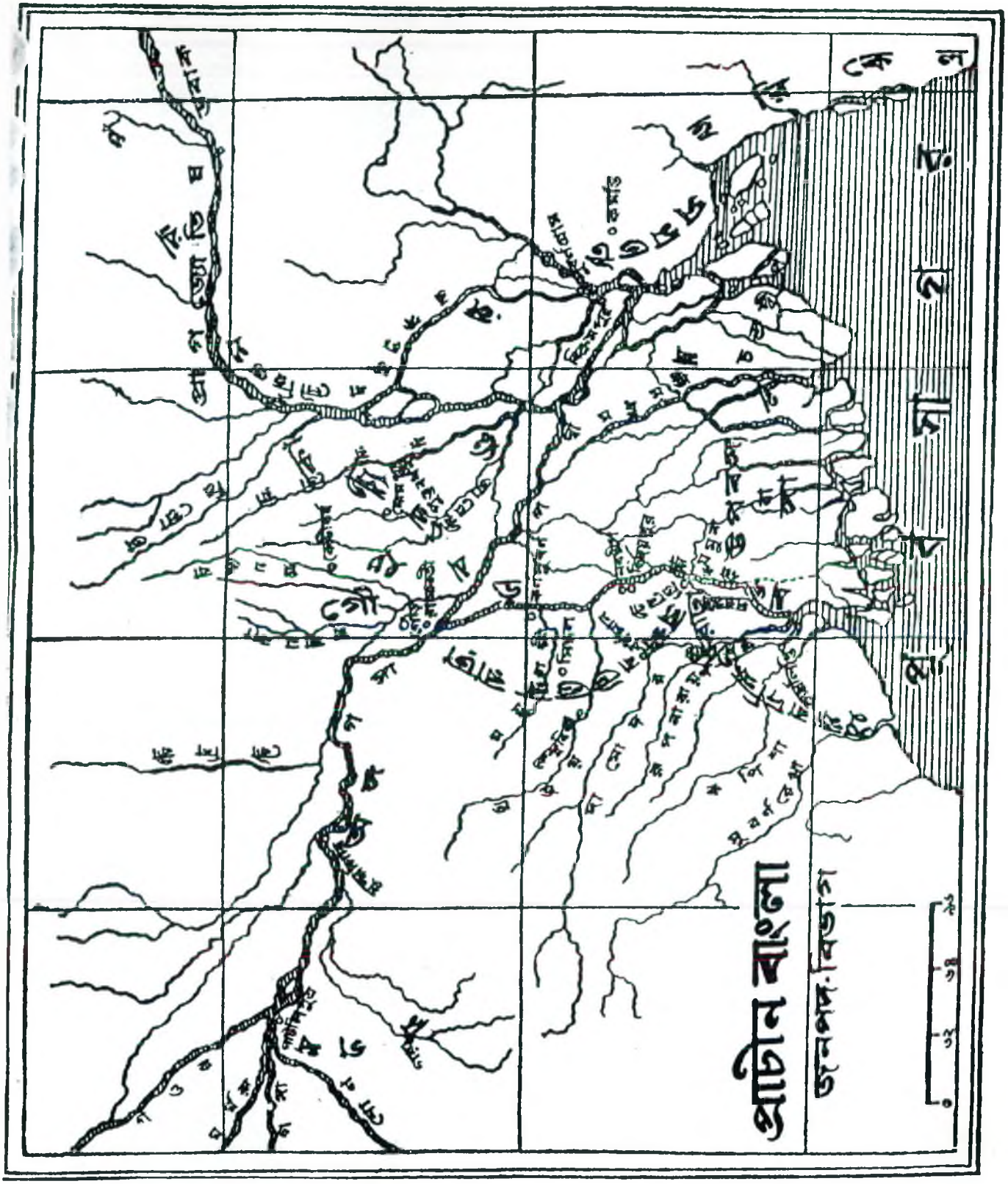

প্রাচীন বাঙলার জনপদ-বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলার পূর্বতন অঙ্গ।
(প্রাক্ তুর্কী বিজয়)
দ্বাদশ শতক পর্যন্ত

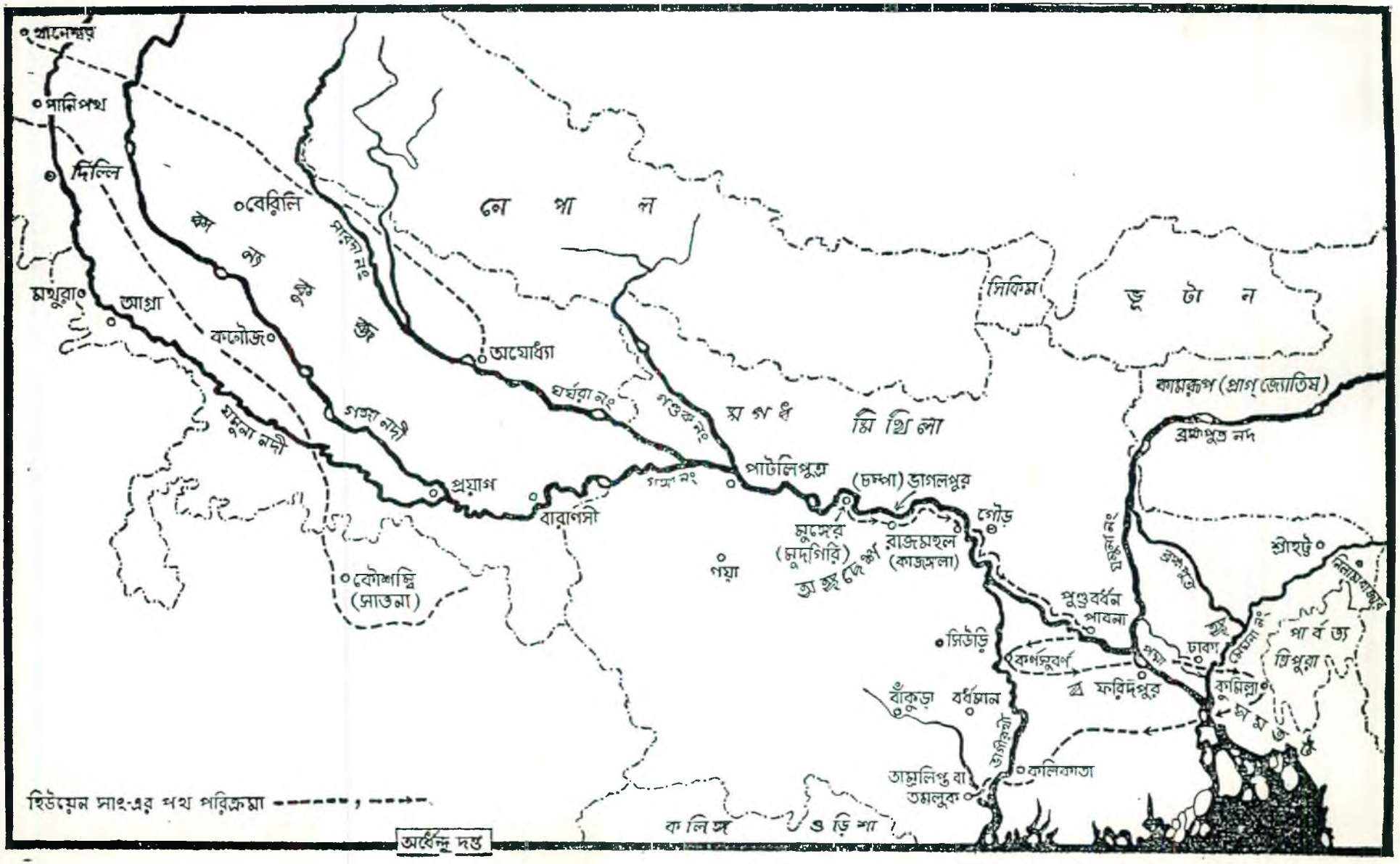

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

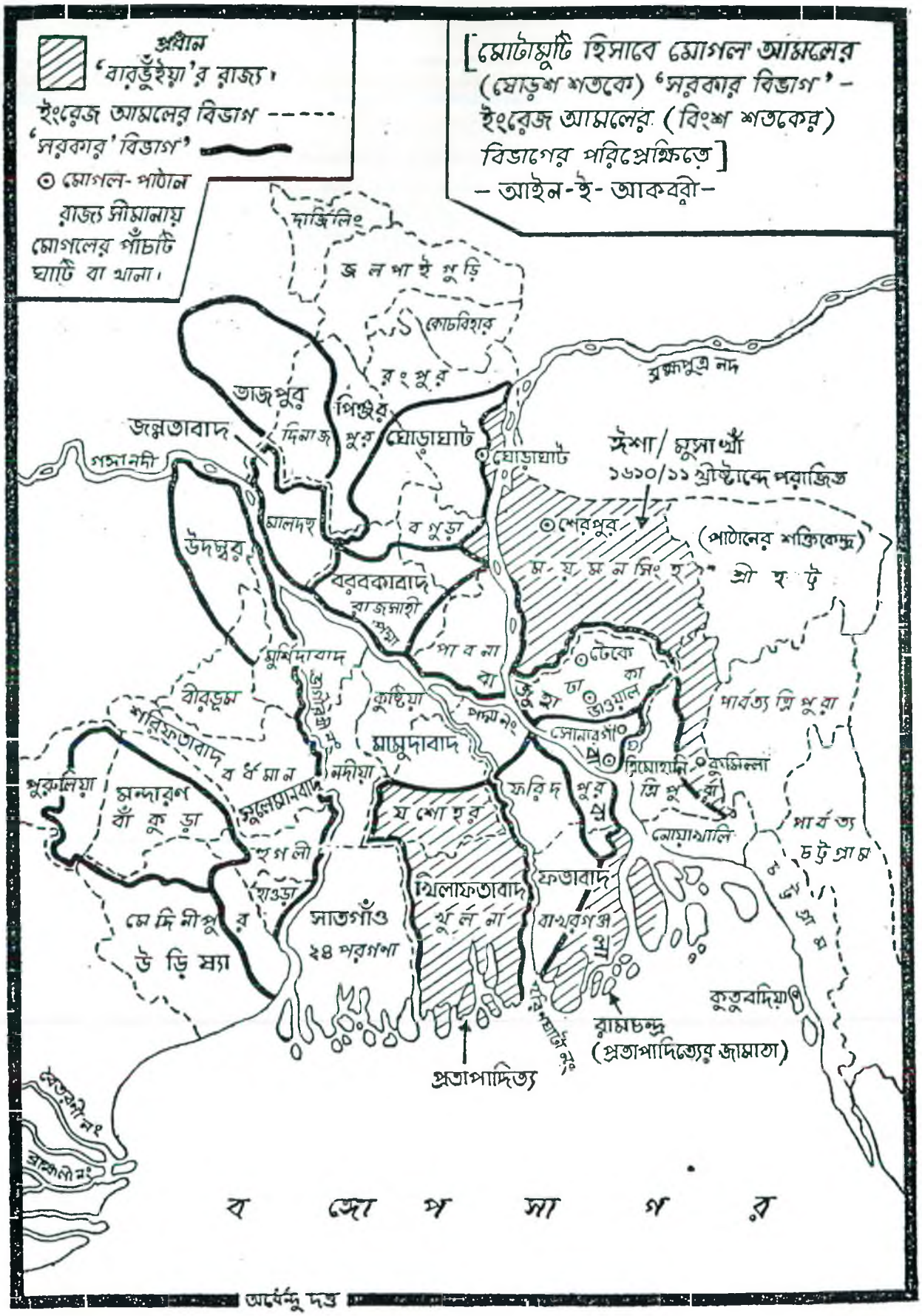

Dhaka University Institutional Repository